আমাদের ছুটি

ভ্রমণের ডানা মেলে

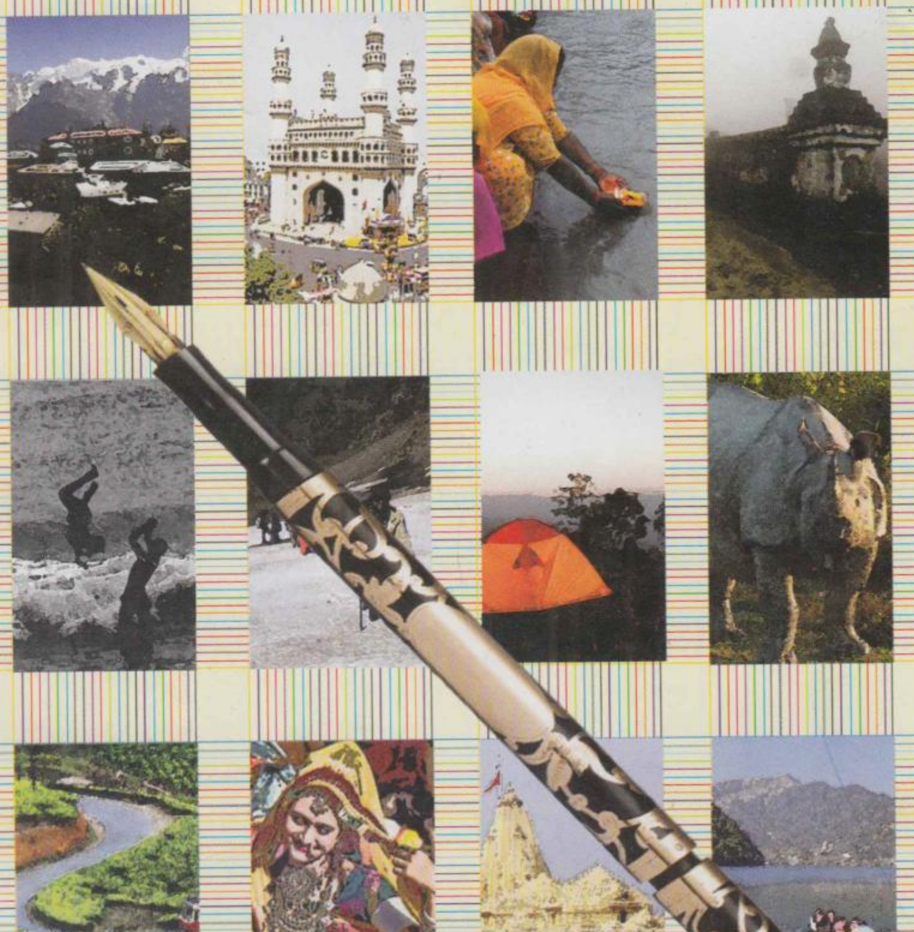

শারদ সংখ্যা, আশ্বিন ১৪২৩, অক্টোবর ২০১৬

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন : হরিসাধন দে অধিকারী

স্ক্যান ও এডিট করেছেন : সুজিত কুণ্ড

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

বৈশাখ সংখ্যা
প্রকাশ অনুষ্ঠান
শরতের আবাহনে...

গণ্ডীছুট

ভ্রমণের ডানা মেলে

শারদ সংখ্যা, আশ্বিন ১৪২৩, অক্টোবর ২০১৬

সম্পাদনা- হরিসাধন দে অধিকারী

প্রচ্ছদ- বিপ্লব বসু

অলংকরণ ও অক্ষরবিন্যাস- পার্থ বসু

সহযোগী- ড. দিলীপকুমার দত্ত, ড. প্রদীপ্ত ভট্টাচার্য্য, অরিন্দম দত্ত, সনৎ গুপ্ত, উৎপল দাস, পত্রাঙ্গ বসু, ডা. আশীষ রায়, শর্মালী দাস, মেঘনা রায়, পরিমল মণ্ডল

কৃতজ্ঞতা স্বীকার- 'ভ্রমণ আড্ডা' ভদ্রেশ্বর, হুগলি

মুদ্রণ- নবপ্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৬৬, গ্রে স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৬

সম্পাদকীয় দপ্তর- বি-৬/৮৭, কল্যাণী, নদীয়া, পিন-৭৪১২৩৫
ই-মেল- gandichhut@gmail.com
harisadhan.deadhikari@gmail.com
ফোন- ৯৪৩৩৯ ১৫০২৮

প্রকাশক- Kalyani People's Awareness Centre,
(Regd. under WB Societies Act 1961)
-এর পক্ষে Dr. P. C. Manna, Project Office:
B-12/54, Kalyani, Nadia, Pin-741235.
E-mail: kpac.in@gmail.com
Ph: (033) 2580 8009/98365 48233 (M)

বিনিময়- ৩৫ টাকা

'গণ্ডীছুট'-এ প্রকাশিত কোনও লেখা বা ছবি সম্পূর্ণ অথবা সম্পাদনা করে অন্যত্র প্রকাশের আগে সম্পাদকের অনুমতি একান্ত প্রয়োজন

সম্পাদকীয়

ষান্মাসিক পত্রিকা গণ্ডীছুট। ঋতুচক্রের আবর্তনে আজ সে শারদীয়া। পত্রিকার পাঠক ও লেখকদের গভীর সান্নিধ্যের অনুভূতিতে অন্তরকে আবার সুরভিত করে তুলতে আমরা ফের হাজির গণ্ডীছুটের সেই শারদ-সম্ভার নিয়ে।

জীবনের ধারাবাহিক গতিবিধির মাঝে আমরা চাই অবকাশ– শরীর ও মনের বিশ্রামের তাগিদেই চলি ভ্রমণে। শুধুই কি তাই? বিনোদন, উদ্‌ঘাটন, অনুসন্ধান; কখনও আবার পুণ্যার্জনের আকণ্ঠ পিপাসায় একটু ফাঁক ফোকর পেলেই মনের সাথে পদযুগল ছুটে চলে এদিক-সেদিক, একা– বা দলবেঁধে। এ এক ছুটে চলার নেশা– অ-সী-ম আনন্দ– নানান অভিজ্ঞতার পরম অনুভূতি।

কালি-কলমের আঁচড়ে মন ও চোখের সেই দেখাই আজ প্রাণ পেয়েছে গণ্ডীছুটের পাতায় পাতায়। কেবল দর্শন বা গভীর কথাই নয়, কত রম্যরচনার জন্ম হয়েছে কত মজার ঘটনার একটু ছোঁয়ায়, প্রাণ উজাড় করা অনুভূতির প্রকাশে গভীর সাহিত্যরসও অবলীলায় বয়ে গেছে কত না রচনায়। আর সাক্ষ্যবাহী ছবি? সেও তো বাদ দেয়নি গণ্ডীছুট।

পাঠকদের সন্তুষ্টিই আমাদের এই প্রয়াসের সার্থকতা। আপনাদের মতামতেই আমরা সমৃদ্ধ হব– এগোতে চাই সবাই মিলে– গণ্ডীছুটের মুক্ত হাওয়ায়।

সম্পাদক

সূচিপত্র

০৩ ভ্রমণের দিগ্‌দর্শন
হরিসাধন দে অধিকারী

০৫ টানতি পার না
ধ্রুব বাগচী

০৭ দামোদরের পাল্লায়
ঋত্বিক ঠাকুর

০৯ উলটোরথ
অমিতাভ সেনগুপ্ত

১১ 'রস'পুরের অন্তঃপুরে
সমর্পিতা সরকার

১৩ হর নর্মদে হর
অমিত আইচ

১৫ সিংহস্থ
পত্রাঙ্গ বসু

১৯ আমার মানস ভ্রমণ
অসিত সরকার

২২ রেশম পথে
পার্থ বসু

২৫ দে ছুট– বাঁকিপুট
মিতা মণ্ডল (সাহা)

২৭ পটের গ্রাম নয়া
রত্না ভট্টাচার্য

২৯ কলমে আন্দামান
শ্রেয়সী নন্দী

৩১ ইতিহাসকে ছুঁয়ে স্মৃতির আলোকে হেমকুণ্ড সাহিব
দিবাকর দাস

৩৫ বিস্মৃত ইতিহাসের পথ বেয়ে
প্রদীপ্ত ভট্টাচার্য্য

৪০ সাগরের ঢেউ গুনতে– গোপালপুরে
দেবনারায়ণ মাঝি

কবে আমি বাহির হলেম ৪২
অম্বিকা বেজ

তালে তালে চন্দ্রতাল ৪৪
নন্দিনী দাস

সতোপন্থ তাল ৪৬
শর্মালী দাস

লংড্রাইভে ডুয়ার্সের হাতিপোতা নারারথলি বিল ৫০
প্রসাদ বিশ্বাস

হংস বুগিয়ালে ফতে সিং-এর সংসার ৫৪
সুকুমার চক্রবর্তী

ভ্রূ-পল্লবে ডাক দিলে পলাশের বনে ৫৭
সুস্মিতা চক্রবর্তী

পবিতোরার জঙ্গলে ৫৯
কঙ্কণা মুখার্জ্জী

শূলনী-সাপের লেখা ৬১
সত্যব্রত মুখোপাধ্যায়

আমার প্রথম ট্রেক ৬৩
অমৃতা দে অধিকারী

গাজন বনাম দুর্গোৎসব ৬৫
শক্তিপদ ভট্টাচার্য

ভ্রমণে ছবি–ছবিতে ভ্রমণ ৬৭
অরূপ ঘোষ

মনের ছবি ৬৯
অমিত সাহা

যত্তসব গাঁজাখুরি গপ্প ৭১
প্রবীরকুমার বিশ্বাস

সাঙ্গ অভিযান ৭৪
বিপ্লব বসু

মুগ্ধ করবে সিসামারা মালঙ্গি ৭৬
অশোক কুণ্ডু

উত্তরবঙ্গের কয়েকটি হোমস্টে ৭৮
প্রবীর বসু

ভ্রমণের দিগ্‌দর্শন

হরিসাধন দে অধিকারী

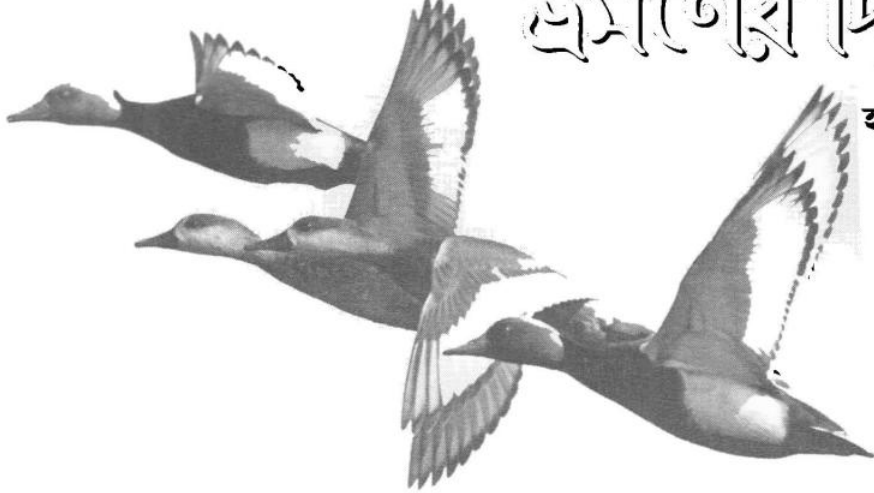

ছবি- শ্যামাপ্রসাদ সাঁই

পৃথিবীর ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে আমাদের অবস্থান। জীব-বিজ্ঞানের ভাষায় প্রতিটি প্রাণীই চলমান। অবশ্যই এই চলন সবক্ষেত্রে একরকম নয়– বিচিত্র তার বৈশিষ্ট্য, বিভিন্ন তার কারণ– বিভিন্ন তার নাম। আমাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে গতি–জীবন গতিময়। আমাদের চলনের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য অস্তিত্ব রক্ষা। তারপর একে একে সংবেদন-প্রত্যক্ষণ ও ধারণা। জগৎ সম্পর্কে কৌতূহলী মন হয় উদ্দীপিত– অনুভূতিগুলো সুরসুরিয়ে ওঠে মনের মধ্যে। নিজেকে নতুন করে সৃষ্টি করি। কত আনন্দ-কত দুঃখ-কত ভয় ও রোমাঞ্চ সঞ্চারিত হয়– অভিজ্ঞতার ঝুলি ভরে তুলি। এই চলা– শুধুই চলা– দৈনন্দিন জীবনের গতানুগতিকতায় মন জড়িয়ে পড়ে ক্লান্তির জালে। অবসন্ন হয়ে আসে শরীর, মন চায় অবকাশ। কীভাবে, কোথায় মিলবে এই মুক্তি, তার খোঁজে। ছটফটে মন ডানা মেলে উড়ে যেতে চায়– আশা একটুখানি অবকাশ, একটু মুক্তি– একটু নিজের দিকে ফিরে দেখা। এও তো এক দর্শন, যার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ দৃশ্‌+অনট্‌। দর্শন অর্থই দেখা– প্রত্যক্ষণ। এ দেখা সাধারণ দেখা নয়– নিরপেক্ষভাবে দেখা– সত্যের উপলব্ধি। আসলে দর্শন হল জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ– কর্ম-তৎপরতা– অজানাকে জানা– অচেনাকে চেনার স্পৃহা। মনের গভীরে পুঞ্জীভূত সে সব সুপ্ত কারণেই সম্ভবত মানুষের মনে জাগে ভ্রমণের ইচ্ছা– প্রকৃতির অকৃত্রিম উজাড় করা সৌন্দর্যে অব-গাহনেই পায় মনের আরাম। ধর্মস্থান-নিরপেক্ষভাবে ভ্রমণ মানেই আমাদের মনোজগতের তীর্থভূমি যা আমাদের মন বা অন্তরাত্মাকে তৃ-ধাতুজাত সেই মহান উত্তরণভূমিতে পৌঁছে দিতে পরম সহায়ক।

প্রাচীন যুগ থেকেই গ্রিক দার্শনিকদের ঝোঁক ছিল প্রকৃতির সৌন্দর্য রস আস্বাদনের দিকে। মনের এই তাগিদ থেকেই বিজ্ঞানীর আবিষ্কার– অভিযান-কারীর জীবনকে বাজি রেখে ঘর ছেড়ে বেড়িয়ে পড়া– বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে তন্ন তন্ন করে দেখা এবং দেখানো। মানুষকে উৎসাহিত করা– কর্মতৎপর করে তোলা। অযৌক্তিক ধারণা– কুসংস্কার থেকে মনকে মুক্ত করে লালন করে বাড়িয়ে তোলে রসবোধ। আমাদের সমূলে উৎপাটন করে স্থান থেকে স্থানান্তরে নিয়ে চলে। প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধে মাতোয়ারা হই। দার্শনিকদের মতে ভ্রমণ বৌদ্ধিক, মানসিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও সামাজিক বিকাশে মানুষকে সমৃদ্ধ করে তোলে। আর সেই অভিজ্ঞতা ও স্মৃতি রূপ দেয় কত শিল্প ও সাহিত্যের। কত অজানাকে জানা– অচেনাকে চেনা– অদেখাকে দেখা। এ যেন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে আবিষ্কার করা।

ভ্রমণ কখনও নির্দিষ্ট ঠিকানাতেই থেমে থাকে না। অভিজ্ঞতা-আত্মো-পলব্ধি-অন্তর্দৃষ্টি-সম্যক জ্ঞান অন্তরের পরিধি বাড়িয়ে তোলে। অলীক কল্পনা বাস্তবের রূপ পায়। স্থান-জাত-ধর্ম-বর্ণ-সংস্কৃতি-ইতিহাস-শিল্প– সবকিছুর সাথে সাক্ষাৎ পরিচয় হয় ভ্রমণের মাধ্যমেই। ছেলেবেলার পাঠক্রমের প্রতিটি বিষয়ের সঙ্গেও ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে এই ভ্রমণ। সাহিত্য-ইতিহাস-ভূগোল-বিজ্ঞান। এমনকি অঙ্কও বাদ দেয় না ভ্রমণের দিকে তার দু-হাত বাড়াতে। বৈচিত্র্যময় পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের প্রথম ও প্রধান হাতিয়ার ভাষা। ভ্রমণে বেড়িয়ে বিদেশ-

বিভুঁইয়ে প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে ভাব বিনিময়ে শেখা হয় কত ভাষা। হিসাব জ্ঞান তাও কি লাগে না ভ্রমণে? জীবনটাই তো একটা হিসাব– একটু গোলমাল হলেই তলিয়ে যেতে হবে। ভ্রমণেও প্রতিক্ষেত্রে চাই পাই-টু-পাই হিসেব। তা সে অর্থেরই হোক বা সময়ের। এই জন্যই তো আমরা সংসারের মায়া, স্বজনের মমতা, সম্পদের মোহ ত্যাগ করে চলি ভ্রমণে। মানুষ বৈচিত্রসন্ধানী ভ্রমণ পিয়াসী। কেজো সংসারী মানুষের মন ক্ষুদ্রতা- জড়তা ও চেতনাহীন আবেশে জড়িয়ে থাকে। নতুনত্বের স্বাদ পেতে, চায় বিচিত্র বিপুল পৃথিবীর বুকে নিজেকে ব্যাপ্ত করতে– ছড়িয়ে দিতে। আনন্দের আকুতি থেকেই মানুষের আদিম প্রবৃত্তি– যাযাবরী বৃত্তি– সর্বস্ব উজাড় করে ভ্রমণের নেশায় সে পাগল হয়। বাড়ে আত্মবিশ্বাস, জাগে আনন্দানুভূতি।

ভ্রমণ আমাদের ঘর-সংসারকে আরও সুখের করে তোলে। জাগতিক দুঃখ, কষ্ট ও কাজের চাপে পিষ্ট মানুষের মনের পিপাসা চাতক পাখির মতো এক ফোঁটা জলের খোঁজে ফেরে– ভ্রমণ পারে এ পিপাসা মেটাতে। কত দৃষ্টিহীন-খঞ্জ-মানুষও হৃদয়ের দুর্নিবার আকর্ষণে ঘর ছেড়ে বেড়িয়ে পড়ে সমস্ত প্রতি-বন্ধকতাকে জয় করে। অন্তর্দৃষ্টিই তাকে দেয় জগৎ দেখার স্বাদ– মেটায় তার পুণ্যার্জনের বাসনা। জয়ী হয় কালজয়ী মন। আসলে ভ্রমণ তো শুধু দেখা বা ছোঁয়াতেই থেমে থাকে না। বিমুক্ত চিন্তা-জ্ঞানলিপ্সাই আমাদের শরীর মনের শক্তি জোগায়। অনেকক্ষেত্রে বয়স ভার-শারীরিক অসমর্থতাও বাধ সাধে, ভ্রমণইচ্ছাকে রুদ্ধ করে। তবুও তাদের মন কাঁদে লুকিয়ে। ভ্রমণ সাহিত্য, ছবি, শিল্পকর্ম দিয়ে তারা মেটায় মনের ক্ষুধা, চোখের তৃষা।

মুদ্রার বিপরীত দিকও আছে। খুব কম সংখ্যক হলেও অনেকের কাছে এই ভ্রমণ বিরক্তিকর, অযথা কষ্টকর বা অপ্রয়োজনীয় মনে হয়। ঘরের কোণেই তাদের সমস্ত সুখ-আনন্দ-বিশ্রাম। কোনও প্রয়োজনে বাড়ির বাইরে পা রাখলেও মন থাকে ঘরের অন্দরমহলে।

অনেক গবেষক সুখীমনের সংজ্ঞা দিয়েছেন– তাঁদের মতে তিনিই সুখী, যিনি ভ্রমণ করেন। ঘরের কোণের অতীত স্মৃতি, ব্যস্ত জীবনের দীর্ঘশ্বাস, গৃহ-সংসারের কলহ– সব ছেড়ে বেড়িয়ে পড়লেই আনন্দ– প্রকৃত সুখের ঠিকানা– মনের শান্তি। বাস্তববাদী মন-দৃঢ় প্রত্যয় ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে চলা জীবন হয় সহজ-সরল- পবিত্র ও সুখময়।

পরিচিতি
অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক। ভ্রমণ প্রেমী।
পত্রিকা সম্পাদক।

ভূমার সন্ধানে চির-যাত্রী...

আথিরাপল্লি ফলস, কেরালা, ছবি- অমৃতা দে অধিকারী

Zানতি পার না...

ধ্রুব বাগচী

(ক)

বড়ো ধন্দে পড়লাম! সম্পাদক মহোদয় খাসা নাম রেখেছেন কাগজের। গণ্ডী টপকে ছুট। গণ্ডী তো একধরণের বেড়ি। কিন্তু সবার আগে সে বেড়ি যে ভাঙতে হবে। এই ভাঙতে গিয়ে মনের মধ্যে উদয় হল, তবে বেড়ি পরায় কে? আমাদের পদযুগল কি এতটাই মহার্ঘ বস্তু? জবাব আছে অনেক, সবগুলোই ঝুটো মুক্তোর মতো। 'জানেন কত্তা, আসলে, আমরা নিজের পায়ে নিজেই বেড়ি পরে গণ্ডীর মধ্যে থাকতে ভালোবাসি। নিজের বাঁধন নিজেই দিই। ওটাই মোক্ষম পেত্যয়'। ওর মুখে কথাটা শুনে মস্ত ঠেক খেলাম।

কথাগুলো আমার না। নদে জেলার তাহেরপুর। পোস্টাফিস ওই তাহেরপুরই। সেখান থেকে সাড়ে চার ক্রোশ উত্তুরের মেঠো পথ ধরে হাঁটাহাঁটি করলে চাঁদের হাট। নামটি ভারি সুন্দর, মনে ফূর্তি হয়। জলঙ্গী নদীর পাড়ে এই অজ গাঁ। মানে বছর তিরিশ আগেও অজ ছিল। এখন নিশ্চিত ঝকঝকে উন্নয়নের থাবায় পরিবেশ রক্তারক্তি হয়েছে, চকচকে হয়েছে। তা সেই কথাগুলো শুনেছিলাম এক ছোটোখাটো মুদি দোকানির মুখ থেকে। আমার সাথে স্থানীয় বন্ধু, যার বাড়িতে এসেছি, তার পড়শি বনমালির দোকানে চপ মুড়ি খেতে খেতে এমন একখানি বাঁধিয়ে রাখার মতো কথা বলল। বাহ্, মোক্ষম পেত্যয়! কথাটা বলে বিড়ির বান্ডিল থেকে বিড়ি বার করে কানে কয়েকবার মোচড়। তারপর বাঁ হাতটি ডান হাতের কনুইয়ে ঠেকিয়ে আমাদের দিকে পরম মমতায় দিল বাড়িয়ে। আমরা সামনের বেঞ্চে বসে ওর উপহার দেওয়া বিড়ি পান করছি। এতখানি সত্য গীতা উপনিষদে আছে কিনা পণ্ডিতগণ বলতে পারেন। আমার কবুল করতে দ্বিধা নেই বনমালি তেল নুন গরমমশলার মধ্যে হারিয়ে যায়নি। অতীব শিক্ষিত সে, অন্তত আমাদের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারীদের থেকে, আমাদের মতো শৌখিন ভ্রামণিকদের থেকে, আমাদের সভ্যতার দেখনদারি থেকে। আবার বচনকানির উদয় হল, 'নিজের পায়ের বেড়ি নিজেরাই পরতে ভালোবাসি'! যেন বাকি অজুহাত ঝুটো মুক্তোর মতো! ভারি এক জিজ্ঞাসার চিহ্ন ঘাড়ে করে বন্ধুর বাড়ি থেকে ফিরেছিলাম সেবার। অবশ্য একে বোঝা বলে না, উপলব্ধি বলে। হজম করতে না পারলে বুকের গহনে পীড়া হয়। নাগরিক জীবনের বদ্ধ পরিবেশে ক্ষয়ে যেতে যেতে যখন হাঁফ ধরে যায়, তখন তিথি নক্ষত্র দেখে টাকাকড়ির মাপ বুঝে নিয়ে আমাদের ডানায় কাঁপন ধরাই। কাঁপন কিন্তু নিজে থেকে লাগে না। চণ্ডীদাস রজকিনীর প্রেমে যদি রঙ না ধরে, আমরা রঙ লাগাই। থাক, এসব কথার কচকচি, যত ঘোলানো যায় তত ফেনা হয়।

(খ)

রাস্তার ধারে গাছগাছালির ছায়ার মধ্যে ছোটো মাঝারি কোয়ার্টারের ফেলে যাওয়া একতলার ঘরগুলো আমায় বারবার টানে। এপথ এসেছে চিত্তরঞ্জনের দিক থেকে। একটু নিরীহ গোছের পথ। আধো অন্ধকার। ম্যানুয়াল মোডে ছবি হয়, নিলে ফ্লাশ লাগে। শেষ মার্চের গরম হাওয়ার মধ্যে শান্ত, শীতল। মফস্বল থেকে শহরে আসা লাজুক কিশোরীর মতো। জায়গাটা হল রূপনারায়ণপুরের এইচ.সি.এল. কোম্পানির পরিত্যক্ত কোয়ার্টারগুলো। শুনশান হল কীভাবে? সে এক বেত্তান্ত, পরে দু-কাহন করবো। পরপর নেই রাজ্যের বসত সব। আমি আর লেখক বন্ধু বামাপ্রসাদ একটা বাড়িতে ঢুকে পড়লাম গেটহীন অদৃশ্য গেট ঠেলে। দেখি, জানলা নেই, দরজা নেই, ইলেকট্রিকের ওয়ারিং-এর সাদাটে দাগ রয়েছে দেওয়ালে। বাইরে সিমেন্টের হেলে পড়া গেটের দুখানি মাস্তুল। কাঠের লেটার বক্সটি জলে ভিজে রোদে পুড়ে চৈত্রের বাতাসের মতো হাঘরে হয়ে ঝুলছে এখনও। অনাথ শিশু যেন। তারপরই চওড়া উঠোন। দুটো ধাপ সিড়ি, তারপর গোটা তিনেক ঘর। চৈত্রের ঝরা পাতার কার্পেটের ওপর দিয়ে অপার্থিব আবহ তুলে চারপাশ দেখতে দেখতে এগিয়ে চলেছি। পায়ের শব্দ পেয়ে কয়েকটা কাঠবেড়ালি বিরক্ত হয়ে দূরে গিয়ে বোকাবোকা চোখে দেখতে লাগলো আমাদের। চারদিক দেবদারু আর বড়োবড়ো মেঠো আতার গাছ। অন্ধকার অন্ধকার, গা ছমছমে, এমন নিরালা যে পাখিদেরও এখানে আসতে আগ্রহ নেই। মাঝারি মাপের চারখানি ঘর, শূন্যতায় আকুল। শোয়ার ঘরের মেঝেতে বনতুলসীর চারা উঠেছে। একটা নিরীহ সাপ ঘর থেকে বেরিয়ে পিছনের জঙ্গলে মিলিয়ে গেল। প্রথম দেখায় মনে হল, সব আছে অথচ কিছু নেই নির্জনতা ছাড়া। খোঁজ নিয়েছিলাম, এগুলো বাঙালি কর্মীদের সরকারি আবাস। বছর কুড়ি আগেও প্রাণ ছিল। ছিমছাম, সচ্ছল ঘর গেরস্থালী। এটা ড্রইং রুম। আমাদের দূর থেকে দেখে বাড়ির গিন্নি ভেতর থেকে ট্রে করে কাচের গ্লাসে জল নিয়ে এসে বললেন, 'সকালেই শুনেছি... কই আসুন, বসুন সোফাতে। বাজারে গেছেন, এখুনি এসে পড়বেন। আমি ততক্ষণ চা তৈরি করে আনি।' দেখি তাঁর আঁচল ধরে নিজেকে লুকিয়ে রেখে মায়ের সাথে এক ফুটফুটে বালিকা। কাছে টেনে আলাপ করতে যেতেই ভেতরের ঘরে একছুট। আহা, ছোট্ট ফ্রকটি যেন প্রজাপতির পাখা মেলে উড়ে গেল। আমাদের হাতে গ্লাস দুটো দিয়ে বাঁ হাতে ট্রে ধরে ডান হাতে আঁচল দিয়ে ঘামে ভেজা মুখটি মুছলেন। সারা মুখে তখন পরম তৃপ্তির ছটা। মনের মধ্যে দৃশ্যটা বেশ এগোচ্ছিল, হঠাৎ বামাপ্রসাদ বলে বসলো, 'মনে পড়ছে, অনেক আগে একবার এ বাড়িতে এসেছিলাম'!

(গ)

অপরূপ না, অন্য রূপ। নাম হয় না যার। যেখানে উত্তাপ আপন তাপকে দগ্ধ করে। এমন দুপুরের কেমন রূপ থাকে? পথে জনপ্রাণী নেই, দোকানপাট বন্ধ, মনুষ্যশূন্য গেরস্তের বাড়ি, তারই মধ্যে বহুদূর থেকে বাতাসের কথা বোঝা যায় না, শুধু দূর থেকে ভেসে আসা ক্লান্ত ঘুঘুর কাতর ডাক শূন্যতা গাঢ় করে, এ সেই তেমন রূপ। অক্ষয় বড়াল মনে এল। আমি এই রূপের মোহে পড়েছি। এর বাহার আছে আবার জ্বালাও আছে।

এবার সত্যি কথাটা কবুল করি। এত যে দগ্ধ রূপ নিয়ে আদিখ্যেতা করছি, তার একটাই কারণ। সে হল, ছায়া ঘেরা পরিত্যক্ত বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে উপভোগ করছি প্রথম গ্রীষ্মকে। হঠাৎ চোখে পড়ল, বারান্দা পেরিয়ে ড্রইংরুমের কোণে রংচটা দেওয়ালের গায়ে মেয়েলি হাতের মাথার কাঁটা কিংবা পেরেক দিয়ে খোদাই করে লেখা, দোয়েলপাখি বসু। থমকে গেলাম। পরিত্যক্ত নিঃসঙ্গ পরিবেশের মুহূর্তে যেন প্রাণ প্রতিষ্ঠা হল। নাম দেখতে দেখতে আবারও মনে এল, এই তো অতীত তার গণ্ডী পার হয়ে ছুট দেওয়ার আগে বর্তমানকে বসিয়ে দিয়ে আচ্ছন্ন করে গেছে স্মৃতিভারে! এই তো, সময় তার নিজের বেড়ি পরে কেমন বসে আছে। এইসব ভাবনাকে ভ্রমণ বলে না, মনোচারণ বলে। যা অনেক ক্রোশ ভ্রমণ করলেও কদাচিৎ মেলে। কিন্তু, কে এই দোয়েলপাখি, এখন বয়স কত তার, কেমন হয়েছে দেখতে তাকে, কোন একান্তে লেখা হল এই তন্বি নামখানি, এতদিনে নিশ্চিত বিয়ে হয়ে গেছে তার ইত্যাদি। বন্ধুর পায়ের শব্দে সম্বিত ফিরে এল। সে ততক্ষণে ভেতরের শোয়ার ঘরে ঢুকে গেছে। আঙুল দিয়ে দেখালো, ঘরের এক কোণে সিঁদুর দিয়ে আঁকা আছে বসুধারা। বিয়ে পৈতে বা শুভকাজে পুরোহিত দেওয়ালে কুশের আংটি পরা মধ্যমা দিয়ে গড়িয়ে দেন তিনটি ধারা দেওয়ালের গায়ে। দেখলাম সে ধারা যেন আজও বইছে। আমার চোখে সুধা। এইরকম সুধায় মাতাল হতে কে না চায়। কানে এল সানাইয়ে বাজছে, 'বাজে মুরলিয়া বাজে রে...' বসন্তবাহারের চেনা বন্দিশটি ভেসে আসছে বাইরে গেটের সামনে নহবত থেকে। বাড়ি ভর্তি লোকজনের ব্যস্ততা। এইসব অনুষ্ঠানে বাড়ির মহিলাদের সবাইকে বেশ সুখিসুখি লাগে। দেখা অদেখায় মগ্ন হয়ে ছিলাম, চোখ পড়লো বাড়ির পিছনের কুয়োতলায়। পায়ে পায়ে সেখানে। নির্জনে বসে রোদ্দুর মেখে সেই কুয়োর পাড় যেন অমৃত পান করছে। সময় কত নিষ্ঠুর! কত কলঙ্কহীন! কি সর্বব্যাপী গতিশীলতা! অশেষ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দুটি কপিকল দণ্ড। কপিকল অবশ্য হাওয়া হয়ে গেছে। ঝুঁকে দেখলাম খটখটে, ওখানেও ছোটো গাছেরা গুছিয়ে সংসার করছে। একফালি রোদ পড়েছে কুয়োতলায়। দেখার কি আর শেষ আছে, একটা ছোটো চৌবাচ্চা, কিছু ইটপাটকেল। এইসব নিয়ে কুয়োতলার একাকী জীবন। এতকিছু সব হারানো সত্ত্বেও সব পেয়েছির ঝুলি নিয়ে জীবন কাটাচ্ছে।

শেষবিকেলে অজয় নদী। এবড়ো খেবড়ো পথ, অটোর দুলুনি, দুপাশে ইউক্যালিপটাস, তমাল ইত্যাদি। তারই মাঝখান দিয়ে গাড়ি যাওয়ার সরু পথ। কেউ কোথাও নেই তবু জনশূন্য বলা যাবে না। বৃক্ষের থেকে আপনজন মানুষের আর কে আছে। রূপনারায়ণপুর থেকে অটোতে মিনিট তিরিশও নয়। গেরুয়া জোব্বায় যিশু। দু চোখ জুড়ে প্রশান্তির আভা ছড়িয়ে। কাঁধ ছাড়িয়ে একঢাল বাদামি চুল। মুখমণ্ডলে হালকা দাড়ি গোঁফ। দেখছেন নদীর জলে পড়েছে তাঁর প্রতিবিম্ব। সেখানেও ক্ষমার বাণী। শেষবিকেল জানে এইসব কথা। যে ভাবে তাঁর চওড়া কাঁধ জানে, একদিন দুটি বাহুর প্রান্ত পেরেক বিদ্ধ হবে। অজয়কে প্রথম দেখে এমনই মনে হয়েছিল। সমাহিত, শান্ত। মাঝেমাঝে বাদামী পাথরের উপাচার। অঞ্জলি দিতে চায় তারা।

রামকুমারবাবুর গাওয়া নিধুবাবুর এক টপ্পা মনে এল। 'দেখা হলে ননদিকে বোলো, যমুনায় জল আনতে গিয়ে রাধার কি যে হলো...' এই 'কি' যে হয়ে যাওয়া, কখন যে বুকের গহন থেকে চুঁইয়ে পড়ে, একমাত্র বুঝতে পারে রসিক মহাজন। সে গ্রহণ করতে পারে তার ক্ষরণ।

ভ্রমণ পথে চোখমেলে দেখো, সাটারে আঙুল টেপো, ফিরে এসে খাতার ওপর কলম বাগিয়ে বসো। ছবি ফেসবুকে দাও, টুইট করো। এক একজনের এক একরকম আবদার। জীবাত্মাকে খুশি করো। তারপর আবার পরের ভ্রমণের জন্য তৈরি হওয়া। গণ্ডীছুটের সম্পাদক মহোদয় প্রথমেই একখান নজরদারী গান গেয়ে রেখেছেন। গতানুগতিকতার মাধ্যাকর্ষণ ছেঁড়া... বচনে মোচড় আছে (পূর্ববর্তী সংখ্যার সম্পাদকীয় প্রসঙ্গে)। কিন্তু লাখ কথার এক কথা হল, গণ্ডী থেকে ছুটে ফিরে তো আসতেই হবে সেই গণ্ডীর মধ্যে। তা বাছা, ফেরার পথ ধরার সময় বুকের মধ্যে উথালি পাথালি হয় তো? চোত বোশেখের শুকনো নদী পায়ে পায়ে পার হওয়ার সময় মনটা কাঁদে? রেলপথের লেভেল ক্রশিং-এর পাশে দাঁড়িয়ে যে দেহাতি কিশোরীটি তার হারিয়ে যাওয়া নাকছাবিটি যখন আকুল হয়ে খোঁজে, তখন তার বুকের মধ্যে যে হাহাকার হয়, তার শব্দকে তুমি শুনতে পাও তো? রেলের জানলার বাইরে তাকিয়ে থাকা উদাসী কোনও মুখকে মান্যতা দিতে জানো তো? এ সব আনন্দ বেদনায় মেশা ভ্রমণের জগতসংসারে কতখানি তোমার ভেতরের সিন্দুকখানি পূর্ণ হয়!

'হয়, Zানতি পার না'।।

পরিচিতি

কর্মে অবসর। সেতারের মূর্চ্ছনা নেশা ধরায়।
কলমে সাবলীল অন্তরঙ্গতা। যথার্থ ভ্রামণিক। সঙ্গে ছবি।
কবিতা লেখার হাতটিও যথেষ্ট ভালো।

দামোদরের পাল্লায়

ঋত্বিক ঠাকুর

ছবি- লেখক

কাল সারাটা রাত ছিল। ঝমঝমিয়ে ছিল। এখন নেই, সকাল সোয়া ন'টা। বাড়ি থেকে বেরিয়েছি ভোরবেলায়। তখন ঝিপঝিপে। মানে, বৃষ্টির কথা বলছি। সকাল সাতটা সাত-এর বর্ধমান কর্ড লাইনের লোকালে জানলায় বসে ভাবছিলাম এই বৃষ্টির বৃত্তান্ত। সব হয়ত মাটি করে দেবে সে। না, আশঙ্কা ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে পরাণ বলল, যাও নামো। নেমে পড়লাম এ স্টেশনে। চেনা স্টেশন। তবে আমার পা এই প্রথম এখানে এই পুরানো ব্রিটিশ আদলের স্টেশনে। মাথায় রোদ বাঁধানো মেঘ। সামনে ঝুড়িবটের ছায়ায় বোনা পাকা সড়ক। পেয়ে গেলাম বাপিকে। টোটো বাপি। কুড়ি টাকা রফায় নিয়ে চলল তিন কিলোমিটার দূরে দামোদরের আস্তানায়। বলে রাখছি, হাওড়া থেকে আটাত্তর কিলোমিটার ট্রেনে উজিয়ে এসে এখন বাপির টোটোয় এ রাস্তাকে খুব ছোট্ট মনে হচ্ছে। এঁকে বেঁকে বাউল রঙের ভিড়ে মাটির রাস্তায় নেমে পড়ল টোটো। একটা কাঠের সেতু পেরিয়ে যাচ্ছি। নিচে দামোদর খাল। বাঁয়ে ছবির মতো একটা গেঁয়ো দ্বীপ। মাত্র পনেরো মিনিটে পৌঁছে গেলাম সেচ-জলপথ দপ্তরের নিরীক্ষণ বাংলোয়। উল্টোদিকে দূরে দামোদর। বালিতে বাঁধা জলমহল।

মূল ফটকের তালা ক'বার নাড়াতেই হাজির কেয়ারটেকার। নিরঞ্জন জানা। আলাপে জানলাম নিরঞ্জন ভদ্রকের ছেলে। তবে বাপ-ঠাকুর্দার পরম্পরায় সে আপাদমস্তক বাঙালি। নিরঞ্জন বেশ মিশুকে। অতি উত্তম এ সরকারি অতিথি আবাসের আপ্যায়ন। সঙ্গে নিরঞ্জনের সতর্ক তদারকি। নিরীক্ষণ আবাসের সুবিশাল চত্বরে পাক খেতে বেরিয়ে পড়লাম। গাছের সবুজে ঢাকা। ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি। কত যে সব পাখি! ছাতারের উৎসব। শালিখের উল্লাস। ঝুঁটি বুলবুলির একটানা দোলদোল। পূর্বদিকে পুকুর। শান্ত স্রোতে উঁকি দিচ্ছে পানকৌড়ি। চোখে পড়ছে মাছখাই। চারদিকে লম্বা লম্বা বট-সজনে-শিরীষ-বাবলার জলসা। উঁচু ডালে ঝুলছে লেজ ঝোলা

ফিঙে। এখন জ্যৈষ্ঠ মাস। তবু থেকে থেকে ডেকে উঠছে কোকিল আর বেনে বউ। এখানে নাকি সারাবছর বসন্ত মচ্ছব।

লোহার গেটের তালা খুলে রাস্তায় এলাম। মেটে বাঁধের রাস্তা। পূর্ব থেকে পশ্চিমে। ফেরিঘাটের বুনো রাস্তা ধরে হাঁটছি। নদ, দামোদর সামনে। সেই দামোদর। বিদ্যাসাগরের সাঁতার নদ। বর্ষার ডুব জল? ধুস্! এখন সম্বৎসর হাঁটু ডোবে না, বালি তুলে নিয়ে যাচ্ছে লরির পর লরি। দেখছি। ঝাপসা চোখে। দূর থেকে দেখা যাচ্ছে বাঁশের সেতু। বাইক-সাইকেল আরোহী পারাপার করছে। লোকজনও।

ডানহাতে কাঁঠাল বাগানের নীরব ছায়া টপকে চলেছি দক্ষিণ মুখে ওই ফেরিঘাটে। পথে দেখা সাইকেলে কন্যাশ্রীর সঙ্গে। মুহূর্ত আলাপে টপাটপ ক্যামেরাবন্দী করল নিজেকে। আসছে শম্ভুপুর থেকে। মা'কে অঙ্গনওয়াড়িতে পৌঁছে দিয়ে। কৃষ্ণকলি কিশোরীর শুদ্ধ মায়া আলোয় ভিজতে ভিজতে উঠে পড়লাম বাঁশ সেতুতে। মাঝখানে এসে দাঁড়ালাম। বেলা বারোটা। সূর্য পোড়াচ্ছে না। জলে তার বৃষ্টিছায়া। অনেক দূরে বালিতে মেঘনাচের ছবি তুলছে দুই রাই কিশোরী। বিশুদ্ধ নির্মল ওদের সইযাপন। ছবি তুলে নিলাম। পশ্চিমে খুঁটোয় বাঁধা বালি নৌকো। সারে সারে। দু'একজন মালো স্নান সারছে। সেতু পেরিয়ে ওপারে গেলাম। সেতুর লিজ্ মালিক মনোরঞ্জন সাহানা আর দেবপ্রসাদ ধারার ছাউনিতে বসে ওদের সঙ্গে মেতে গেলাম খোশ গল্পে। সেতু পারানি দু'টাকা মাত্র। তিন বছরের লিজ্ মেয়াদ। মূল্য– তিন লাখ। তা মিটিয়ে আবার লিজ্ নেওয়া নতুন চুক্তিতে। মনোরঞ্জনবাবুর কাছে জেনে নিলাম এপারে অনেকগুলো গ্রাম। জামদহ। উত্তম চাঁদপুর। হৈবতপুর। চক্ষণ জাদি। আর যে পার পেছনে? সকালে যেখানে পৌঁছলাম কলকাতা থেকে। সে পারের নাম? বলিনি? পাল্লা। পাল্লারোড স্টেশন থেকে মাত্র দু'মাইল। বর্ধমান জেলার মেমারী বিধানসভার অন্তর্গত। প্রকৃতি বাঁধানো অপরূপ আশ্চর্য এ পাল্লা গ্রাম। মানুষ এখানে চাষেবাসে মেতে। শান্ত উদার এ পল্লীপুর। কিন্তু দামোদর? পুরুষ দামোদর। ধুঁকছে সে। তবু লড়ছে। একা। এখানেই হয়ত তার পৌরুষ। বলছে, আছি রে, শালো! না হলে মরতে এলি কেন আমার কাছে?

আবার ফিরে আসছি বাংলোয়। রাস্তার পাশে দুই প্রৌঢ় রাখাল। আলাপ। আলাপ। দ্বিজদাস সাঁতরা আর কেষ্ট সর্দার। গরু ছাগল চরিয়ে দিন গুজরান। তবু কী অসীম নির্মল হাসিতে ওরা খুশি জীবনের অংশীদার!

বেলা এখন বিকেল পাঁচটা ছুঁয়েছে। লালমাটির বাঁধ ধরে চলেছি পাল্লার পশ্চিমে। সেই ডাক। কোকিল আর বেনে বউ-এর। এ রাস্তা সোজা বড়শুল পর্যন্ত গিয়েছে। বাঁ হাতে সন্ন্যাসী দামোদর। সামনে অশোক চূড়ার পাতায় অন্ধকার আঁকতে আঁকতে চলে যাচ্ছে বেলা ফুরোনো সূর্য। গায়ে মেঘ মেঘ চুমু। আকাশে উল্টোফেরিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে চাঁদ প্রহর। আজ যে পূর্ণিমা। চাঁদকে নতুন করে পড়তে এই পাল্লা গাঁয়ের ধুলোর খেয়ালে সকাল সকাল আসা। জানি না, এ চাঁদ সভায় কেমন আলোয় ভিজব আমি।

চাঁদ ছিল। এখনও আছে। স্বমহিম। নিশুত দেশের বুদ্ধ চাঁদ। জামরুল গাছের মাথায়। তারাদের ছাদে। সপার্ষদ। নিচে দু'একটা জোনাকি। মিটিমিটি জ্বলছে। নক্ষত্র দোসর।

থেকে থেকে গাছের কোটরে প্যাঁচার চ্যাঁ... চ্যাঁ...। জাগতিক রহস্যে মোড়া আলোর জাদুপুর। বুঝতে পারছি, ছায়ার মতো দুলছে নিদ্রাতুর পাখিরা। নিশাচর অস্তিত্ব আঁকা স্তব্ধ পাল্লা গ্রাম। নৈঃশব্দ্য ভেঙে হঠাৎ হঠাৎ ভেসে আসছে দূরগামী ট্রেনের দুরন্ত হুইসেল। আমি জেগে। হয়ত আরও কেউ কেউ। আমার বহর মাপছে। চৈতন্যের স্পন্দন গুণে নিচ্ছে সেই ঈশ্বরপ্রকৃতি। হয়তো তার সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার। ওই দামোদরের ধারে টায়ার দোলনায় গেঁয়ো কচিকাঁচাদের ঝলমলে বিকেলে। ওই কলানবগ্রামের ঝাঁকড়া বটের ছায়ায় আঁকা সন্ধেমণির ভাষায় হয়তো সে ঈশ্বরের আবাস।

রাত বাড়ছে। অন্ধকার দীর্ঘ-দীর্ঘতর আলোয় পায়চারি করছে। সঙ্গে নাচছে ঝাঁকড়া ওই শিরীষের ভূতছায়া। নিরীক্ষণশালার অরণ্যদেশের আদিবাসীরা আলাপে মেতে। সে আলাপের ভাষা আমার অচেনা। নীরবতার থেকেও গভীর সংকেতে মোড়া সে ভাষার ধরতাই। আমি তো ক্ষুদ্র নরজাতক! আমার কাছে সে শুধু অকারণ পুলকের বিস্ময়ঘোর। সেই ঘোরে ফিরে যাচ্ছি ঘুমপুরে। কানে ভেসে আসছে অতীন্দ্রিয় নিশি বিলাসের বুনো মালকোষ।

ভোর সাড়ে পাঁচটা। পুবমুখো হাঁটছি। সূর্য উঠে আসছে পাল্লাপুরের বকুল গাছটাকে চুমু ছুঁড়ে দিয়ে। ডানে দামোদর। বালির লরিগুলো এই সাত সকালেও ছুটি দেয়নি তাকে। দু'একজন মানুষ পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে। নির্বিকার। অসহায় আত্মসমর্পণে জেগে উঠছে পাল্লার নদ-বাড়ি।

ফিরে যাব। কলকাতায়। ফিরতেই হয়। আবার সামনে পা মেলার জন্য। পাল্লার সোনার মুহূর্তরা হয়ত কাল-পরশুর আয়ুযাপনের দুর্লভ পুঁজি হয়ে থাকবে। অন্য কোনও পথের মেলায় টেনে নিয়ে যাবে আরও একবার।

প্রয়োজনীয় তথ্য

পাল্লায় বছরের যে কোনও সময় যাওয়া যেতে পারে। এখানে থাকার জন্য যোগাযোগ– সেচ ও জলপথ দপ্তর/পশ্চিমবঙ্গ সরকার/ জলসম্পদ ভবন/সল্টলেক/কলকাতা/ফোন নং-(০৩৩) ২৩২১-৫২০৪। এছাড়া সরাসরি যোগাযোগ– সেচ-জলপথ বাংলো/পাল্লা রোড/ফোন নং-৯৪৩৪৬৯০০৩৫।

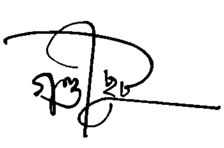

পরিচিতি

অচিরাচরিত ভ্রমণে বিশেষ আগ্রহ– কলমে নিখুঁত প্রকাশ।

উলটোরথ

অমিতাভ সেনগুপ্ত

মৎস্যজীবী

ছবি- অমিতাভ সেনগুপ্ত

ঘুমিয়ে রাত কাবার বাসে। ভোরে শহীদ মিনার, ময়দান, মেয়ো রোডে হাত-পা ছাড়ান পুরুলিয়া, বাঁকুড়া কিংবা মেদিনীপুর, বীরভূম। সকালে চিড়িয়াখানা। মেট্রো রেল। কালীঘাট। মা'র বাড়ি। তিনশো বছর পার কলকাতার কালীমাহাত্ম্য আগে যা ছিল এখনও তাই। মহাতীর্থ। পুজো চড়ালে বউ বাচ্চার মঙ্গল। আঙুল সাইজের লাল টকটকে তিলক। ভক্তির রং নীল-সাদা হয় না। রামচন্দ্র সত্যযুগে একশো আটটা নীল পদ্ম দিয়ে দুর্গা পুজো করেছিল। এটা ঘোর কলি। রুমাল বাঁধা প্রসাদের চ্যাঙারিতে জবা ফুল, প্যাঁড়া। বারোটা বাজতে দেরি আছে। বারোটা বাজলে দিদি আসবে। ভাষণ হবে। হাততালিতে ফেটে পড়বে ধর্মতলা। টিভি ক্যামেরা আসবে। মুখ দেখান চাই। সামনের দিকে বসতে হবে। দিদিকে দেখা যাবে। টিভিতে নিজেকেও দেখানো যাবে।

বাংলা মাতোয়ারা কলকাতা উৎসবে! কলকাতা মানেই তো বাংলা। বাংলা মানেই কলকাতা। সহজ সমীকরণ। সবাই যখন কলকাতামুখো আমি উলটোমুখ কালো কাচ লাগানো বাতানুকূল এস ইউ ভি-র পুশ-ব্যাক সিটে সওয়ার। মরমিয়া গেট-ওয়ে! মধুকবির 'রাজেন্দ্র সঙ্গম'। পরিভাষায় ইলাহি। সফল বণিক, তথ্য-প্রযুক্তিওয়ালারা স্পনসর। দামি পারফিউমের গন্ধ। কুড়মুড়ে লে-স চিপস। ঠান্ডা ঠান্ডা কুল কুল থামস-আপ। ফ্লাস্কে গরম ব্ল্যাক কফি। রেসকোর্স। খিদিরপুরের রাস্তা। বিদ্যাসাগর সেতু। জি পি এস দেখায় এন এইচ ১১৭। কোণা ডায়মন্ড হারবার হাইওয়ে। কোথা তুমি ঘনশ্যাম? বাঁকুড়া-শ্যামপুরগামী এন এইচ ১৬? গাধা পিটিয়ে কস্মিনকালে ঘোড়া হল না। ভীমরতিপ্রাপ্তের আন্তর্জাল চর্চা বৃদ্ধ বয়সের সন্তানের মতো নিয়ন্ত্রণহীন। চালক কাম মালিক ভারী বিনয়ী হাই-হ্যালো সুদর্শন যুবা। কলকাতায় বছর পনেরোর বাসিন্দা। আশ্বস্ত করে বলে বাগনান মোড় থেকে বাঁদিক বেঁকে বাঁকুড়া-শ্যামপুর রাস্তা।

বাঁকের মুখে সরু রাস্তার পঁচানব্বুই ভাগ জুড়ে ধর্মতলা সমারোহগামী 'মা-মাটি-মানুষ' বাস-বহর। নানাবিধ ডায়না বাঁয়া ভেঙ্কিতে ট্র্যাফিক ম্যানেজে ব্যস্ত ফেট্টি, গুটোনো আস্তিন। এক এক করে ছাড়পত্র পাচ্ছে। ফাঁড়া কাটে রেলব্রিজের মাথায় চড়ে। এরপর চৌত্রিশ কিলোমিটার। হাটবাজার, লোকালয় মাঠ পেরনো। কিছুটা গিয়ে ডাইনে বাঁক। বৃষ্টিভেজা রাস্তা শুনসান। দুধারে হাত ধরাধরি শিরিষ গাছেরা ঘন ছায়াবীথি তৈরি করেছে। ধান খেতে রোয়া, নিড়ানির কাজে উপুড় শরীর খেতিদার অথবা খেতিদারের দিনমজুর। পুকুর, হাঁসের দল, বাসন মাজা বৌ-ঝিরা। একশো বছর হতে যায় আজও আঁচড় লাগেনি সত্যেন দত্তের গ্রামীণ বাংলার পটে। ভুল হল। ডিলিট হয়েছে পাল্কি দেখে ছুটে আসা মাথায় পুঁটে ন্যাংটা খোকা। সে পাল্কি নাই, খোকাও নাই। উধাও বালখিল্য বিস্ময়।

জলডাঙার নো ম্যানস ল্যান্ডে হু হু ছড়িয়েছে আকাশ। সর্বদা চোখে চোখে রেখে মাটি তাকে আঁচল বাঁধা শিশুটি বানাতে চায়। জলের সীমান্ত নেই। আকাশ দুরন্ত তাই। নদীগর্ভ থেকে অনেকখানি উঁচুতে পশ্চিম পাড়ে মোরামের আঁকাবাঁকা রাস্তা। জেটি ছাড়িয়ে বাঁদিকে ঘুরে সরকারি অতিথি নিবাস রূপনারায়ণ লজ। রূপনারায়ণ, দামোদর দুই নদ এসে হুগলি নদীতে মিশেছে গাদিয়াড়ায়। এটাই স্থান মাহাত্ম্য। ভরা বর্ষার গেরুয়া স্রোতে কে কোনজন চেনা অসম্ভব। একজন জানায় দুই নদ হুগলিতে পড়েছে দুটো আলাদা দূরত্বে। সে জায়গা এখান থেকে আরও দূর। সামনে প্রশস্ত-স্রোত হুগলি তিনভাগে ভেঙেছে ভূখণ্ড। পূবে নূরপুর, চব্বিশ পরগণা। পশ্চিমে গাদিয়াড়া, হাওড়া। দক্ষিণে গেঁয়োখালি, মেদিনীপুর। দমকা বাতাসে দোলে ইউক্যালিপটাস।

জোয়ারের অপেক্ষায় নদী। রূপনারায়ণ লজের সাইনবোর্ডের বাঁ-পাশটা অমন দুমড়ে ফ্রেম থেকে কেন ঝুলন্ত কোনও প্রাকৃতিক নাকি মানুষিক সংক্ষোভে বোঝার উপায় নেই। ভালো করে লেখা পড়ে ওঠার আগেই তাড়াহুড়োয় খানিক গড়িয়ে যায় গাড়ি। ফের পিছু হটা। মূল রাস্তা ছেড়ে ডাইনের ঢালে নেমে বড়ো ফটক। অনেকটা জমি নিয়ে ব্রিটিশ কেতার ইট-রং ঝকঝকে দোতলা বাংলো। নদীমুখো প্রশস্ত টানা ঝুলবারান্দা। খড়খড়ির লম্বা জানলা, ভারী পাল্লার দরজা সব বন্ধ। সিমেন্টের লাল মেঝে। 'জলসাঘর'-এর বিশ্বম্ভর রায়ের মুখখানা ভুড়ভুড়ি কাটে কেন কে জানে। নিমতিতা রাজবাড়ি রূপোলি পর্দাতেই দেখা। স্বচক্ষে নয়। সে তো রাজার বাড়ি। এ তবে বাগানবাড়ি? সায়েব সুবোর নাকি স্থানীয় কোনও রাজপুরুষের? গাদিয়াড়ার ক্লাইভ কানেকশনস এক লাইনেই সেরেছে উইকিপিডিয়া। অনুমান, ওলন্দাজ নৌবহরের চলাচলের নজরদারি করতেই গাদিয়াড়ায় দুর্গ বানিয়েছিল ক্লাইভ। ১৯৪২'র দারুণ তুফানে তার ভগ্নাবশেষ বিলীন হল। নদীগর্ভে চলে যাওয়া ভগ্নাংশ নাকি দেখা যায় শীতের মরসুমে ভাঁটায় জল নেমে গেলে। প্রশস্ত আঙিনায় ঝাঁকড়া পুরোনো গাছ, ছত্রী লাগানো বসার জায়গা। যত খুশি নদী দেখা। রিসেপশনে যেতে কুঠির পিছনে কেয়ারি করা বাগান বর্ষায় ঘেঁটে অবিন্যস্ত। মনিটর লিজার্ডের (গোসাপ) বাচ্চা বন্ধ বাংলোর রোয়াকে ঘুরছে নিশ্চিন্তে। হয়তো বন্ধই রাখা হয় বাংলো। এ বঙ্গে হেরিটেজ সংরক্ষণ দুই কিসিমের। এক- ভেঙে গুড়িয়ে প্রমোটিং, দুই- সংস্কারের নামে চড়া রঙের মোক্ষম পোঁচ। এর কপালে কী অপেক্ষা করে প্রভু জানবেন।

দুপুরের খাবার অগ্রিম অর্ডার দেওয়া রিসেপশনে। রাস্তায় দাঁড়ানো খানতিনেক সাইকেল ভ্যান চালকের বায়না– চলেন গঙ্গা মন্দির। নদীর পাড় ধরে পথ। জোয়ার লেগেছে। জাল বাড়ছে আস্তে আস্তে। চোখের সামনে তলিয়ে যায় মুহূর্ত আগে দেখা সবুজ ঘাসের একফালি চড়া। জেলে নৌকা ঘাটে বাঁধা। উঁচু পাড়ের ঘাসজমিতে বসে জাল বুনছে জেলেরা। পাশে সাইনবোর্ডে সরকারি নিবেদন, ছোটো ইলিশ ধরবেন না। জলের রুপোলি ফসল বাঁচান। হঠাৎ নজরে পড়ে ইউক্যালিপ্টাসের আড়ালে চলে যাওয়া পরিত্যক্ত লাইট হাউস। কবে কখন তৈরি, কেনই বা এখন অচল পড়ে আছে নাড়িনক্ষত্র জানবার উপায় নেই। দেখে মনে হয় না খুব বেশি পুরোনো দিনের। ক্লাইভের আমলের নয় ধরা যেতেই পারে। হলে কী আর অক্ষত থাকে বেয়াল্লিশের সাইক্লোনের পর?

জোয়ার ফুঁসছে। ঘণ্টা খানেক আগেও দেখা যাচ্ছিল সাবেক ঘাটের নোনাধরা ইটের সিঁড়ির ধাপ। তাদের ছাপিয়ে উপরে উঠে এসেছে জেটির সেতু ছুঁইছুঁই জল। বৃষ্টি নামে না। রাস্তার বাঁদিকে ধান খেত, তাল, বাবলার সারির উপর সবুজ কালোর রঙিন চাঁদোয়া সরিয়ে নেয় ঝোড়ো বাতাস। আকাশের ফাঁকফোকর ঝকঝকে নীল। হলদিয়াগামী দুখানা কনটেনার জাহাজ একটানা ভোঁ বাজিয়ে জল কেটে চলেছে। বহুযুগের পার হতে ভেসে আসা বহুদিনের চেনা আওয়াজ, অনেক স্মৃতি। কলকাতার কলকারখানাগুলোই ভোঁ হয়ে গেল। গেঁয়োখালি যাবার ফেরি জেটি ছেড়ে গেছে। পরেরটা আধঘণ্টা বাদে। ছাড়তে তৈরি নূরপুরের লঞ্চ। সাত টাকা ভাড়া। মিনিট কুড়ি সময় লাগে। লঞ্চ এগোয় জোয়ারের নদী সাঁতরে। ঢেউয়ের কাঁপুনি দ্বিগুণ করে ইউটার্ন নেয় সাগরমুখো জাহাজ। লঞ্চ দুলে ওঠে মোচার খোলার মতো।

ফেরিঘাট নেই নূরপুরে। আট দশ ইঞ্চি চওড়া পাটাতন ফেলে মাল্লা দাঁড়িয়ে পড়ে একটা লম্বা বাঁশের লগি ধরে। ওটা হাতল। সিঁড়ির ব্যানিসটার। ওইটি কোনওমতে ছুঁয়ে পেরিয়ে যাওয়া ফুট পাঁচেক ফারাকে তরী হতে তীর। আঁকড়ে ধরাও যাবে না। সার্কাস ট্রাপিজের কেরামতি। এ সঙ্কটে দিশাহারা ট্যুরিস্ট। এই পড়ে তো সেই পড়ে। পড়লে ভরা ভাগীরথী। ভাসবে কী ডুববে সে চিন্তা পরের। আপাতত ইজ্জত বাঁচানো দায় গেঁয়ো হেটো লোকজনের ভিড়ে। ট্যুরিস্ট বাবুদের দেখে দেখে অবশ্য চোখ পচিয়ে ফেলেছে তারা। জানে কখন আসে, কী খায়, কী পরে, কী দেখে। কখন তাদের কী দরকার, বোলচাল, গায়ের গন্ধ সবকিছু চেনা তাদের। তারা যে যার পথে হাঁটে। পড়ে মরলে না মরে পড়লে তাদের থোড়াই মাথাব্যথা। কাঁপতে কাঁপতে মাঝামাঝি এসে কাণ্ডটা ঘটে যায় আর কি। খপ করে হাত ধরে নেয় ফিরতি ফেরির অপেক্ষমান যাত্রীদের একজন।

সাগরগামী বিশাল জলযানের খোল তৈরি হচ্ছে কাঠের তক্তা সাইজ করে কেটে, চাপে বেঁকিয়ে। অনেকখানি জায়গা নিয়ে টিনের আড়াল দেওয়া। অনেক কারিগর কাজ করছে। উলটো দিকে মাদার টেরিজার আশ্রম। প্রতিবন্ধীদের জন্য। নদীর এপাড়েও তালের সারি। কালো হাঁড়ি তাল গাছ ভরতি। কেউ কি পেড়ে খাবার নেই! লাঞ্চের সময় উত্তীর্ণ। গাদিয়াড়ার লঞ্চের সময় আধঘণ্টা বাদে। বিরাট অশ্বত্থের ছায়ায় অপেক্ষা করা। লঞ্চ আসে। ফিরে আসে সেই গোরুর ল্যাজের মতো বাঁশের লগি ধরে বৈতরণী পেরবার আতঙ্ক। এবার ডেকে জায়গা পাওয়া গেছে বেশ খানিক সময়ের জলযাত্রায়। নূরপুরের নির্বাচন পরবর্তী পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করেন দুই স্থানীয় সহযাত্রী। খুব স্বাদু নয় তার টুকরো টাকরা স্পিলন্টার।

বেলা তিনটে বাজে। পান্থশালা যাবার পথে জোয়ারের কোমর জল ভেঙে মশারি-জালে বাগদা মীন ধরছেন ভিজে সপসপে মহিলারা। সুন্দরবনে দেখেছি। এই কাজটা বাড়ির মেয়েরাই বেশি করেন। অসম্ভব ধৈর্য্য, হাড়ভাঙা এই খাটুনি পুরুষদের বোধহয় সয় না। এই কাজে নেমে সুন্দরবন অঞ্চলের অনেকের অঙ্গহানি হয়েছে কামঠ কুমিরের আক্রমণে। এক মধ্যবয়সী মহিলা পাড়ে উঠে সারাবেলার সংগ্রহের ধাতব পাতিলটি থেকে খেপে খেপে গুগলির খোলে এক খোলা জল তুলে খড়ের গাদায় সূচ খোঁজার মতো একটি একটি করে বাছছেন বাগদা মীন। বাছাই রাখবার পাত্রটিতে গুনেগেঁথে তিরিশ পঁয়ত্রিশটি হবে বড়জোর। একশো মীনের দাম পঞ্চাশ টাকা। পাশে বসা মানুষটির বয়স আন্দাজ করা যায় না। মুখ দিয়ে লালা ঝরছে অবিরাম। ময়লা ছেঁড়া ধুতি কোনওমতে কৌপিনের মতো জড়ানো। হাতের কবজি বেঁকে দুমড়ে আছে। মহিলা একবার মুখ তুলে চাইলেন তারপর ফের ডুবে গেলেন নিজের দৈনন্দিনে। লোকটি কয়েকখানি নুড়ি পাথর নিয়ে আপনমনে খেলছে। আমাকে দেখবার কৌতূহল জাগে না তার।

লেখক পরিচিতি

স্বেচ্ছাবসরের পর নানান পত্র-পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। সুলেখক।
ছবি তোলায় মুন্সিয়ানা আছে।
২০০৯-'ভ্রমণ আড্ডা'র 'কলম সম্মান' প্রাপক।

‘রস’পুরের অন্তঃপুরে

সমর্পিতা সরকার

বিশ সাল বাদ। আবারও এলাম। সেবারে তুমি ছিলে সাথে। এবারে আমার সঙ্গী কেবল নির্জনতা। ফুল ফুটুক না ফুটুক, সেদিন ছিল বসন্ত। থুড়ি শীত। তবে শহুরে আমেজে বসন্তই বটে। অকাল বসন্ত। শীতের ছুটি শুরু হয়েছে পঁচিশে ডিসেম্বর থেকে। আজ সাতাশ। বাঙালির শীতগান– ‘প্রিয় যাই যাই বোলো না।’ চঞ্চল মন আনমনা হয়ে জায়গা খুঁজছিল ইতিউতি– নিষ্কৃতির, মুক্তির। শয়নে স্বপনে জাগরণে। স্বপ্নাদেশ পেতে দেরী হয়নি। চলো একবার ফিরসে। বাঁকুড়ার অখ্যাত গ্রাম ‘লাগডিহি’তে। জীবন গিয়েছে চলে এক কুড়ি বছরের পার। অদূরে কাঁসাই ও কুমারী নদীর সঙ্গমস্থল—মুকুটমণিপুর।

লাগডিহিতে তখন সবেমাত্র শীতের হাওয়ার নাচন লেগেছে। জঙ্গলে বনে গ্রামে গ্রামান্তরে। দুপাশে সর্ষেক্ষেতে সোনায় বরণ ছোঁয়া। মাঝখান দিয়ে সোনালি হলুদের বুক চিরে আঁকাবাঁকা সর্পিল লালে রাঙা মেঠোপথ। সেবারে এই পথ ধরে, ঘুঘু-ডাকা ভোরে, মনে আছে, দুজনে পায়ে পায়ে চলে গিয়েছিলাম দূরে– বহুদূরে? চারদিকে অনতি উচ্চ টিলার সারি। তাদের গায়ে, পাথরের খাঁজে, ফাঁকে ফোঁকরে কোথাও হালকা, কোথাও বা ঘন জঙ্গল। কত নাম না জানা ছোটো-বড়ো গাছ-গাছালি। বুনো ফুলে ফলে ছেয়ে আছে কোন কোনটি। কোনটায় আবার শুধুই সবুজ কচি পাতার আবরণ। মাঝে মধ্যে দাঁড়িয়ে দু-একটা পর্ণমোচী গাছ, সদ্য পর্ণ মোচন করে আত্মশ্রাদ্ধ সেরে উঠেছে যেন। হালকা জঙ্গলে ঘাসফুলে চশমা ফড়িং। সঙ্গীনীসহ উড়ে বেড়াচ্ছে জোড়ে, ফুল থেকে ফুলান্তরে।

হলদে সবুজ সর্ষেক্ষেতের মধ্যে, মাঝে মাঝে বেশ দূরে দূরে ফাঁকা জায়গায় গড়ে উঠেছে গ্রাম্য বসতি। কোথাও বা সদ্য কর্ষিত আবাদী জমি। শীতের কাকভোরে গ্রামের মেঠোপথে হাঁটছিলাম। চোখে পড়ছিল বিচিত্র সব দৃশ্যপট। কোথাও চাষী লাঙল-বলদ নিয়ে জমির কাজে ব্যস্ত। কোথাও বা অপরিপক্ক বুনো কুল দিয়ে ছাগলছানার দলের প্রাতরাশ। গ্রামের ছোট্ট জলা-ডোবায় গ্রাম্যবধূদের বাসি এঁটোবাসন মাজার ঠুং-ঠাং শব্দ। রাতের নেভা উনুনের ছাই দিয়ে গ্রামবাসীদের দন্তমার্জনা। ইতিউতি কচিকাঁচার দল। তাদের গায়ে অদ্ভুত কায়দায় চাদর জড়িয়ে গলার পিছনে গিঁট বাঁধা। বাঁশপাতি, হাঁড়িচাচা, বসন্তবৌরী, শালিখ, কাঠঠোকরা, চড়াই সহ নানা চেনা অচেনা পাখির কলকাকলিতে চারিদিক মুখর। তারই মাঝে হঠাৎ হঠাৎ ভট ভট শব্দ করে অদ্ভুতদর্শন মোটরচালিত ‘ভ্যানো’ গাড়ির, প্রাত্যুষিক নিস্তব্ধতাকে তর্জন গর্জন করে ভয় দেখিয়ে, ছুটে চলা। আর ‘ভ্যানো’র পিছনে পিছনে সবুজ বালকদের ছুট-উল্লাস। সবই চলছে অত্যন্ত ধীর লয়ে। কাউকে এখানে সাড়ে দশটার স্কুলবাস বা ন’টা কুড়ির অফিস লোকাল তো আর ধরতে হবে না।

সবকিছু ছাপিয়ে একসময় অনতিদূরে চোখের লেন্সে ধরা দিল গলায় হাঁড়িবাঁধা সারিবদ্ধ খেজুর গাছ। আহা! অমৃতরস। খেজুর গাছের উৎস হতে উৎসারিত ধারা-নির্ঝর। ফিরিয়ে দিল শৈশব কৈশোরের মফস্বলের স্মৃতি। কুয়াশা জড়ানো ভোর। হাতখানেকের বেশি দূরের সবকিছু একেবারে ঝাপসা। হাড় কাঁপানো শীতের কামড়ে ধরাশায়ী নাগরিকজন। খেজুর গাছের অভাব ছিল না। শীতের আনুষঙ্গিক আকুতি ছিল– ‘রস খাবো’– ‘একটু রস চাই’। ‘আরও শীতার্ত হতে চাই’। বাঁকুড়ার অখ্যাত এই গ্রাম্যপথে সেই অমৃতরসের ভাণ্ডার এই মুহূর্তে ভ্রাম্যমান আমার দৃষ্টি সীমাতে। হাতের নাগালে।

গলায় হাঁড়িবাঁধা খেজুর গাছের সারি দেখে প্রথমেই ইচ্ছে হল ছোট্টবেলার মতো লাফিয়ে গাছ বেয়ে উঠে হাঁড়িশুদ্ধু রস নামিয়ে এনে আকণ্ঠ পান করি। কিন্তু বয়স অতি বিষম বস্তু। ওঠার ক্ষমতা যদিও বা একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়নি, তবু শৈশবে তো আর নেই! গ্রামের লোকে দেখলে বলবে কি? –এদিক ওদিক ইতস্তত তাকাতেই চোখ গেল অনতিদূরে শুকনো খেজুর পাতায় ছাওয়া ছোট্ট পর্ণকুটিরের দিকে। সেদিকে এগোতেই চোখে পড়ল এবড়ো খেবড়ো অক্ষরে চুন দিয়ে হাতে লেখা সাইনবোর্ড– ‘এখানে বিশুদ্ধ খেজুরের রস পাওয়া যায়। উত্তম ঝোলাগুড় এবং সুস্বাদু পাটালিও পাওয়া যায়।’

সেবারে আমরা দুজনে যখন এসেছিলাম, তখন এই রসের আখড়ার কিন্তু কোনও অস্তিত্ব ছিল না। মনে পড়ে, তোমার কাঁধে হাঁটুর ভর রেখে অর্ধেক দাঁড়িয়ে নিচু একটা খেজুর গাছ থেকে দুজনে মিলে হাঁড়িভর্তি রস নামিয়ে এনেছিলাম! সোজা হাঁটতে হাঁটতে হাঁড়ি নিয়ে চলে গিয়েছিলাম বেশ কিছু দূরের এক চায়ের দোকানে, দোকানদারকে রস খাওয়ানোর শর্তে জোগাড় হয়েছিল কাচের গ্লাস। শেষমেশ দোকানি, খদ্দের সহ আমরা সবাই মিলে রসের মোচ্ছব করেছিলাম। আকণ্ঠ রস খেয়ে দুজনের পাকস্থলী এতটাই টইটম্বুর হয়ে গেছিল, যে গেস্টহাউসে ফিরে এসে আমরা লাঞ্চ স্কিপ করে গেছিলাম! রাতের বেলাতেও ছিল দুধ, ঝোলাগুড় আর হাতরুটি। সত্যি, সেবারে বড়ো জমেছিল আমাদের রস-উৎসব!

এবারে রসের আখড়াটি দেখে, বুকের পাঁজরের ভিতর যে লোভী মনটার বাস, তার তো আনন্দে আত্মহারা হবার জোগাড়। কুটিরের সামনে ছোট্ট উঠোন জুড়ে রয়েছে টাটকা রসে ভরা অসংখ্য হাঁড়ি। সদ্যই গাছ থেকে নামানো হয়েছে। একজন বৃদ্ধ ‘চাচা’ সেগুলির তত্ত্বাবধানের কাজে ব্যস্ত। আমার মতোই গুটি গুটি পায়ে সেখানে তখন এসে জড়ো হয়েছে আরও জনাকয়েক রসপিপাসু মানুষজন। আমাদের রস খাওয়ার আবেদনে ‘রসচাচা’ হাঁড়ি থেকে সেই সুমধুর অমৃত

পানীয় গড়িয়ে কাচের গ্লাসে করে মুখের সামনে ধরলেন। মনে পড়ে গেল আমাদের ছোটোবেলাতে বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে শীতের দিনে প্রতি সকালে এইরকমই আর এক 'রসচাচা' কাঁধে বাঁক নিয়ে তাতে রসের হাঁড়ি ঝুলিয়ে রস ফেরী করত। 'রস! এসে গেছে রস!' 'চলে গেল রস!' তারপর একটু আলাদা রকমের জোড় দিয়ে– 'খাইলে শান্তি রস!'

তো সেই 'খাইলে শান্তি রস' ভরা গ্লাস আমার হাতের মুঠোয় এখন। মৌজ করে রসের গ্লাসে বেশ সুড়ুৎ করে আওয়াজ করে দিলাম তৃপ্তির প্রথম চুমুক। আহ! অপূর্ব– কী প্রশান্তি! ঠোঁট থেকে পাকস্থলী পর্যন্ত পুরো পথ দিয়ে ঠান্ডা শীতল রসের আস্বাদন গ্রহণ করলাম। একেবারে সর্বান্তঃকরণে! অতঃপর দ্বিতীয় চুমুক... তৃতীয়... চতুর্থ... চুমুকে চুমুকে চমৎকৃত আমি। বাইরে প্রকৃতির ঠান্ডা। ভেতরে রসের শীতলতা– ঠান্ডায় পুরো কাঁপুনি ধরে গেল আমার। প্রথম গ্লাস শেষ হলে আরেক গ্লাস– তারপর আরেক গ্লাস– খালি মনে হতে লাগল আরও খাই... আরও... আরও...

ক্রমশ চারদিকে রসপায়ীদের ভিড় বাড়তে লাগল। সকলের রসতৃষার নিবৃত্তি ঘটলে রসের বাণিজ্য শেষ হল। অবশিষ্ট রস চালিত হল উনুনে। উনুন বলতে হাতখানেক গভীর করে মাটি খুঁড়ে তৈরি একটা লম্বাটে গর্ত। গর্তের একধারের মাটি অল্প গভীর করে খুঁড়ে একটা নলাকৃতি মুখের ব্যবস্থা রয়েছে। সেখান দিয়ে জঙ্গল থেকে সংগৃহীত শুকনো কাঠ পাতার জ্বালানি চালিত হচ্ছে উনুনের ভিতরে। উনুনের উপরে উনুনের মাপে লম্বাটে, বিঘৎখানেক গভীর একটা ট্রে-জাতীয় অ্যালুমিনিয়ামের পাত্রে রস জ্বাল দেওয়ার ব্যবস্থা। লেলিহান অগ্নিশিখা ঘোলাটে সাদা রসে লাগিয়ে দিল ইটগুড়ো-লালের ছোঁয়া। গরম ঝোলাগুড়। অনেকেই কাচের শিশিতে বন্দী করে ঝোলাগুড় কিনে নিয়ে গেলেন। আমি একটু চেখে দেখতে চাইলাম। সঙ্গে সঙ্গেই প্রার্থনা মঞ্জুর হল। অনাস্বাদিতপূর্ব! অপূর্ব সুমিষ্ট গুড়।

ঝোলাগুড় বিলি বাঁটোয়ারা হলে পরে, পড়ে থাকা গুড় আরও ঘন করে জ্বাল দিয়ে পাটালির ছাঁচে ঢেলে ঢেলে রাখল 'রসচাচা'। কেজি তিনেক ঝোলাগুড় আর বেশ কিছু ছাঁচের পাটালি নিয়ে অধুনা শহুরে আমি রওনা হলাম আমার আপাত-আস্তানা গেস্টহাউসের দিকে।

ফিরে এসে ম্যানেজারের মুখে শুনলাম পৌষমাসে লাগডিহি গ্রামে একটি 'পিঠে-মেলা' হয়। দিনদুয়েক হল সেই মেলা শুরু হয়েছে। দুপুর গড়িয়ে এলে মেলা বসে। সন্ধ্যে সাতটা আটটার মধ্যে মেলার পসারিনীরা ঝাঁপ ফেলে দেয়। একেবারেই অখ্যাত মেলা। সেরকম প্রচার নেই। প্রথম দিকে শুধুই 'পিঠে- স্পেশ্যাল' ছিল। এখন বাজার চলতি ঝাল-নোনতা খাবার, চপ-সিঙাড়া, মুড়ি, ফুলুরিও পাওয়া যায়।

দুপুরে সামান্য নিরামিষান্ন খেয়ে বেলাবেলি রওনা দিলাম মেলার পথে। হাঁটতে হাঁটতে অল্পক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম। পরিসরে খুবই ছোটো। ক্ষুদ্র আয়োজন। গ্রাম্য বউ-ঝি-রাই পাচক। পুরুষ সদস্যরা বুঝে নিচ্ছে বিকিকিনির হিসাবের কড়ি। মেলাতেই তৈরি হচ্ছে হাতে-গরম খেজুর গুড়ের নানারকম পিঠে। বেশ বিকোচ্ছে। ক্রেতারা মূলত আশেপাশের গ্রামের স্থানীয় লোকজন। তবে আমার মতো দু-একজন শহুরে ভ্রামণিকও নজরে এল।

হরেক কিসিমের পিঠের সাথে পরিচয় ঘটল মেলাতে। দুধপুলি, ভাপাপুলি, মুগের পুলি, চন্দ্রপুলি, গোকুল পিঠে, নারকোলের পাটিসাপটা, ক্ষীরের পাটিসাপটা, দুধে নারকেল কোড়া, গুড় আর চালগুঁড়ো জ্বাল দিয়ে তৈরি পিঠে 'পালো', চুষির পায়েস, চালগুঁড়ো, ডালবাটা আর নারকেল বাটা দিয়ে তৈরি নোনতা পিঠে ইত্যাদি। দোকানগুলি ঘুরে ঘুরে পিঠে তৈরির কারুকৃতি দুচোখে যতটা দেখে নেওয়া যায় ততটাই মাথায় গেঁথে নিলাম। ফিরে গিয়ে চেষ্টা করে দেখব কতটা কী তৈরি করা যায় ঘরে। জানি তো, পিঠে খেতে বরাবরই তুমি খুব ভালোবাসো।

দিনদুয়েকের রসসিক্ত সফর শেষে ফেরার পালা। পাকস্থলীতে রসনার তৃপ্তিরস। মনস্থলীতে ভালোলাগার আকুলতা রস। রসের রসায়নে আমাদের ক্ষুদ্র নীড়টি জোনাক-জ্বলা বাবুই পাখির বাসার নিভৃত কোণের নির্ভরতা হয়ে উঠুক–

লেখক পরিচিতি

শিক্ষিকা, ভ্রমণ-বিলাসী।
ভ্রমণের অনুভূতি কলমে সাবলীল।

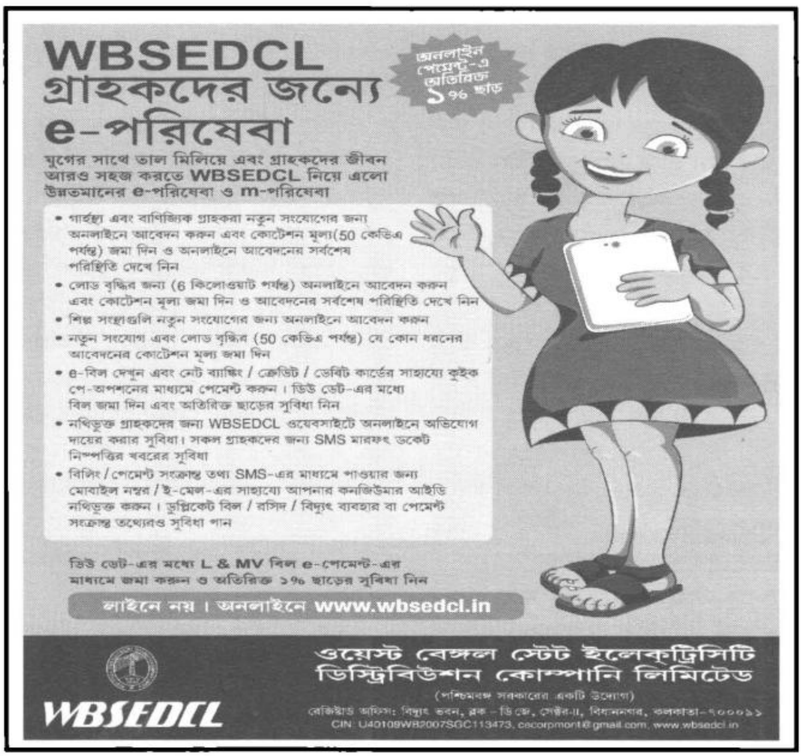

হর নর্মদে হর

অমিত আইচ

প্ল্যানটা ছোটো ভাই-বউ মিতুর। ঈশ্বর বিশ্বাসী। ভক্তিও ষোলো আনা। ওর এক মনস্কামনা ফলে গেছে। কী মনস্কামনা কিছুতেই বলছে না। পুজো দিতে চায় নর্মদামাইকে। বললাম, নিয়ে যাবি? ওরা রাজি। আহ্লাদে আটখানা। 'ওরা' কারা জানাতে হবে। মিতুর দিদি দিপু, জামাইদা মাধুদা, ছোটোবোন মিঠু, ওর বর বাবুয়া এবং ওদের আমুদে তিনকন্যা তিশন, তিন্নি, দিশা। মোট দশ। সকলেই ভ্রমণপটু।

পূর্ব-আয়োজন মতো বিলাসপুর ইস্টিশান থেকেই চারচাকা। একটা কথা বলা হয়নি, এই ট্রিপে বাবুয়া দলনেতা, কিছুটা স্বঘোষিত। তবে যোগ্যতা নিয়ে নো কোয়েশ্চন। আপাতত ওর খুসখুসে কাশি, ঘুসঘুসে জ্বর। বললাম, পেন্দ্রা রোড পর্যন্ত ট্রেন নয় কেন? উত্তর এল, ওটা হবে ফেরার পথে। এই পথে চলো না, বিন্দাস হয়ে যাবে। কথাটা মিলে গেল মিনিট চল্লিশ চলার পর। আমাদের ঘিরে ধরল গভীর স্নিগ্ধ এক অরণ্য। শাল, সাজা, সেগুনের আচানাকমার অভয়ারণ্য। নব বসন্তের কচিপাতার মত্তগন্ধ। গাড়ি থামাচ্ছি বারবার। এলোমেলো ঘুরছি। শ্যামলছায়ায় বসছি। আমার তিনকন্যা হারিয়ে যাচ্ছে কোনও টিলার পিছনে। ভেসে উঠছে অনেকদূরের কোনও সবুজবৃত্তে। বড়ো সুন্দর আঁকাবাঁকা পথ গিয়েছে আচানাকমার চিরে। মিশেছে মধ্যপ্রদেশের কানহা অরণ্যে। ছত্তিশগড়ের এই অভয়ারণ্যর ক্ষেত্রফল ৫৫৭.৫৫ বর্গকিলোমিটার। বিন্ধ্য-সাতপুরার পার্বত্যঅঞ্চল এখনও আদিমতায় নিথর। গাড়ির চাকায় শুকনো পাতার মরমর শব্দ— আজি মর্মরধ্বনি কেন বাজিল রে?

ঘণ্টা তিনেক পর থামলাম কেওচি-তে। কেওচি জংশনের মতো। এক পথ ঢুকে গেছে আচানাকমার জঙ্গল ভেদ করে কোটা ছুঁয়ে বিলাসপুর। আর এক পথ রতনপুর হয়ে বিলাসপুর। তৃতীয়টি সোজা অমরকণ্টক। ৩৩ কিলোমিটার। কেওচি জনশূন্য। দোকানপাট বন্ধ। মার্চ-মাসের তৃতীয় সপ্তাহেই সব শুনশান। অতিকষ্টে চা পেলাম। সঙ্গে গতকাল বাড়ি থেকে আনা লুচি-তরকারির অবশিষ্টাংশ। জঙ্গলের পথ ভেঙে শান্তিকুঞ্জ ধর্মশালায় যখন পৌঁছলাম, সাড়ে বারোটা। মালপত্তর রেখে সকলে চললাম নর্মদায় স্নান করতে। সে বড়ো আনন্দের, বড়ো আরামের।

সন্ধ্যায় গেলাম নর্মদা মন্দিরে। সন্ধ্যারতির প্রদীপশিখা, ঘণ্টাধ্বনি আর পুরোহিতের স্পষ্ট আন্তরিক মন্ত্রোচ্চারণে এক অপার্থিব অনুভব, নর্মদাকুণ্ডে উদ্ভূত নর্মদা। তার বাহ্যরূপ এই জল। এই কুণ্ডের ভিতর থেকেই সে নদীরূপে নিষ্ক্রান্ত। পশ্চিমে জল বের হবার নালা— গোমুখ। গোমুখ দিয়ে নর্মদা আর এক ছোটোকুণ্ডে ঝরে পড়ছে। নাম কোটিতীর্থ। কুণ্ডের মোজাইক চত্বরের চারদিকে ধোলটি মন্দির। আগ্নেয়শিলায় তৈরি। তার উপর সাদা রং চড়েছে। কোথাও কোথাও উঠেও গেছে, নয়ন সুখকর নয়। গভীরভাবে ভাবছিলাম সাদা রং কেন? কোন মতে? কোন বিশ্বাসে? হঠাৎ মনে হল কেউ পা ছুঁল। নীচে তাকাতেই হতবাক। নর্মদা মাই-এর এক ভক্ত। অন্ধভক্ত। তুলে ধরলাম। বললাম, কাকে খুঁজছেন? এটা কি অমরনাথজীর মন্দির? হ্যাঁ ঠিকই বলছেন। কিন্তু কীভাবে এলেন? ছুঁয়ে ছুঁয়ে। সারা শরীর কেঁপে উঠল— ভাবলাম, ঈশ্বর একেই প্রকৃত চক্ষুষ্মান করেছেন। কার্তিকস্বামী, গোরক্ষনাথ, গৌরী- শংকর, বিষ্ণু, নারায়ণ, মহাদেবজী, রোহিণীদেবী, পার্বতী, বালাসুন্দরী, একাদশী, মুরলীমোহন—প্রায় সব মন্দিরেই এই দৃষ্টিহীন স্পর্শ করেছেন।

রাজস্থানের এক বড়ো বিখ্যাত শহর উদয়পুর। শহর থেকে ৬০ কিলোমিটার দূরে যে গ্রাম, নাম তার বিজন। আশ্চর্য নাম তো! আরাবল্লির আবেশে সেখানে মরুভূমির উষরতা নেই। সবুজ প্রকৃতিতে লালনপালন এই অন্ধভক্তের— শ্যামসুন্দর সিং। আরাবল্লির শোভা সে দেখেনি, গন্ধে বুঝে যায় এই গ্রামই তার বিজন। সাদা ধুতি-পাঞ্জাবি, মাথায় পাগড়ি, হাতে লম্বা লাঠি। খোঁচা খোঁচা দাড়ি। লম্বা পুরু গোঁফ। ফর্সা ছিপছিপে শরীর। বয়স আন্দাজ করে বলি, ৭০ পার করেছেন? হ্যাঁ বাবু, ৭২। বাবু বলাতে জোর আপত্তি করলাম। হাজার হাজার বছরের নিষ্পেষণের ইতিহাস— বাবু বলতে হবেই যে! এমন রাসায়নিক পরিবর্তনের শেষ কোথায় জানা নেই। তুমি একা? সঙ্গে কেউ নেই? বাবু, ও তো ছিল। কোথায় গেল? একটু ইতস্তত করে হঠাৎ ডেকে উঠল, মণি তুমি কোথায়? সে ডাকের আকুলতায় নর্মদার জল কেঁপে উঠল। প্রতিধ্বনি উঠল। বিন্ধ্য-সাতপুরার অরণ্যানী উতলা হল। এবার শুনতে পাচ্ছি নূপুরছন্দ। কটকটে লাল-সবুজ শাড়ি এগিয়ে এল। এক নারীর চোখে জল, মুখে আতঙ্ক-দুশ্চিন্তা স্পষ্ট। শ্যামসুন্দরের সামনে এসে দাঁড়াল। শুনতে পাচ্ছি ঘন ঘন নিঃশ্বাসের শব্দ। ওর হাত চেপে ধরল। কান্নাগলায় বলতে লাগল, এমন আর কোরো না। আমার হাত ছেড়ো না। আমাকে দেখে লজ্জায় মাথা নীচু করে বলল, ধন্যবাদ বাবু। আপনি ধরে রেখেছেন বলেই ওকে পেলাম। বাবু ধন্যবাদ। পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। নির্বাক। এমন অযাচিত বাবু এবং ধন্যবাদ পেলাম বটে, বুঝলাম এতে কোনও খাদ নেই। হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা।

বিজনগ্রামে লোকজন অনেক। পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে পশ্চিমাবায়ু জল ঢালে। তাতেই চাষবাস। শ্যামসুন্দরের কোনও কাজ নেই। শুধু বাঁশি বাজায়। বিজনের যে-পথ আরাবল্লির বাঁকে হারিয়ে গেছে, বাঁশির সুর সেখানেই এক মেয়েকে ভাসিয়ে দিল। সেই সুর ধরে গ্রামে ফিরে সোজা শ্যামসুন্দরের ভিটেয়। সুর-মূর্ছনায় জন্মান্ধ শ্যামসুন্দরকে সে জ্যোতিষ্মান দেখে। ভালোবাসলো। বিয়েও করল। দাদা-বৌদির সংসারে মণিবাঈ পরিবারের চাষবাস দেখে। সবুজ খেতে বসে শ্যামসুন্দর সকলকে বাঁশি শোনায়। দাদা প্রতাপ সিং বলে, তোর বাঁশি আমাদের প্রেরণা। বৌদি শিল্পী দেওরের জন্য বড়ো গর্বিত। বৌদি সব সামলে দেবে বলাতেই তো বেড়িয়ে পড়া। হর নর্মদে হর।

আর তর সইল না, বলেই ফেললাম, একটু বাঁশি শোনাবেন। নিশ্চয়ই বাবু। মণিবাঈ তাদের ছোট্ট ঝোলা থেকে তিনটে বাঁশি বার করল। বাঁশির উপর হাত বুলাতে বুলাতে সে মাঝারি রঙিনটাকেই বেছে নিল। বাঁশি পেয়েই শ্যামসুন্দরের অন্য মেজাজ। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলে চলল, এখন যেখানে নর্মদাকুণ্ড, আগে ছিল গভীর বাঁশবন। ওখানেই ছিল নর্মদার উৎস। বেণুবনের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত তাই নর্মদেশ্বর শিবের অপর নাম বেন্বেশ্বর। চলুন বাবু, বেণুবনে যাই। কোথায় বেণুবন?

বেণুবন এখানে কোথাও আর নেই। কিন্তু ও দেখতে পাচ্ছে। হাজার বছরের দৃষ্টি যে ওর শরীরে। ওর দৃষ্টি যে নয়নের সম্মুখে নয়, নয়নের মাঝখানে। পূরবীর সুর ভেসে বেড়ায় সন্ধ্যাকাশে। অলকাপুরী থেকে নির্বাসিত যক্ষ পত্নীবিরহে কাতর হয়ে পত্নীর খবর নিতে অনুরোধ করেছে মেঘকে। মেঘতরী শ্যামসুন্দরের বাঁশির সওয়ারি হয়েছে– হে মেঘ, তুমি পথে যেতে যেতে শ্রান্ত হলে আম্রকূট পর্বতে বিশ্রাম নিও। পূরবীর সুরে আরও এক কথা শুনতে পেলাম যেন। অমরস্য মহামৃত্যুঞ্জয়স্য শিবস্য কণ্ঠ থেকে নির্গতা হয়েছিলেন নর্মদা যেখানে, সেই জন্য নাম অমরকণ্ঠক। অপভ্রংশে অমরকন্টক। শ্যামসুন্দর আর মণিবাঈকে বিদায় দিয়ে যখন শান্তিকুঞ্জের পথ ধরলাম, লালন ফকিরের গান মনে পড়ল– কৃষ্ণপ্রেম করব বলে ঘুরে বেড়াই জগতজুড়ে।

মহাতীর্থ অমরকন্টক বিন্ধ্যপর্বতের একটি শৃঙ্গ। নর্মদার উৎসস্থল। শোন নদীরও। নর্মদা উত্তরে বিন্ধ্য আর দক্ষিণে সাতপুরা পর্বতমালার মধ্য দিয়ে পশ্চিম বাহিনী হয়ে আরব সাগরে পড়েছে। ১,৩০৮ কিলোমিটার দীর্ঘ নর্মদার তিন-চতুর্থাংশই মধ্যপ্রদেশে। ''নর্মদায়াঃ জলং পীত্বা অর্চয়িত্বা বৃষধ্বজং/দুর্গতিঞ্চ ন পশ্যন্তি তস্যা তীর্থপ্রভাবতঃ।" নর্মদায় নিত্য জলপান, নিত্য স্নান এবং তার তটে তটে ছড়ানো শিবলিঙ্গের পুজো করলে জীবের দুর্গতি নাশ হয়। মর্ত্য জীবনেই অমর্ত্যলোকের সন্ধান পেলে। সর্বপাপহারিণী নর্মদা দেবাদিদেব মহাদেবের তপস্যার তেজ থেকে উদ্ভুত। আত্মজা কন্যা। সংসারে যারা নিষ্পাপ তারা গঙ্গাকে পরমজ্যোতিরূপে দর্শন করেন। গঙ্গার অপার মহিমার কথা স্মরণ রেখেও বৈদিক ঋষিরা ঘোষণা করেছেন, নর্মদা নদী-কুলের শ্রেষ্ঠ। রুদ্রের তেজ থেকে উৎপন্ন বলে স্থাবর, জঙ্গম সব কিছুকেই তিনি ত্রাণ করেন। শুদ্ধচিত্তে তার তট পরিক্রমা করলে সর্বসিদ্ধি হয়।

পরদিন সকালে আবার এলাম মন্দিরে। সেই পুরোহিতকে খুঁজছি। একটা প্রশ্ন করব। ওঁকেই করব। দূরে গোমুখের কাছে দেখলাম মিতু ওঁরই সঙ্গে কথা বলছে। মাথা ঝাঁকাচ্ছে, ঘাড় নাড়ছে। মনে হয় পুরোহিত মশাই যা বলছেন, মিতু সব মেনে নিচ্ছে। কোনও বিতর্কে যাচ্ছে না। গেলাম ওদের কাছে। গতকাল সন্ধ্যারতি ভালো লেগেছে বলার পরই প্রশ্ন করলাম, মন্দিরের কালো পাথরের উপর সাদা রং কেন? পুরোহিত মশাই ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে আমায় মাপছেন। ঘড়ি দেখলাম। ৩ মিনিট ১৮ সেকেন্ড পর বললেন, আপনার বিদ্যার দৌড় কতটা? নিতান্ত নই মূর্খ। সাদা রঙের মানে জানেন? হ্যাঁ জানি। কী জানেন? বললাম, আপনি পণ্ডিত মানুষ। আপনার জানাটা আগে জানা দরকার। বেশ হতভম্ব। এমন পাল্টা আক্রমণ আসবে হয়তো ভাবতে পারেননি। ক্রুদ্ধদৃষ্টি কিছুটা ম্লান হল। আবার বললাম, আপনি যে-মানে জানেন, তা মানলে ভারতের সব মন্দিরেই সাদা রং চড়াতে হয়। সাদা রং শুদ্ধতা পবিত্রতার প্রতীক হলে আপত্তি কোথায়? 'শুনুন কলকাতাবাবু' অবশ্যই সুর নরম, 'নর্মদার সঙ্গে সকলকে গুলাবেন না। মহাভারতের ধৌম্যমুনি, পুলস্ত্যমুনি বলেছেন নর্মদা ত্রিলোকবিশ্রুতা। সরিতাং শ্রেষ্ঠা। গঙ্গাতীরে মৃত্যু হলে জীবের উচ্চগতি হয়। আর তপস্যার সিদ্ধিলাভ নর্মদাতটেই। সেই মাহাত্ম্যের কথা স্মরণ করেই মন্দিরের রং শ্বেতশুভ্র'। বললাম মাহাত্ম্যের বিচারে সব মন্দিরই তো মহৎ। পুরোহিত নীরব।

খ্রিস্টিয় ৮ম শতকে হিন্দুধর্ম সংস্কারক পণ্ডিত শংকরাচার্য অমরকন্টক পাহাড়ে নর্মদার উৎস আবিষ্কার করেন। এক বিশাল বাঁশবনে নর্মদার অসংখ্য কুণ্ড। তিনি একটি কুণ্ডকেই চিহ্নিত করেছিলেন উৎস হিসাবে। নাম দেন সূর্যকুণ্ড। সূর্যকুণ্ডের পাশেই স্থাপন করেন এক শিবলিঙ্গ। ১০৪১ থেকে ১০৭৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কালচুরি রাজবংশের রাজা কর্ণদেবের রাজত্বকাল। এই সময়েই প্রতিষ্ঠিত হয় নর্মদা মন্দির ও কুণ্ড। তবে এটি শংকরাচার্য-আবিষ্কৃত কুণ্ড নয়। সেটি শুকিয়ে যাওয়াতেই নতুন কুণ্ড নির্মাণ করেন রাজা কর্ণদেব। বাঁশবনের কোনও চিহ্ন নেই এখন।

হাজার বছরের পুরনো মন্দিরের ১৯২৯ সালে আমূল সংস্কার করেছিলেন ইন্দোরের হোলকার মহারাজা সংবৎ। মন্দিরের স্থাপত্যশৈলী না ওড়িশি, না দ্রাবিড়িয়। দুয়ের আশ্চর্য সংমিশ্রণ। নর্মদা ও নর্মদাশংকরের একনিষ্ঠ ভক্ত নাগপুরের ভোঁশলা, বরোদার গাইকোয়াড়, গোয়ালিয়ারের সিন্ধিয়া রাজপরিবার নর্মদা মন্দিরের নানা সংস্কার করেন। মন্দিরের শ্বেততোরণ নির্মাণ করেন রেওয়া রাজ, ১৯৩৯ সালে। একটা বিষয়ে এইসব রাজপুরুষ ধন্দে ছিলেন– গভীর অরণ্যে তীর্থযাত্রীরা নর্মদা মন্দির চিনবে কেমন করে। গভীর গাছপালার রং কালো, মন্দিরের পাথরও তাই। উপায় বার হল। স্থানীয় লোকজন বলেন তারা শুনেছেন বাপ-ঠাকুরদার কাছ থেকে, হোলকার মহারাজা সংবৎ-ই কালোর বিপরীত সাদা রং লেপে ছিলেন কালো পাথরে। হ্যাঁ, মন্দির দেখা গেল বহুদূর থেকে। বিন্ধ্যর উঁচু পথ থেকে। নিবিড় জঙ্গলের মধ্য থেকে। অনুমান, নর্মদা মন্দিরের সাদা রঙের বয়স প্রায় ৯০। পুরোহিত মশাইকে বলতেই খেঁকিয়ে উঠলেন। বললেন, পবিত্রতার জন্যই সাদা রং। মন্দির চেনানো-ঠেনানো নয়। যতসব মূর্খ ভারতবাসী! আমি আর মিতু হাঁ। এই কী গতকাল সন্ধ্যারতির সিদ্ধ পুরোহিত যাঁর পুজো মুগ্ধ করেছিল! হঠাৎ নর্মদামাই-ভক্ত শ্যামসুন্দরকে মনে পড়ল। হাতে বাঁশি। মুখে হাসি। পাশে স্ত্রী মণি। ওর দৃষ্টি নেই। রং নেই। অতএব প্রশ্নও নেই। তবুও সে শুভ্র। নিকষ অন্ধকারের রং মেখেই শুভ্র। সেও কী 'মূর্খ ভারতবাসী'!

হায়! ভারতবাসীর এমন ভয়ঙ্কর বিশেষণের কোনও বিকল্প নেই যে। হর নর্মদে হর।

তথ্যসূত্র: তপোভূমি নর্মদা, প্রথম খণ্ড- শ্রী শৈলেন্দ্রনারায়ণ ঘোষাল শাস্ত্রী।

লেখক পরিচিতি

অ্যাডভেঞ্চার প্রেমী।

সাংবাদিক, তথ্যচিত্র ও রিসার্চ ওয়ার্কেও সাবলীল।

সিংহস্থ

পত্রাঙ্গ বসু

জ্ঞানপিপাসা

ছবি- লেখক

'আনে কা কোই খুশি নেহি; যানে কা কোই গম নেহি।' তুমি এলেও আমার আনন্দ হয় না। চলে গেলেও দুঃখ নেই। অর্থাৎ নিস্পৃহ। জগতের প্রতি, মানুষের প্রতি। তিনি সন্ন্যাসী, জটাধারী, নগ্ন। দশ বছর বয়সে মা-বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে ঘর ছেড়েছিলেন। ঘুরতে ঘুরতে এলাহাবাদ। সেখানে গুরুর সঙ্গে দেখা শিষ্যের। তারপর বারো বছর হিমালয়ে তপস্যা। জানার চেষ্টা করেছেন জগৎকে, নিজেকে। আজ তিনি সন্ন্যাসী। জ্ঞানী, নির্মোহ, নিস্পৃহ, কিন্তু জীবনে ভরপুর। সিংহস্থ কুম্ভে উজ্জয়িনীতে সমাসীন। ১৪ নং মাড়িতে তাঁর আখড়া। আজ তিনি মানুষের ধরাছোঁয়ার মধ্যে। অসংখ্য অগণিত মানুষ। মানুষ আর মানুষ। পথ চলতে চলতে গৃহী আর সন্ন্যাসী সকলেই তাঁর কাছে নতজানু—আশীর্বাদ প্রার্থনায়।

কুম্ভ তো মিলনক্ষেত্র। গৃহীর সঙ্গে সন্ন্যাসীর। গৃহীর মনে অনেক চাওয়া, অনেক পাওয়ার আশা। সেইসঙ্গে ভয়– পাপ থেকে মুক্তির। তাই আছড়ে পড়া সাধুর পদযুগলে– আশা মিটিয়ে দাও, মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করে দাও, ছেলের চাকরির ব্যবস্থা করে দাও; পদোন্নতির ব্যবস্থা করে দাও। ভগবানের সঙ্গে দেখা করিয়ে দাও। যাতে শান্তিতে মরতে পারি।

সাধুরাও বিলক্ষণ প্রস্তুত আশীর্বাদ দিতে। তাঁদের জীবন তো

তাঁদের নিজেদের জন্য নয়। উৎসর্গীকৃত প্রাণ। মানুষের জন্য, গৃহীদের জন্য। সাধুরা সমবেত কুম্ভ মেলায়। মিলতে চান গৃহীদের মধ্যে। তাঁদের দেখাতে চান এগিয়ে চলার পথ।

কুম্ভস্নান পুণ্যস্নান। পৌরাণিক কাহিনীতে পাই দেবতা-অসুরের দ্বন্দ্বে অমৃত মন্থনের সময়কালে অমৃতভরা কুম্ভ মর্ত্যলোকের চার জায়গায় নামানো হয়েছিল। সেই জায়গাগুলো হলো– হরিদ্বার, প্রয়াগ, নাসিক আর উজ্জয়িনী। উজ্জয়িনীতে শিপ্রা নদীতীরে।

সূর্য, চন্দ্র ও বৃহস্পতির উপর ভার পড়েছিলো অমৃত কুম্ভটি রক্ষা করবার। এঁনারা যে সময়ে যে রাশিতে থেকে অমৃত কুম্ভটি রক্ষা করেছিলেন সেই সেই স্থানে সেই সেই রাশিতে তাঁদের অবস্থানের কালেই কুম্ভস্নান অনুষ্ঠিত হয়। আর সূর্য মেষরাশিতে এবং বৃহস্পতি সিংহরাশিতে অবস্থানকালে উজ্জয়িনীতে কুম্ভযোগ হয়ে থাকে। বৃহস্পতি সিংহরাশিতে অবস্থান করায় এই যোগকে 'সিংহস্থ' কুম্ভ বলা হয়। ২০১৬-তে ছিল উজ্জয়িনীতে পূর্ণকুম্ভ-সিংহস্থ কুম্ভ– ২২ এপ্রিল থেকে ২১ মে পর্যন্ত।

মানুষের পক্ষে অমৃতলাভের পরম যোগ এই কুম্ভ।

মানুষ অতি ক্ষুদ্র জীব। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিরিখে মানুষের স্থান কোথায়? কতটুকু? কে আমি? কে তুমি? নস্যি। বালিয়াড়ির একটা কণামাত্র। সমুদ্রের একফোঁটা জল মাত্র। কী তার শক্তি? কী তার ক্ষমতা? কিছু না। প্রকৃতির কাছে নিতান্ত অসহায়। এক ফুঁয়ে উড়ে যাবার জোগাড়। তার আবার মান অভিমান চাওয়া পাওয়া! কেই বা সাধু, কেই বা অসাধু, পাপী? কে করবে বিচার? সকলেই নিরুপায়। কিন্তু মানুষের মন আছে। আর তার সেই মন তাকে চালিয়ে নিয়ে চলেছে একদিক থেকে আর একদিকে। সে কি জানে কোন পথটা সঠিক আর কোন পথটা বেঠিক? সংসারের জোয়াল টানতে টানতে তার কি কোনও নিজস্ব সত্তা আছে? অস্তিত্ব আছে? ভাবনা আছে? শক্তি আছে? সে কি জীবনের দাস নয়? জীবন যেদিকে তাকে নিয়ে যাবে সেদিকে সে যেতে বাধ্য। কোনও কিছুই তার হাতে নেই। কিন্তু মনে আছে হাজারো আকাঙ্ক্ষা। যদিও সাধ্য নেই। ভরসা করে বসে থাকে ভগবানের। তাই সে চায় আশীর্বাদ ভগবানের। সন্ন্যাসীরা এনে দেবেন সে আশীর্বাদ। আর সন্ন্যাসীদের পাওয়া যায় কুম্ভে। সহজেই।

কুম্ভে কেন আসে মানুষ? গৃহীরা সন্তানের, স্ত্রীর হাত ধরে? বৃদ্ধ বাবা-মাকে সঙ্গে করে কোথাকার মানুষ কোথায় চলে আসেন! মিনি ভারতবর্ষ যেন উজ্জয়িনী। শুধু কি তাই? বিদেশ থেকেও অনেকেই উড়ে আসেন। কীসের টানে? যেমন এসেছেন সুদূর জার্মান থেকে স্বামী-স্ত্রী। কীসের আকর্ষণে?

গৃহী সুখ চায়। দুঃখ নয়। কিন্তু সুখ, আরও সুখ চাইতে গিয়ে দুঃখকেই ডেকে আনে। অধরা সুখ মনের দুঃখ বাড়ায়। সুখের পরেই দুঃখ জীবনের অনিবার্য পরিণতি। একথা কেই বা মনে রাখতে চায়। সংসারী মানুষ আর চায় পুণ্য। কুম্ভস্নান করলেই নাকি পুণ্যলাভ– পাপস্খলন।

তাই দিক দিক থেকে মানুষ আসছেন– কয়েক লক্ষ সাধু আর কয়েক কোটি গৃহী পুণ্যার্থী। সাধু আর গৃহী এ দুভাগেই ভাগ করি কুম্ভে আসা মানুষজনকে।

গৃহীরা আসছেন গ্রাম থেকে, শহর থেকে, নগর থেকে। গ্রামের মানুষের মাথায় বাক্স, রকমারি ব্যাগ বা চলতিভাষায় বোঁচকা– রকমারি ধাঁচের, রকমারি রঙের। হাতে ধরা শিশুর হাত; অথবা বৃদ্ধ বাবা বা বৃদ্ধা মায়ের। সাধুরা গেরুয়াধারী। রঙ দিয়ে যায় চেনা। কাঁধে গেরুয়া ঝোলা, মাথায় গেরুয়া পাগড়ি, হাতে লাঠি। একই পথে পথ হাঁটা। পাশাপাশি। একই গন্তব্য– সাধুর আর গৃহীর। কুম্ভেই সম্ভব। মাথার উপরে একই সূর্য গনগনে আগুন ছড়াচ্ছে। দিন রাত যে কোনও সময়ে তাকান শুধু মানুষ। পথে মানুষ, নদীতে মানুষ, আখড়ায় মানুষ, মাঠে, রেল স্টেশনে মানুষ।

পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছেন সবাই। শ'য়ে শ'য়ে মানুষ– শিশু, বালক, বৃদ্ধ, বনিতা, পুরুষ, যুবক, প্রৌঢ়, নারী, ব্যবসায়ী, চিকিৎসক, চাষী, ভিক্ষুক, সুগৃহিণী, সন্ন্যাসিনী– আরও কত কীভাবে বর্ণনা করা যায়! কিন্তু কারও কোনও আলাদা চরিত্র নেই; নেই কোনও আলাদা আলাদা পেশার পরিচয়। চরিত্র আলাদা করা সম্ভব নয়। পেশাও নয়, জাতও নয়, জাতিও নয়। একটাই শব্দ কেবল মাথায় আসছে– 'মানুষ'। উজ্জয়িনী শিপ্রা নদীতীরে সকলেই যেন 'অমৃতস্য পুত্রাঃ।'

শিপ্রানদী উত্তরবাহিনী। বিন্ধ্যপর্বত থেকে চলা শুরু। চম্বল নদীতে যাত্রা শেষ। এই শিপ্রার তীরেই রামঘাট, দত্তঘাট, নরসিংঘাটে পুণ্যস্নান; পূর্ণকুম্ভ এক মাস ধরে। দুপাশে সুন্দর করে বাঁধানো ঘাট। কোথাও আবার ঘাটের পাশে দেয়ালে সুন্দর সুন্দর চিত্রকলা। মন ভরিয়ে দেয়। শীর্ণ নদী। গতি স্তব্ধপ্রায়। সরকারি সাহায্যে বাঁধ দিয়ে নদীতে জলের যোগান। দুপাশে রেলিং। মাঝনদীতে স্পিডবোটে পুলিশ। ঘাটে বাঁশি হাতে স্বেচ্ছাসেবী, লাঠিধারী পুলিশ, পুলিশ ক্যাম্প, পানীয় জল, মহিলাদের বেশ পরিবর্তনের সুব্যবস্থা। নদীর মাঝে ফোয়ারা। রাতে রঙিন আলোর ব্যবস্থা। সবমিলিয়ে আয়োজন সুসম্পূর্ণ। সরকারি ব্যয় ৩০০০ কোটি টাকা। তিন কোটি মানুষের পুণ্যস্নানের জন্য।

বিশাল আয়োজন। অবাক হয়ে ভাবি। এত এত মানুষ। তাঁদের জন্য যাতায়াতের ব্যবস্থা, থাকার ব্যবস্থা, পানীয় জল, বাথরুম। সবই মজুদ হাতের কাছেই। রাস্তার দুধারে ঘন ঘন পানীয় জলের ব্যবস্থা। প্রচণ্ড গরমে যা অবশ্য প্রয়োজনীয়। পথচলতি বাথরুমের সংখ্যাও অজস্র। ফলে দূর দূর থেকে আসা মানুষের কোনও অসুবিধে নেই। মাথা গোঁজার অস্থায়ী ছাউনি সরকার থেকে অনেক করে দেওয়া হয়েছে। দিনে রাতে যে কোনও সময়ে আশ্রয় পেতে পারেন, বিনামূল্যে। গরীব মানুষের প্রভূত উপকার। হাতের কাছেই রয়েছে চিকিৎসাকেন্দ্র, ব্যাংকের শাখা তথা এ টি এম।

উজ্জয়িনীর শিপ্রার এক পাড়ে আধুনিক শহর। অন্য পাড়ে বিস্তীর্ণ অঞ্চল যেখানে সাধুদের আখড়া। মাঝে মাঝে রাস্তা নদীতে যাবার। আখড়ার পরে আরও আখড়া তারপরে আরও, আরও। বড়ো ছোটো মাঝারি। রংবাহারি আবার সাধারণ। আখড়াও যেমন সাধুও তেমন। প্রতি আখড়ায় দিনভর মন্ত্রপাঠ, পূজা, যাগযজ্ঞ। এক আখড়ায় মাইক সহযোগে বেদমন্ত্র উচ্চারণ তো পরের আখড়ায় হনুমান চাল্লিশা পাঠ;

ছবির পাতা (১)

'The Explorers'

ছবি- অমিত সাহা

স্পিতি নদী, হিমাচল

ছবি- শ্যামাপ্রসাদ সাঁই

চন্দ্রতাল

ছবি- গৌতম দাস

লেপচাখা থেকে ডুয়ার্সের বৃষ্টিবন

ছবি- প্রদীপ্ত ভট্টাচার্য্য

KRISHNA ENTERPRISES

GOVT. CONTRACTOR & GENERAL ORDER SUPPLIER

Mfg. of Alum. Conductor Accessories & Elect. Materials, H.T. & L.T. Line Materials & Fabrication Job

245/1A, SATIN SEN SARANI, KOLKATA-700 054
PHONE: (033) 2354 6475, Fax No. (033) 2352 0009
MOBILE: +91 98303 83849
E-mail: krishnaenterprises20012@gmail.com

আর পরের আখড়ায় গীতাপাঠ। উজ্জয়িনীর আকাশ বাতাস মুখরিত। আর রয়েছে ভাণ্ডারা। প্রতিদিন কোনও না কোনও আখড়ায়।

সাধুরা কেন সাধু হন। এ প্রশ্ন অনেকদিনের। উত্তর খুঁজতে ঢুকে পড়ি ছোট্ট এক আখড়ায়। সেখানে বসে সন্ন্যাসী, নগ্ন, জটাধারী, ছাইমাখা-মুখে আর শরীরে সাদা আস্তরণ। মাথার জটা মাথায় আবদ্ধ নেই; নেমে এসেছে মাটিতে, পায়ের সামনে বিছানো। হাস্যমুখ। তাই সাহস পাই। আশীর্বাদ চাই। প্রণামী দিই। ফটোও তুলি। দেখাই। তারপরেই বসতে বলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বসে পড়ি পাশে বিছানো সতরঞ্চিতে। অস্থায়ী আস্তানা। মাথার উপর রঙিন চাঁদোয়া। চারপাশে কাপড় দিয়ে ঘেরা। নীচে কম্বল পাতা। তার ওপর বসে সাধুবাবা। সাধুবাবার পাশে অনেক দেবদেবীর চিত্র, ধূপ, কমন্ডলু, যজ্ঞস্থল, প্রণামীর থালা। পিছনে আরও অনেক সাধু, জানা গেল তাঁরা এঁনার চেলা। সাধুবাবার ঠিক পিছনেই একটি কুলার, হাতে মাজা-র বোতল; যা গরম পড়েছে! বাবা জিজ্ঞাসা করেন– 'দাদা জল খাবো?' 'হ্যাঁ' বলতেই পিছনের দিকে হুকুম চলে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জল চলে এলো। জলপানের পরই নিজের হাতে ধরা 'মাজা' পানের আহ্বান। কিন্তু এবার না বলতে পিছনে চলে গেল চা-এর অর্ডার। চা এলো। সেইসঙ্গে এলো মধ্যাহ্নভোজনের নিমন্ত্রণ। অবাকই লাগছিল। অচেনা একজন মানুষকে এমন সাদর আপ্যায়ন! হয়তো মহাত্মা বলেই সম্ভব।

এদিকে সামনের পথচলা মানুষের ভিড় অবিশ্রান্ত। সকলেই যাওয়ার পথে প্রণাম জানিয়ে যাচ্ছেন। কেউ নীচু হয়ে কেউ সাষ্টাঙ্গে কেউ বা আবার দূর থেকেই দুহাত জোড় করে। সেইসঙ্গে ভরে উঠছে প্রণামীর থালা। থালার নোট চালান হয়ে যাচ্ছে পিছনে রাখা বাক্সে। এত মানুষ নতজানু হয় কেন? এক টুকরো সুখের আশায়? বাবা-র আশীর্বাদে সুখ মিলবে? ভারতবর্ষে এইটাই বোধহয় বিশ্বাসের জায়গা। কেউ কেউ বাবার কানে কানে সমস্যার কথা বলেন। সাধুবাবা হেসে ভরসা জোগান। মাথায় হাত ঠেকান। অবশ্য কালের নিয়মে অনেক অবিশ্বাসীও আছে। আবার আছে বোধহীন আচার পালনও। সুবেশা তরুণী জুতো পায়ে প্রণাম করতে গেলে ধমক খায় বাবার কাছে– 'জুতা খুলকে আইয়ে।' প্রণামীর থালার দিকেও তাঁর নজর থাকে। আশীর্বাদ নিয়ে কেউ খালি হাতে চলে যাবার চেষ্টা করলে বলে ওঠেন– 'বাবাকে লিয়ে কেয়া লায়া?' দশ টাকার নোট বাড়িয়ে দিলে বলেন– 'ব্যাস?' তারপরেই বলেন 'যাইয়ে আপ যাইয়ে'। সাধুবাবার লোভ নেই কিন্তু পয়সাও তো দরকার। তাঁর একটা গাড়ি আছে তেল কিনতে হয়। তাঁর আশ্রম আছে ওঁকারেশ্বরে সেখানে খরচা আছে। সুদূর জার্মানির ট্রিয়া শহর থেকে এসেছেন জার্মান মহিলা যোগ শেখার আশায়। বাবাকে প্রশ্ন করেন এটা সেটা, যোগ শেখাবেন কিনা ইত্যাদি। অবশ্যি এই অধমের মাধ্যমে। সবশেষে জানতে চান আমার কাছে, কতটাকা প্রণামী দেওয়া যায় বাবাকে। জানতে চাই সাধুবাবার কাছেই। তিনি বলেন 'দাদা লাল নোট চাহিয়ে; ঠিক সে বোলিয়ে গড়বড় মত করনা।' না হাজার টাকা দেওয়া সম্ভব নয়, জার্মান লেডি জানিয়ে দেন। শেষে একটা ১০০ টাকার নোট রেখে প্রণাম করে উঠে পড়েন। বাবাজী দেখলাম একটু হতাশ হলেন। তাকালেন আমার দিকে অর্থাৎ দাদা ঠিক গড়বড় করেই দিল।

সাধুরা আজকের দিনে শুধু সাধুই নেই। তাঁরা আজ সমাজের অঙ্গ হয়ে গেছেন। সমাজবদ্ধ জীব যাকে বলে আর কি। সমাজের অনুশাসন মেনে চলতে হয়। নাহলেই বিপদ। ঝোলা থেকে একে একে বের করে দেখালেন ভোটার কার্ড, প্যান কার্ড, আধার কার্ড। সুতরাং 'রইলো ঝোলা, চললো ভোলা'– সেটি হবার নয়। হাতে ধরা মোবাইল বার বারই বেজে উঠছে। একবার একটা মেসেজ এল– ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ২৯,০০০ টাকা ঢুকেছে– দেখালেন। লেখাপড়া শেখার বাবার খুব আগ্রহ। দাবিই জানান আমাদের কাছে শেখাতে হবে।

তিনি বললেন কঠোর তপস্যা প্রয়োজন বুঝলে দাদা। মনকে বশে আনা দরকার। তবে না? মনই তো সব। মনই চালায় মানুষকে ভেতর থেকে। তপস্যা মানে শরীরকে কষ্ট দিয়ে মনকে বাগে আনার চেষ্টা। দেখলামও তাই আখড়ায় আখড়ায়। কোনও সাধু এক পায়ে ঠায় দাঁড়িয়ে ঝোলানো দোলনায় ভর দিয়ে। কারুর আবার হাত উঁচু করে বাঁধা। দিনের পর দিন।

'আপনার কি কোনও পাওয়ার আছে?' বেমক্কা প্রশ্ন করে বসি আমরা। রাগেন না– 'হ্যায় হ্যায়। কিঁউ নেহি?' পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা এক প্রৌঢ়কে দেখিয়ে বলেন আমার চেলা। এর একমাত্র ছেলে মারা গেছে। আমি ব্যবস্থা করে দিয়েছি, এর আবার ছেলে হবে। আমরা একটু অবাক হই। পরে জানতে পারি প্রৌঢ়ের বয়স ৬০ বছর আর তার স্ত্রীর ৩০ বছর।

আপনি সাধু হলেন কবে? এ প্রশ্নের উত্তরে জানতে পারি সেই গোড়ার কথাটা। দশ বছর বয়সে এক টুকরো রুটির জন্য মা-বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে ঘরছাড়া। অনেক কঠোর তপস্যা করার পরে আজ তিনি সাধু। হিমালয়ে কাটিয়েছেন বছরের পর বছর, ওই চরম ঠান্ডায় শুধু ছাইভস্ম মেখে। নর্মদা প্রদক্ষিণ করেছেন, মরুতীর্থ হিংলাজ গেছেন। অকপট স্বীকারোক্তি– গাঁজায় দম দিতে হয় ঠান্ডা থেকে বাঁচতে, প্রবৃত্তি থেকে বাঁচতে।

সাধুরাও কি কখনও কখনও একাকীত্বে ভোগেন? নাহলে কলকাতা ফিরে আসার পরেও কেন বারবার ফোন আসতে থাকে। আসতে চান কলকাতায়। চেলা বনবো না সেটা বোঝা সত্ত্বেও। জানি না।

কুম্ভে না এলে বোঝা যাবে না কুম্ভ কী! নাগা সাধুরাই যেন কুম্ভের প্রাণ। সারা উজ্জয়িনী জুড়ে, মেলা প্রাঙ্গণ জুড়ে তাঁদের উপস্থিতি। কখনও পুলিশকে বিপাকে ফেলে রাস্তায় খোলা তরোয়াল হাতে দাপাদাপি– ভয়ে প্রাণ উড়ে যাবার জোগাড়। কখনও বা পথ অবরোধ– নাগাদের আখড়ার সামনে আবর্জনার স্তূপ পড়ে থাকার বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ। আবার উদ্দাম গতিতে খোলা জিপ চালিয়ে একদল নাগা সাধু শহরের মধ্যে লোকের ঘাড়ের ওপর গিয়ে পড়লেন। আখড়ায় মহন্ত নির্বাচন। দুইদল নাগাসাধুর মধ্যে মারামারি। সেই সঙ্গে গুলি চালাচালি। বেশ কয়েকজন নাগা বাবা

আহতের তালিকায়। আবার দেখলাম দত্ত আখড়ার ঘাটে নব্য সাধুদের দীক্ষাগ্রহণ অনুষ্ঠান। সাদা লেঙট পরা নেড়ামাথা অনেকে সাধু হবার প্রচেষ্টায় সমবেত; নানা আচার পালনে মগ্ন। সবমিলিয়ে নাগা সাধুরাই হলেন কুম্ভের মূল আকর্ষণ। সাধারণ মানুষের কাছ থেকে ভয়মিশ্রিত সমীহ আদায় করে নেন তাঁরা।

পুণ্যস্নানে সাধারণ মানুষ লাইন লাগিয়েছেন ভোর রাত থেকে রাত অবধি। মাঝে গঙ্গা আরতির সময়টুকু বাদে। দিনে প্রচণ্ড দাবদাহ। রাতের পুণ্যস্নান বড়ো মনোরম; শরীর মন স্নিগ্ধ করে। শিশুদের স্নানে হুটোপাটি, জল নিয়ে খেলা। জল ছেড়ে উঠতেই চায় না। প্রথমে মা-বাবার বকাবকি। তাতে কাজ না হলে স্বেচ্ছাসেবীদের বাঁশির আওয়াজ, শেষে ধমকে কাজ হচ্ছে। বিভিন্ন পরিবারের সব সদস্য একযোগে স্নানে নেমেছেন একসঙ্গে তিন পুরুষ কিংবা চার পুরুষও। গ্রাম থেকে আসা দেহাতি নাগরিকের স্নান– শান্ত, সুশৃঙ্খল। জীবনের প্রতি, ভগবানের প্রতি গভীর আস্থা রেখে শান্তিতে ডুব। শিপ্রার জলের প্রতিটি অণু পরমাণু শরীরকে প্রাণকে যেন পরম মমতায় জুড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে। বিশ্বাসে ভরিয়ে তুলছে মন। পরমাত্মার কাছে নিজেকে আত্মসমর্পণ করছে নিঃসংকোচে, নির্ভয়ে। পুণ্যস্নানে তাঁর সঙ্গে এক-আত্মা হতে গিয়ে জাগতিক অন্য কিছুতে ধ্যান নেই, নেই নিজের প্রতিও– তাই বে-আব্রু হয়ে গেলেও ভ্রূক্ষেপ নেই। বিন্দুমাত্র প্রশ্ন নেই, জিজ্ঞাসা নেই। নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ। তুমিই মুক্তিদাতা, তুমি মোর চালক, তুমি দেখাবে পথ। তোমার আলোয় আমার মুক্তি, তোমার আশিসে আমার জীবন। তুমিই শেষ কথা বলবে।

লেখক পরিচিতি

কস্ট এ্যাকাউন্ট্যান্ট। ক্যামেরা ও কলমে ঋদ্ধ।

K. P. C.
Diagnostic & Poly Clinic

KPC Diagnostic & Poly Clinic

A-8/6, J.N.M. Hospital Road, Kalyani, Nadia. Ph- 033-2582 6270 Mob.- 9836054583

Facilities Available

1. Specialised Doctors Chamber
2. Medicine Store
3. Computerised Pathological Lab.
4. Ultra Sonography (USG)
5. Spl. Doppler Studies
6. Echo cardiography
7. Echo with Doppler study
8. Endoscopy (Video)
9. E.C.G (computerised)

আমার মানস ভ্রমণ

অসিত সরকার

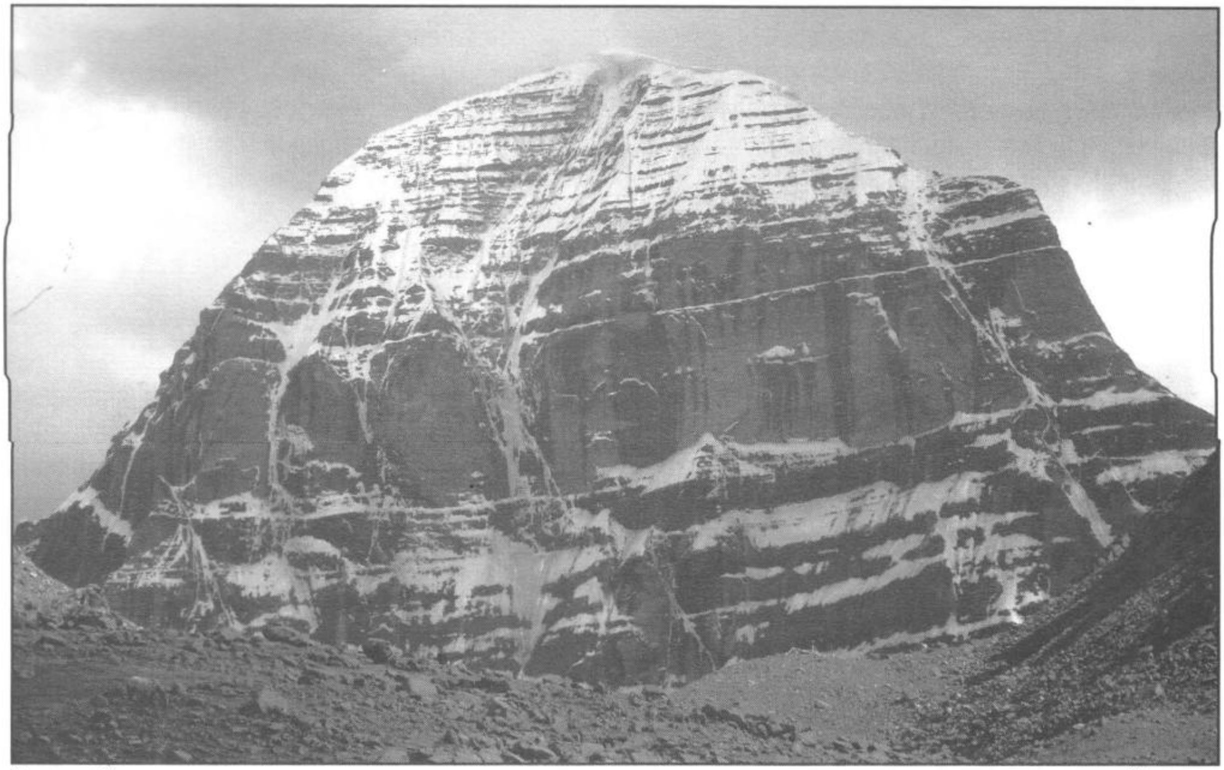

কৈলাস পর্বত

ছবি- লেখক

(এই সংখ্যায় প্রথম অংশ)

তুষারশুভ্র হিমালয় আমাকে আকর্ষণ করে তার বিশালত্বে, তার অভ্রভেদী চূড়া একই সঙ্গে মনে রোমাঞ্চ আর প্রশান্তি জাগায়। ১৯৭৫ সালে প্রথম দেবভূমি গাড়োয়াল ভ্রমণ হিমালয়ের প্রতি আমার অনুরাগ সৃষ্টি করে। সময়ের সাথে পাহাড়ের কোলে ক্রমশ সবুজের অবলুপ্তি, কংক্রিটের আধিক্য, বাঁধের মাধ্যমে রুদ্ধ নদীর স্বাভাবিক গতিপথ ও প্রবহমানতা লক্ষ করেছি। কিন্তু জেনেছি ভারতবর্ষ থেকে তিব্বতে (বর্তমানে চিন), যেখানে কৈলাস পর্বত ও মানস সরোবর অবস্থিত, যেখানে ভারতীয় সাধকদের বহুকাল ধরে আনাগোনা, সেই পথের প্রাকৃতিক পরিবেশ বহুলাংশে অপরিবর্তিত আছে। এই পথের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অতুলনীয়। একমাত্র ভারতীয় বিদেশ দফতরের মাধ্যমে এই পথে যাওয়া যায়। এই উদ্দেশে ২০০৭ থেকে প্রতি বছর ভারত সরকারের বিদেশ দফতরে আবেদন করে ২০১২-তে প্রাথমিক ভাবে নির্বাচিত হই। যুগপৎ আনন্দ ও রোমাঞ্চে নির্দিষ্ট সূচি অনুযায়ী ৩ জুন দিল্লি সরকারের গুজরাটি সদনে পৌঁছলাম। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের মানুষ এসেছেন তাদের মনোবাসনা পূরণ করার জন্য। কেউ চলেছেন দেবতারূপে হিমালয়কে বরণ করতে, কারও আকাঙ্ক্ষা প্রকৃতির ছন্দে মাতোয়ারা হওয়া, কারও উদ্দেশ্য অসীমের প্রতি আত্মনিবেদন। আমাদের ৬০ জনের দলে গুজরাত ও মহারাষ্ট্রের যোগদান সর্বাধিক। বাঙালি হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ থেকে কেবল আমি ও ভ্রাতৃপ্রতিম অচিন্ত্য। সন্ধেবেলায় আমাদের সাথে দেখা করতে এলেন মিঃ সুনীল উকে, চিফ কমিশনার অফ কাস্টমস এবং আমাদের যাত্রাপথের লিয়াঁজো অফিসার। দিল্লি হার্ট ও লাংস ইনস্টিটিউট শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষার পর উচ্চতাজনিত অসুস্থতা ও তার প্রতিকার প্রসঙ্গে একটি সেমিনার হ'ল। পরদিন সকাল (৫ জুন) থেকেই চলল ইন্দো-টিবেটিয়ান বর্ডার পুলিশের কমান্ড হসপিটালে আরেকদফা পরীক্ষা। সমস্ত পরীক্ষা পর্যালোচনার পর ৬০ জনের মধ্যে থেকে ৯ জন যাত্রী শুভ যাত্রার ছাড়পত্র পাননি।

তাঁদের কাতর করুণ মুখ আজও ভুলতে পারি না।

এরপর বিদেশ দফতর থেকে ভিসা প্রাপ্তি, মুদ্রা বিনিময়, বিদেশ সচিবের নির্দেশ ও উপদেশ শোনা পর্ব শেষ করে অবশেষে ব্যস্ত হাতে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হলাম।

৭ জুন। আজ দিল্লি থেকে আমাদের যাত্রা শুরু হল। দেবভূমি উত্তরাখণ্ডের কাঠগুদামে ভোজন সেরে সবুজ বনানী, বিস্তৃত পাহাড়মালার মধ্যে নৈনিতাল সহ বিভিন্ন লেক পাশে ফেলে ৩৯০ কিলোমিটার পার হয়ে আলমোড়াতে আজ রাত্রিবাস। পরের দিন সকালে আলমোড়া থেকে বেরিয়ে কৌসানিতে লাঞ্চ সারলাম। এরপর বাগেশ্বর, রানিক্ষেত পার হয়ে ২২৫ কিলোমিটার দূরের চৌকরি পৌঁছলাম বিশ্রাম ও রাত্রিবাসের জন্য। ৯ জুন সকালে যাত্রা শুরু করলাম ১১০ কিলোমিটার দূরের নেপাল সীমান্তবর্তী ধারচুলার উদ্দেশে। রাস্তা ক্রমশ সরু ও খারাপ হয়ে যাচ্ছে। দিদিহাট ও মিরথি পেরিয়ে বিকেলে এসে ধারচুলা পৌঁছলাম। কুমায়ুন অঞ্চলে পিথোরাগড় জেলার এটাই শেষ শহর। পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে খরস্রোতা কালী নদী। যার অপর পাড়ে নেপালের ধারচুলা। প্রায় ৫০ মিটার কাঠের ব্রিজ পার হয়ে ওপাড়ে ঘুরে এলাম।

১০ জুন সকালেই ব্যাকপ্যাক সঙ্গে নিয়ে ছোটো গাড়ি করে ৪৪ কিলোমিটার দূরের নারায়ণ আশ্রমের উদ্দেশে রওনা হলাম। কালী নদী ক্রমশ দৃষ্টির আড়ালে চলে যাচ্ছে আর আমরা চলেছি ধৌলি গঙ্গার পাশ দিয়ে। সরু রাস্তা, মাঝে মাঝেই ঝরনার জল পাহাড় বেয়ে রাস্তাকে ভিজিয়ে দিচ্ছে। ধৌলিগঙ্গার বিশালাকৃতি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প পার হয়ে অবশেষে সকাল ১০টা নাগাদ নারায়ণ আশ্রম এলাম।

এখান থেকে শুরু হল পায়ে হাঁটা বা ট্রেকিং পথ। বিকল্প ব্যবস্থা পনিও এখান থেকেই নেওয়া যায়। আশ্রম থেকে লুচি, হালুয়া প্রসাদ খেয়ে হাতে লাঠি নিয়ে আমাদের পথ চলা শুরু। পাহাড়ি সরু রাস্তা, ছোটো পাহাড় পেরিয়ে আমরা গেলাম এখান থেকে ১৩ কিলোমিটার দূরত্বে, শিরখা গ্রাম ১,০২০ মিটার (৩,৩৪৬ ফুট) থেকে ২,২১০ মিটার (৭,২৫১ ফুট) উপরে। প্রথমদিনের এই ট্রেকিং পর্বে ঘণ্টা চারেক পথ পার হয়ে সকলেই বেশ পরিশ্রান্ত। কিন্তু প্রকৃতির উজাড় করা সৌন্দর্য আমাদের হাতছানি দিচ্ছে গন্তব্যের লক্ষ্যে। উৎসাহ ও উদ্দীপনায় কখন যেন পাহাড়ের মাথায় এসে পৌঁছেছি। দূরে নীচে দেখা যাচ্ছে ছবির মতো শিরখা গ্রাম। আরও ঘণ্টা তিনেক বাদে বেলা দুটো নাগাদ শিরখায় পৌঁছোলাম। ধারচুলা পর্যন্ত আমাদের রাত্রিবাস ছিল কুমায়ুনের পর্যটন নিবাসে। এখন থেকে আমাদের অস্থায়ী আস্তানায় রাত্রিবাস।

আমাদের দলের যাত্রীদের মধ্যে দুজন ডাক্তার আছেন। বরোদার ডাঃ কল্পনা বেদ ও অমরাবতীর ডাঃ সন্দীপ জাদেজা। নারায়ণ আশ্রম থেকে আমাদের সঙ্গ নিয়েছেন কুমায়ুন পর্যটন নিগমের পথপ্রদর্শক, উত্তরাখণ্ড সরকারের একজন ডাক্তার ও তার সাহায্যকারী। এছাড়াও দুজন পুলিশ সঙ্গে ওয়ারলেস সেট, যার ব্যাপ্তি ৫ কিলোমিটার। একজন সবার সামনে ও অন্যজন সবার পিছনে যোগাযোগ করে চলবে। এখান থেকে যোগাযোগ বলতে একমাত্র লিয়াঁজো অফিসারের সাথে স্যাটেলাইট ফোন।

১১ জুন ভোর ৫টার মধ্যে বেরিয়ে পড়লাম ১৪ কিলোমিটার দূরের ২,৩৩৫ মিটার (৭,৬৬০ ফুট) উচ্চতায় গালার উদ্দেশে। একে একে পেরিয়ে এলাম পাহাড়ি ঝরনা, ঝোড়া। অজস্র বাহারি পাহাড়ি ফুল বাগিচা।

পরদিন আমাদের গন্তব্য ২,৭০০ মিটার (৮,৮৫৮ ফুট) উচ্চতায় ২১ কিলোমিটার দূরের বুধি। আমাদের ট্রেকিংয়ের সম্ভবত সর্বাধিক দুরূহ, কষ্টসাধ্য অথচ রোমাঞ্চকর পথ। প্রথম ২ কিলোমিটার পার হতে নামতে হল ৪,৪৪৪ ধাপের পাহাড়ি, অসমতল খাড়াই সিঁড়ি। ঘণ্টা চারেক চলার পর কালী নদী আমাদের যাত্রাপথে আবার ফিরে এল। এখানে কালী নদী প্রচণ্ড গতিতে বিশাল গর্জন করে বয়ে চলেছে। আমরা চলেছি সরু রাস্তা ধরে অতি সাবধানে। একদিকে ঘন জঙ্গলে ভরা খাড়াই পাহাড়, অন্যদিকে প্রায় ১৫ মিটার নীচে খরস্রোতা কালী নদী। ঘণ্টাখানেক পর অপেক্ষাকৃত ভালো রাস্তা ধরে লখনপুর এসে পৌঁছলাম। হঠাৎ দেখি রাস্তার উপর ছাতার মতো পাহাড় ঢেকে রয়েছে এবং উপর থেকে প্রচণ্ড গতিতে ঝরনার জল আমাদের রাস্তায় ধেয়ে আসছে। বর্ষাতি ও ছাতা নিয়ে ওই পথটুকু পার হলেও জুতো, মোজা থেকে প্রায় সবই ভিজে গেল। এর মধ্যে বিভিন্ন বাঁকে দাঁড়িয়ে অন্য যাত্রীদের পথ করে দিতে হচ্ছে। এই পথ ধরে আমরা মালপা পৌঁছলাম। এখানেই ১৯৯৮ সালে এক ভয়ংকর প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা ঘটে। যাত্রীদের একটি পুরো দল ও একটা গ্রাম পাহাড়ের ধসে এখনও পাথরচাপা হয়ে আছে। আগে এখানেই যাত্রীদের বিশ্রাম ও থাকবার বন্দোবস্ত ছিল। ১৯৯৯ সাল থেকে কিছুটা দূরের বুধিতে ব্যবস্থা। প্রায় বিকেল ৪টায় আমরা বুধিতে পৌঁছলাম।

পরদিন ভোর ৫টায় বেরিয়ে ঘন কুয়াশার মধ্যেই পথ চলা। পথের দুদিকে ঘন জঙ্গল। নানারকম বিশালকায় জন্তুর কংকাল পড়ে আছে। কালী নদী মেতেছে লুকোচুরি খেলায়। প্রায় ৫ কিলোমিটার ট্রেক করে ২,০০০ ফুট চড়াই পার হয়ে সামনে দেখি বিস্তৃত চিয়ালেক উপত্যকা– প্রকৃতির এক ভিন্ন রূপ। চারিদিক ঘন সবুজ, বিভিন্নরকম ফুল তাদের বিচিত্র বর্ণ ও ভঙ্গিমায়, কুয়াশার আবরণ ও ঝোড়ো হাওয়া আমাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। শরীরের সব ক্লান্তি উধাও। এখানে আমাদের পাসপোর্ট পরীক্ষা করে খাতায় নাম নথিবদ্ধ হল। উপত্যকা পার হয়ে গারবিয়াং গ্রামে এলাম। এই গ্রামের অপর নাম ডুবন্ত গ্রাম। গত ১৫ বছরে এই গ্রাম প্রায় ৬০ ফুট নীচে নেমে গেছে। সম্ভবত এর অবস্থান কোনো ডুবন্ত বরফ শৈলীর উপর। গ্রামের শেষ প্রান্তে আরেকটি চেক পোস্ট। ওখানে আমাদের পাসপোর্ট আবার পরীক্ষা করা হল।

পথ আবার চড়াই, সবুজ ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে। প্রকৃতির রুক্ষ রূপ এখানে। আবার আমাদের সাথে দেখা কালী নদীর। সামনে পাহাড়ের মাথায় দেখা যাচ্ছে ৩,১৮০ মিটার (১০,৪৩৩ ফুট) উচ্চতায় বুধি থেকে ১৮ কিলোমিটার দূরের গুঞ্জি, আমাদের আজকের আস্তানা। রাস্তা টানা চড়াই। অতিক্রম করতে হবে আরও ৪ কিলোমিটার পথ।

১৪ জুন, আজ গুঞ্জিতে আমাদের বিশ্রাম ও একই সাথে আরও এগিয়ে যাওয়ার ছাড়পত্র নেওয়ার পালা। সকালের জলখাবার সারলাম। সামনে বিস্তৃত তুষারে ঢাকা পর্বত শৃঙ্গ। এখান থেকে সুদৃশ্য

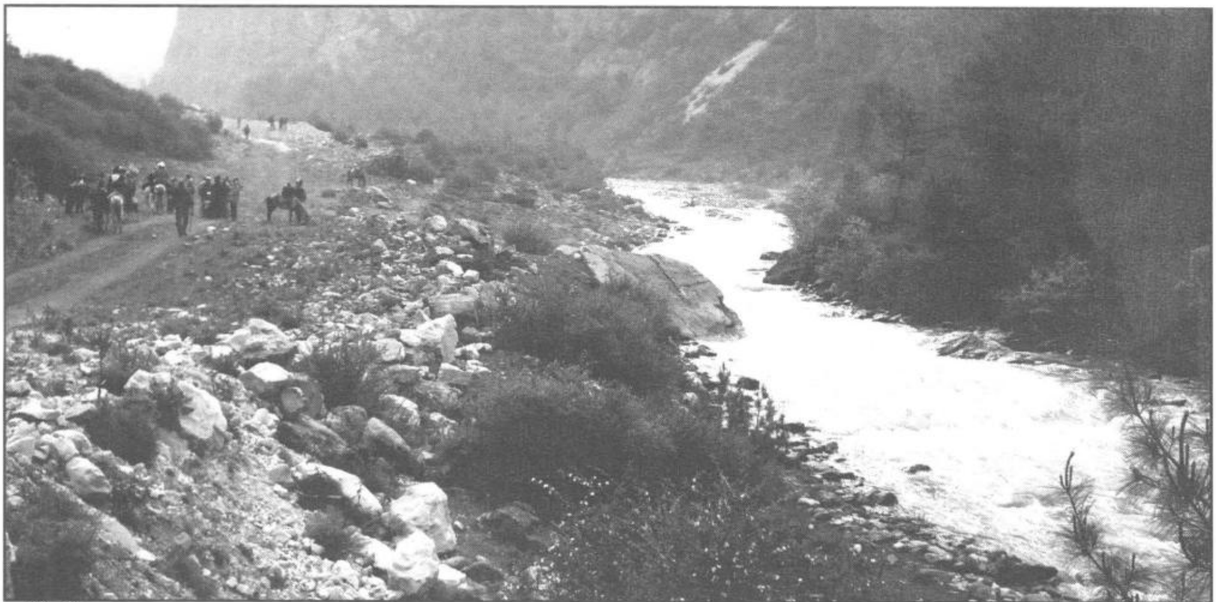

কালী নদীর ধার ধরে আমরা

ছবি- লেখক

অন্নপূর্ণা শৃঙ্গ ক্যামেরা বন্দী করলাম।

এখান থেকেই আই টি বি পি হাসপাতালে দিল্লির শারীরিক পরীক্ষার রিপোর্ট পর্যালোচনা করে সীমানা পেরোনোর অনুমতি নেবার পালা। মাত্রাতিরিক্ত পরিশ্রমে আমার হৃদস্পন্দন এবং রক্তচাপ দুটোই স্বাভাবিক অবস্থা থেকে বেশি ছিল। প্রথম দফার মেডিক্যাল বোর্ড আমি সহ আরও ৫ জনকে বেলা তিনটের সময় আবার পরীক্ষার সিদ্ধান্ত নিল। লাঞ্চের পরে এক বাঙালি ভদ্রলোক রমেন বিশ্বাস, নদীয়া জেলার রানাঘাটে বাড়ি, এখানে কর্মরত মেডিক্যাল স্টাফ, আমাকে দুটো ক্যাপসুল দিলেন এবং অভয় দিলেন পরবর্তী পরীক্ষার জন্য। দ্বিতীয়বার মেডিক্যাল পরীক্ষার পর আমরা ৬ জন ছাড়পত্র পেলাম। এই ছাড়পত্র আমার উদ্বিগ্ন মনকে আবার উৎফুল্ল করল। ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে মনকে প্রস্তুত করলাম আগামী দিনের যাত্রার উদ্দেশে।

১৫ জুন শারীরিক ক্লান্তি কাটিয়ে উৎফুল্ল মনে যথারীতি ভোর বেলা ট্রেকিং শুরু করলাম। রাস্তা মোটামুটি ভালো। কিছু উপরে উঠে আমরা সামরিক বাহিনীর একটা ট্রাক দেখে অবাক হয়েছিলাম। পরে খবর নিয়ে জানলাম, গুঞ্জি থেকে ভারত-চিন সীমান্ত লিপুলেখ পর্যন্ত রাস্তা তৈরির পরিকল্পনা আছে। গুঞ্জিতে একটি হেলিপ্যাড আছে। এই ট্রাকটি এবং রাস্তা তৈরির অন্যান্য যন্ত্র ও সরঞ্জাম হেলিকপ্টার করে এখানে আনা হয়েছে। আমরা কালী নদীকে পাশে রেখে ৯ কিলোমিটার দূরের কালাপানি পৌঁছে গেলাম। এখানে আই টি বি পি-র বড়ো বেস স্টেশন রয়েছে। সামনে একটি মন্দির। এই মন্দির থেকে জলের সরু স্রোত হচ্ছে কালী নদীর উৎস। এই সরু স্রোত বিভিন্ন ঝরনার সাথে মিলে মিশে বিশাল গর্জনে বিপুল স্রোতে বয়ে চলেছে। এখানকার ইমিগ্রেশন অফিসে পাশপোর্টে সিলমোহর লাগিয়ে এগিয়ে যাওয়ার অনুমতি পেলাম। এ রাস্তায় কিছু খরস্রোতা ঝোরা পার হতে হবে। আই টি বি পি-র কর্মীদের সহযোগিতায় হাত ধরে চেন সিস্টেমে সবাই সুষ্ঠুভাবে পার হয়ে এলাম। এরপর ক্রমাগত চড়াই পার হয়ে কালাপানি থেকে ৯ কিলোমিটার দূরে ৪,৩৪৫ মিটার (১৪,২৫৫ ফুট) উঁচুতে নাভিডাং পৌঁছলাম। এখন আকাশ মেঘমুক্ত। পূর্ব দিকে ওঁ পর্বতের মাথায় প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট সাদা বরফের 'ওঁ' টি আমাদের চোখের সামনে। এক অনন্য তৃপ্তি এবং মুগ্ধতা আমাকে আচ্ছন্ন করল। আলোয় উদ্ভাসিত প্রকৃতির অনির্বচনীয় রূপে ও অভিব্যক্তিতে ঈশ্বরের প্রসাদ অনুভব করলাম।

১৬ জুন মধ্যরাতে (রাত ১টা ৩০ মিনিট) ঘুম থেকে উঠে সবাই বেরিয়ে পড়লাম লিপুলেখ সীমান্তের উদ্দেশে। ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে হাঁটা। উপযুক্ত পোশাকের আড়ালেও প্রচণ্ড ঠান্ডা সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া। আমাদের গাইড সামনে চলেছেন। পিছনে একসারিতে আগের জনের পায়ের স্টেপ দেখে সবাই ধীরে ধীরে এগোচ্ছি। প্রায় ১৬,০০০ ফুট উচ্চতায় বরফের উপর দিয়ে হেঁটে চলেছি। ধীরে ধীরে ৪টে ৩০ মিনিট নাগাদ আকাশ ফুটে আলো দেখা যাচ্ছে। বাতাসে অক্সিজেনের মাত্রা কমে আসছে।

একটু পরেই দূর আকাশে সূর্যকিরণে আলোর বিচ্ছুরণ। এ এক অবর্ণনীয় শোভা। আমাদের চারপাশ জুড়ে পর্বতমালার বিভিন্ন বর্ণময় চূড়ার ব্যাপ্তি। কবির সুরে প্রাণ গেয়ে উঠল, "আলোয় আলোকময় করে হে এলে আলোর আলো।" আমরা চলে এলাম ৯ কিলোমিটার দূরের অস্থায়ী ৫,৩৬৬ মিটার (১৭,৬০৫ ফুট) ভারত-চিন সীমান্তে লিপুলেখ পাসে।

(আগামী সংখ্যায় আমরা সীমান্তের ওপারে যাব)

পরিচিতি

অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক।

বয়স হিমালয়ের পথে পথে হাঁটার নেশাকে দমাতে পারেনি।

রেশম পথে

পার্থ বসু

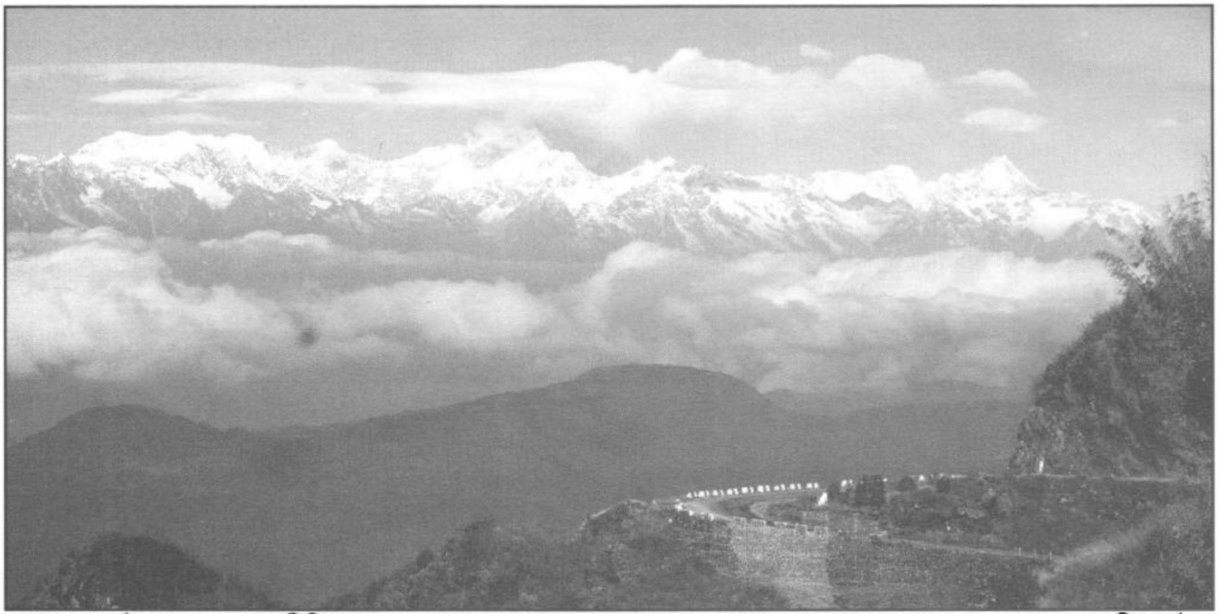

রেশম পথের বাঁকে— জেলেপ লা, সিকিম

ছবি-পার্থ বসু

আপ কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেসে সওয়ারি হওয়ার উপরিপাওনা— ভোরের জঙ্গলে বিনে পয়সার ট্রেন-সাফারি। প্রতিবারই কিছু না কিছু বন্যপ্রাণ দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। এবারও ব্যতিক্রম নয়। গাছের ডালে বসে থাকা ময়ূর, লাইনের পাশে সম্বর শাবকের ছোটাছুটি আর গোটা দুই বন্যশুয়োরের খুনসুটি। এছাড়া কপারস্মিথ বারবেট কিংবা ট্রি-পাইদের ওড়াউড়িতো আছেই। এপথে পাহাড়ি ডুয়ার্স আর তরাইয়ের অদ্ভুত মেলবন্ধন। গাড়ির গতি কম থাকে, তাই বেশ তারিয়েই উপভোগ করা যায়। সেবক স্টেশন পেরোলেই তিস্তা ব্রিজ। তারপর টানেল পেরিয়ে চা-বাগান। মালবাজার পর্যন্ত সময় হুড়মুড়িয়ে শেষ হয়ে যায়। আবহাওয়া পরিষ্কার থাকলে মালবাজার স্টেশনে নেমেই চোখে পড়ে সপার্ষদ কাঞ্চনজঙ্ঘা আপন গরিমায় বিরাজমান।

ছোটকা। আমাদের পূর্ব পরিচিত ড্রাইভার। আসল নামটা কোনওদিন জানাই হয়নি। বা জানবার প্রয়োজনই বোধ করিনি। দাদা বলে আলিঙ্গন করে নেয় একবার। তারপর মালপত্তর গাড়িতে বোঝাই করে পানমশলা জাতীয় কিছু একটা মুখে পুড়ে তাড়া লাগায়। একবার মাথা নেড়ে আমরাও গাড়িতে সওয়ার হই। তেল ভরবার জন্য মাল শহরে ঢুকতেই হয়। এই ফাঁকে ব্রেকফাস্ট কিংবা প্রয়োজনীয় কেনাকাটায় ব্যস্ত হয় সকলে। ঘন্টার কাঁটা একচক্কর মারার আগেই যে যার সিটে। গরুবাথান পেরিয়ে গাড়ি উঠে চলে লাভার উদ্দেশে। ছোটকা জানায় শর্ট রুটে যাবে। রাস্তা একটু খারাপ হলেও জলদি পৌঁছনো যাবে। এপথে পাইনের সংঘবদ্ধ ঘেরাটোপ। আকাশের নীল রঙে ধূসর মেঘের ভিগনেট। কুয়াশা অহংকার ভেঙে বিন্দু বিন্দু জলে গাড়ির উইন্ড স্ক্রিনে আলপনা লেপে দেয়। ছোটকার হাতের ইশারায় ওয়াইপার সেই আলপনার ইন্দ্রজাল নিমেষেই মুছে ফেলছে। ওয়াইপারের হাত যেখানে পৌঁছায় না, সেখানে জলবিন্দুর প্রতিবিম্বে হরেকরঙের ক্যানভাস। খুব খুঁটিয়ে দেখলে গাড়ির ভিতরের খণ্ডচিত্র ধরা পড়ে। সহযাত্রীদের নিমেষেই একঝলক দেখে নেওয়া যায়। ছোটকার বাঁদিকে একেবারে ফ্রন্ট সিটে রয়েছেন দলের পান্ডা ভোম্বলদা। বয়স পঞ্চাশ। হার্টের অপারেশন হয়েছে একবার। তবু প্রায় জবরদস্তিই তাঁকে দলে নেওয়া। গাড়িতে বসেই ছোটকাকে বারবার সাবধান করে দিয়েছেন— বাবা, অহেতুক জোড়ে গাড়ি চালানো যাবে না। আর ওভারটেক নৈব নৈব চ। তার পাশেই রয়েছে আমার কন্যা তিতলি আর সর্বকনিষ্ঠ বছর চারেকের বন্ধুপুত্র তোজো। সে তো আবার ভোম্বলদার ফ্যান কাম নাতি। এবার মাঝের সিটে জানলার ধারে ভ্রাতৃপ্রতিম বন্ধুর স্ত্রী তুলি, তারপাশেই পাড়াতুতো মাসি মন্টা, মন্টার ডানদিকে আমার সহধর্মিণী দেবযানী এবং একদম ডানহাতের জানলার পাশে ভোম্বলদার স্ত্রী লিলিদি। পিছনের সিটে বন্ধুবর সৃজিত, ভোম্বলদার একমাত্র পুত্র বাবাই এবং আমি।

ছোটকা ব্রেক কষে গাড়ি থামায়। তারপর ইঞ্জিন বন্ধ করে পিছনের

চাকায় পাথর গুঁজে রাস্তার ওপারে একটি গুমটির মধ্যে প্রবেশ করে। আমরা তাকিয়ে দেখি ফরেস্ট চেক পোস্ট। পিছনেই বাংলো ধাঁচের একটি বাড়ি। গতবারের ভূমিকম্পে ফাটল ধরেছে। তাই এখন বসবাসঅযোগ্য। গাড়ির নম্বর, চালকের নাম ও যাত্রীসংখ্যা লিখে ঢোকার অনুমতি মেলে। কারণ আমরা এখন নেওড়া জাতীয় উদ্যানের দোরগোড়ায়। পিচবর্জিত মোটরপথ কোলাখাম পেরিয়ে চলে গেছে অন্যগ্রামে! আমরা অবশ্য ওই কোলাখাম পর্যন্ত। এপথে সদাহাস্যমুখে কীভাবে যে ওরা গাড়ি চালায় কে জানে! অসমান রাস্তায় কখনও পাথর, কখনও গাছের ডাল আবার কখনও জমে থাকা জলে চাকা ডুবিয়ে গাড়ি এগিয়ে চলে। রাস্তা নিম্নমুখী। আর গাড়ির ভেতরের সওয়ারিরা এ ওর গায়ে পড়ে তুমুল হাস্যরোলে এই মেমোরেবল জার্নির মজা নিয়ে চলেছে। আমরা ভারতীয়রা সত্যি কতটা সহিষ্ণু! বেলা দুটো। পৌঁছে গেলাম কোলাখাম। ছোটো পাহাড়ি জনপদ। হাতে গোনা গোটা কয়েক বাড়ি। তাতেই হোম-স্টে আর রিসর্ট। যে রিসর্টে আমরা উঠলাম তার ইন্টিরিয়র ভারী সুন্দর। সামনের লনে নানা ফুলের কেয়ারিকরা বাগান। বাঁশ-কাঠের মিশ্রণে সিঁড়ির রেলিং। নিভৃতে উড়ে বেড়াচ্ছে লাফিং থ্রাশ, বুলবুল কিংবা ফ্লাইক্যাচারের দল।

বিকেল থেকেই কুয়াশার জবরদখল। ডিসেম্বরের শেষে পাহাড়ে নতুন বরফ পড়বে, তাই নিচের দিকে কুয়াশার দৌরাত্ম্যতো একটু সহ্য করতেই হয়। সবাই মিলে খানিক হাঁটাহাঁটির পর এবার ঘরে ফেরা। ঠান্ডার দাপট বাড়ছে। কিন্তু কোলাখামকে ঠিক পছন্দ হয়নি কারও। রাস্তা খারাপ থাকার জন্য নিচের দিকের জলপ্রপাত দেখতে যাওয়ার পরিকল্পনাও বাতিল করা হয়েছে। আগামীকাল যেতে হবে ইচ্ছেগাঁও।

লাভা অবধি প্রায় একই রাস্তা। লাভা থেকে রাস্তা তুলনামূলক ভালো। লাভা মনাস্ট্রি দেখে গাড়ি চলল ইচ্ছেগাঁওয়ের পথে। ছোটকা এপথে আসেনি কোনওদিন। মাঝে মাঝেই গাড়ি থামিয়ে পথচলতি আগন্তুককে ইচ্ছেগাঁওয়ের ঠিকানা জিজ্ঞাসা করতে হচ্ছে। খুব একটা সময় লাগল না। অচিরেই পৌঁছে যাওয়া গেল ইচ্ছেগাঁওয়ে। জায়গাটা ভারি চমৎকার। প্রধান রাস্তা থেকে কিলোমিটার তিনেক উজান পথে জঙ্গলের মাঝে একটা ছোট্ট গ্রাম। গোটা তিরিশেক ঘরবাড়ি। তাও যেখানে গাড়ি পৌঁছলো সেখান থেকে পায়ে হেঁটে শ-তিনেক মিটার উপরে উঠতে হবে। পারফেক্ট হোম-স্টে। ওরাই লোকদিয়ে লাগেজ টানিয়ে দিল। পৌঁছতেই গরম গরম চা। দুপুরের মেনু এবং সময় বলে দিয়ে চলে গেল সুন্দরী তন্বী গায়েত্রী রাই। কালিম্পংয়ের কলেজে পাঠ্যরতা গায়েত্রী বছর শেষের ছুটিতে বাড়ি ফিরেই অতিথিসেবায় মশগুল। খানিক বিশ্রামের পর গ্রাম পরিক্রমায় সকলে। ইতিমধ্যে দলের সবাইকে কেমন পাখিপাগল করে তুলেছি। যে যেখানেই পাখি দেখতে পাচ্ছে তার ছবি তোলার চেষ্টা করছে নচেৎ অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে এবং সেটাও বেশ সিরিয়াস হয়েই। প্রকৃতির মাঝে এসে পড়লে, তাকে রক্ষা করার তাগিদটা এসেই যায়। প্রকৃতি নিজের মতোই গড়ে নেয় তাদের। শুধু আগুনটা একটু উসকে দেওয়ার প্রয়োজন। গায়েত্রী হাত নেড়ে খাওয়ার ডাক দিতেই সবাই হাজির। এই অল্পসময়ের প্রস্তুতিতে কী অসাধারণ রান্নাই না করেছে! ভোম্বলদার মতো বাছবিচার করে খাওয়া মানুষও শেষ অবধি চেটেপুটে পাত পরিষ্কার করে লিলিদির উদ্দেশে বলে ওঠে, লিলি, বুঝলে ওকে ছেলের বউ করলে মন্দ হয় না। খানিক দূরে বসে থাকা বাবাই বিষম খেয়ে ওঠে। আমরা সবাই হো হো করে হেসে উঠি। গায়েত্রীও না বুঝে আমাদের হাস্যরোলের ভাগিদার হয়। ভোম্বলদা হাত ধুতে যাওযার সময় গায়েত্রীর মাথায় হাত বুলিয়ে আরেকবার তারিফ জানায়।

ছোটকাকে এখানে পৌঁছেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কারণ ওর গাড়ির পারমিট নেই সিকিমে প্রবেশ করার। তাই সিকিম থেকে কুমারকে ডেকে নেওয়া হল। এরপর থেকে কুমারই আমাদের সারথি। ইচ্ছেগাঁও থেকে মেঘমুক্ত আকাশে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায়। দলের সকলে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে না পেলেও যারপরনাই খুশি ইচ্ছেগাঁওতে ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়াতে পেরে। সবচেয়ে খুশি তোজো আর তিতলি। কাল থেকে ওদের সঙ্গী হয়েছে একটি কুকুরছানা। প্রথম প্রথম ভয় পেলেও এখন ওরা বেশ বন্ধু। তোজো ওকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার কথাও পেড়ে রেখেছে বারকতক। আপনজনের সান্নিধ্যে এলে বিদায় জানাবার সময়টা খুব মুশকিলের হয়। একদিকে তোজো কিছুতেই ছেড়ে যাবে না ওই সারমেয় শাবকটিকে। আর বড়োদের দু'চোখের কোনও ভিজে ওঠে। তবু ছেড়ে যেতে হয়। মিথ্যে হলেও বলতে হয় 'ফির মিলেঙ্গে'!

আজ যাব আরিতার হয়ে মানখিম। রিশি খোলা পেরিয়ে সিকিমে প্রবেশ। একবার গাড়ি থামাতেই হয় এন্ট্রি বুকে নাম ওঠাবার জন্য। রেনক বাজার থেকে প্রয়োজনীয় ওষুধ নিয়ে আবার এগিয়ে চলা। এপথ ঊর্ধ্বমুখী। আরিতার পেরিয়ে গাড়ি সোজা উপরে উঠে যায় মানখিমে। গিরিশিরার উপরে খানিক পরিসরে চার-পাঁচটি হোম-স্টে। গিরিশিরা বরাবর কংক্রিটের সিঁড়ি চলে গিয়েছে। শেষে একটি ভিউ পয়েন্ট। বেশ ফটোজেনিক ভিউ। একটি কংক্রিটের ছাতার নিচে বসার ব্যবস্থা। ঘরে মালপত্র রেখে লাঞ্চের অর্ডার দিয়ে সবাই চললাম ভিউ পয়েন্টে। তোজো-তিতলি কুকুরছানার শোক কিছুটা কাটিয়ে উঠেছে। ওপর থেকে আরিতার লেক চমৎকার লাগে। একটি বুটের আকারে জমে থাকা জল। যদিও কৃত্রিমভাবে এই লেক তৈরি করা হয়েছে। গিরিশিরার মাথায় শিবমন্দির। সেখানে প্রেয়ার ফ্ল্যাগ লাগানো রয়েছে। সিঁড়ি ধরেই নেমে যাওয়া যায় লেকের পাশে। আমরা অবশ্য আগামীকাল যাব সেখানে। আকাশে এখনও মেঘের ঘনঘটা। দূরে দূরে স্টেপ চাষ আর পাহাড়ি জনবসতি। অনেকটা যেন বার্ডস আই ভিউ।

সকালে মন্টার ডাকে ঘুম ভাঙে। সম্পর্কে মাসিশাশুড়ি হলেও সৃজিতের থেকে ছোটো। এমন জামাই প্রথম দেখলাম যে শাশুড়িকে তুই তাকারি করে সম্বোধন করে। দ্যাখো দ্যাখো কী সুন্দর! সৃজিত বলে ওঠে, এই মন্টা তুই নিজেকে সকাল সকাল এত সুন্দর বলে চেঁচাচ্ছিস কেন? খানিক লাজুক স্বরে মন্টা বলে, আরে আমি না কাঞ্চনজঙ্ঘা। শোনামাত্র যে যেরকম অবস্থায় ছিল বেরিয়ে আসি ছাদে। অপূর্ব! সত্যিই সুন্দর! আকাশজুড়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা। মেঘের পাতলা আস্তরণে সম্পূর্ণটা পরিষ্কার না হলেও আমাদের মতো হতভাগাদের কাছে এতো সোনায় সোহাগা। সকালবেলায় মনটা ভরে গেল। গতকাল বিকেলেই কুমার প্রয়োজনীয় পারমিট করে নিয়ে এসেছে। আজ অনেকটা পথ গিয়ে আবার ফিরতে

হবে। তাই ভোর ভোর সবাই রেডি। খানিকবাদে কুমারও এসে পড়ল। আরিতার থেকে কিছুটা নিচে দলাপচাঁদ। সেখানে হোম-স্টে বানিয়েছেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক কর্মা ভুটিয়া। ভারী সুন্দর এবং রুচিসম্মত। ওখানেই বোঁচকা নামিয়ে আমরা ছুটলাম রেশমপথের বাঁকে।

জুলুক অবধি রাস্তা আম পাহাড়ি রাস্তার মতোই। গাছের আধিক্য এবার কমে এসেছে। পথ ঘুরে ঘুরে উঠে চলেছে উপরে। সাপ-লুডো খেলায় বাঁকে বাঁকে উচ্চতাবৃদ্ধি ঘটছে। উপর থেকে জুলুকের সৌন্দর্য চোখ টানে। চমরি গাইয়ের দল রাস্তার পাশে পাশেই। কোথাও ছায়ার আশকারায় এখনও সতেজ বরফের আস্তরণ। বরফ ছোঁওয়ার আকুল ইচ্ছাকে চেপে রাখতেই হচ্ছে। এপথে গাড়ি দাঁড় করানো বোকামির কাজ। জিলিপির প্যাঁচ পয়জারে ঘুরতে ঘুরতে একসময় পৌঁছে যাই থাম্বি ভিউ পয়েন্টে। স্বল্প পরিসর জায়গায় কুমার গাড়ি পার্ক করে। গাড়ির দরজা খুলতেই এক ঝটকা ঠান্ডা হওয়া স্বাগত জানায়। ছবিতে দেখা রেশমপথের বাঁকগুলি চোখের সামনে জীবন্ত। সামনেই কাঞ্চনজঙ্ঘার হাতছানি। কুমারই জানায় অনেকদিন পর আজ আকাশ পরিষ্কার হয়েছে। অবশ্য নীচের দিক থেকে দলবদ্ধ মেঘের মিছিল এগিয়ে আসছে হু হু করে। মাঝখানে এই মিনিট দশ-বারোর একটা ফাঁকা স্লট। তারপরেই ঢেকে গেল চারপাশটা। কোথায় কাঞ্চনজঙ্ঘা, কোথায় কী! সবই ভোঁ ভাঁ। একটিমাত্র চায়ের দোকান। দোকানি সকালে আসেন ফিরে যান দুপুরেই। টিনেঘেরা অস্থায়ী ছাউনিতে বসেই চা-পান। একটাসময় এই পথেই চলত ব্যবসা-বাণিজ্য। ঘোড়া-খচ্চরে এদেশ থেকে মশলা, সোনা, গুড়, চিনি রপ্তানি হত। আর বদলে মিলত রেশম। কালে কালে রেশম পথ নামেই পরিচিতি। মাঝে চিন-ভারত যুদ্ধের কারণে বেশ কিছু দিন বন্ধ হয়ে যায়। সম্প্রতি আবার চালু হয়েছে। চিন-সীমান্ত নাথুলা খুব দূরে নয়। চা-পর্ব মিটিয়ে গাড়িতে। নাথাং ভ্যালি দেখে পুরনো বাবামন্দির আর কুপুপ লেক– এই আমাদের গন্তব্য। কয়েকঘর স্থানীয়দের বাস। বাকিটা ভারতীয় সেনাবাহিনীর দখলে। উচ্চতাজনিত কারণে অসুবিধা হলেও জায়গাটা চমৎকার। বিশেষত মার্চ-এপ্রিলে। আশপাশে বরফের বিক্ষিপ্ত আস্তরণ। গাড়ি উঠে চলে বাবা মন্দিরের দিকে। প্রচলিত বাবা হরভজন সিংয়ের গল্প আরেকবার মনে মনে আওড়ে নিই। এপাশটা অনেকটা লাদাখের মতো। শুকনো, ন্যাড়া, প্রাণহীন। উচ্চতাও অনেক। খানিকবাদে কুপুপ লেক। রাস্তা থেকে নেমে ফটোশেসন। তোলা ছবিটাকে একশো আশি ডিগ্রি ঘোরালেই হাতির অবয়ব স্পষ্ট হয়। আহ্লাদি নাম তাই এলিফ্যান্ট লেক। এবার ফিরতে হবে দলাপচাঁদ।

রেশমপথেই ফিরে চলা। পথপাশের রডোডেনড্রনগুলি পাতা নেড়ে বিদায় জানায়। মাঝে মাঝে মনে হয় ওদের পাশে বসে রেশমপথের গল্প শুনি। হারিয়ে যাই সেইসময়ের ফাঁকে। ইতিহাস জীবন্ত হয়ে উঠুক চোখের সামনে। সত্যিই কত না জানা ইতিহাস ছড়িয়ে আছে রেশমপথের বাঁকে বাঁকে!

পরিচিতি

ভ্রমণ নেশাকেই পেশা করেছেন। ঘুরতে ঘুরতেই লেখার অভ্যেস।

With best compliments from:-

Dr. Pravash Ch. Manna
&
Mr. Swapan Kr. Mukherjee

Mobile
9836548233 / 9836517351

দে ছুট— বাঁকিপুট

মিতা মণ্ডল (সাহা)

ছুটি মানেই মজা। ছুটি মানেই আনন্দ, হুল্লোড়। কখনও বা নিজের সাথে একলা হওয়ার ফুরসত। ছুটি মানে খোলা হাওয়া– 'কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা।' তাই বাচ্চা হোক বা বুড়ো– ছুটি মানেই খুশিতে চিক্‌চিক্ চোখ, মুখ শরতের আকাশ। আর সে ছুটি যদি হয় অপ্রত্যাশিত তবে তো কোনও কথাই নেই– পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা।

চলতি বছরের এপ্রিল মাসে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের কারণে পাঁচ দিনের 'হঠাৎ ছুটি' পেয়ে গেলাম। ছুটি পেয়েই মনে হল– যাই ভেসে যাই কোন সুদূর– আর সাথে সাথেই মনে পড়ল বাঁকিপুট-এর কথা। এক নিকট বন্ধুর কাছে এই জায়গাটার নাম শুনেছিলাম। জায়গাটার ছবি দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। ঠিক করেছিলাম– যাবই আমি যাবই।

বাঁকিপুট নামটা পর্যটকমহলে সুপরিচিত নয়। মেদিনীপুর জেলার কাঁথি থেকে এর দূরত্ব ১৩ কিলোমিটার। আদিম গন্ধ মাখা ছবির মতো সুন্দর এক নির্জন নিরালা সৈকত, যেখানে এখনও প্রকৃতিই রাজা– সে নিজেকে নিজেই সাজিয়ে রেখেছে। মানুষের অযাচিত সৌন্দর্যায়ন-এর আদিখ্যেতা এখনও গ্রাস করেনি তাকে। তবে কতদিন এমন থাকবে বলা কঠিন।

যাইহোক, মন স্থির করা মাত্র অনলাইনে টিকিট ও রিসর্ট বুকিং সারা হল। আর এক্ষেত্রে আমার মিষ্টি বোন-এর কথা না বললেই নয়। অত রাতে আমি একবার বলা মাত্রই হাসিমুখে সব বুকিং রেডি। পরদিন সকাল ৬টা ৪০ মিনিটে তাম্রলিপ্ত এক্সপ্রেসে রওনা দিলাম আমরা চারজন– মা, ছেলে, আমি ও সখা। আমরা নামব কাঁথি স্টেশন– কাঁথির পরে রামনগর আর তারপরেই চিরপরিচিত সুন্দরী দিঘা। জানলা দিয়ে দু'পাশের প্রকৃতি ও জনজীবন চাক্ষুষ করতে করতে আমরা কাঁথি পৌঁছে গেলাম। বাঁকিপুটে আপাতত একটাই রিসর্ট– ঝিনুক রিসর্ট। (পাশে একটি নতুন রিসর্টের কাজ চলছে) তাই আমরা আগে ভাগে বুকিং করে নিশ্চিন্ত মনেই রওনা দিয়েছিলাম। স্টেশনের বাইরে গাড়ি নিয়ে নীলকমলদা (ড্রাইভার) অপেক্ষা করছিলেন আমাদের রিসর্টে পৌঁছে দেবার জন্য। আমরা কাঁথি শহর জুনপুট ছাড়িয়ে এগিয়ে চললাম। পথের দু'ধারে সবুজ গাছের সারির মধ্যে মাঝে মাঝে কৃষ্ণচূড়ার লাজুক উঁকিঝুঁকি, কোথাও বা ঘোমটা সরিয়ে লাজে রাঙা কনেটি। মিনিট পঁচিশ পর আমাদের গাড়ি এসে দাঁড়াল একটা সাধারণ দোতলা বাড়ির সামনে। এটিই ঝিনুক রিসর্ট– আমাদের আগামী দুদিনের আস্তানা। রিসর্টের সামনে রাস্তা, যেটি আসলে বাঁধ আর পিছনে সমুদ্র। রিসর্টের বাউন্ডারির মধ্যে বেশ কিছু গাছপালা আর ছোট একটা পুকুর। দোতলাতে একটিই মাত্র চারশয্যার ঘর– যেটাতে আমরা চারজন থাকব– বাকি ঘরগুলো সবই দ্বিশয্যার। ঘরের দরজা খুলে দেখলাম বেশ প্রশস্ত, খোলামেলা, পরিষ্কার, ছিমছাম। পিছনের ব্যালকনির দরজা খুলতেই মন ভরে গেল– এত কাছে সমুদ্র! ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে মিষ্টি শীতল হাওয়া শরীর ও মনকে চাঙ্গা করে দিল। আমরা যে দুদিন ছিলাম এই হাওয়া আর ব্যালকনি লাগোয়া ঝাউবনে পাখিদের কলতান ছিল আমাদের সবসময়ের সঙ্গী।

আমরা সামান্য চা-বিস্কুট খেয়ে চলে গেলাম সৈকতে। এত কাছে সমুদ্র আর ঝাউবন– মন চায় ছুঁয়ে দেখতে, ডুব দিতে। ভাঁটার টানে সমুদ্র তখন বেশ দূরে, জোয়ারের সময় আবার ঝাউবনের কোলে এসে আছড়ে পড়ে। বেলা তখন প্রায় ১২টা, সূর্যদেব মধ্যগগনে পূর্ণমহিমায় বিরাজমান। তাই সৈকতে না হেঁটে আমরা ঝাউবনের শিরশিরে হাওয়া, মাঝে মাঝে ক্যাকটাসের উঁকিঝুঁকি– এসবের মধ্য দিয়ে চারজনে হাঁটতে লাগলাম। এত পরিষ্কার ঝাউবন না দেখলে বিশ্বাস হয় না। হঠাৎ কয়েকটি ছাগল দেখতে পেলাম– বুঝলাম কাছেই জনবসতি আছে। বেশ কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে ঘরে ফিরে এলাম। স্নান, খাওয়া সেরে একটু বিশ্রাম। বিকেলে যাব দরিয়াপুর ও পেটুয়াঘাট আর কপালকুণ্ডলা মন্দির।

বিকেল ৪টে-তে নীলকমলদা গাড়ি নিয়ে হাজির। নীলকমলদা বেশ ভালো মানুষ। আমাদের প্রথম গন্তব্য দরিয়াপুর লাইটহাউস। ধুলো উড়িয়ে সুরকি রাস্তা দিয়ে ছুটে চলেছে গাড়ি। এই রাস্তায় গাড়ি খুবই কম। যাত্রাপথে গোটা কয়েক সাইকেল ও একটা ট্রেকার দেখতে পেলাম। পৌঁছলাম ৭ কিলোমিটার দূরের লাইট হাউস। ব্রিটিশ আমলে এটি নির্মিত। গল্পে পড়া বাতিঘর আমার চোখের সামনে– জীবনে প্রথমবার চাক্ষুষ করার সুযোগ হল। জেব্রার মতো সাদা-কালো ডোরাকাটা এই বাতিঘর ৯৬ ফুট উঁচু। টিকিট কেটে বাতিঘরের মধ্যে প্রবেশ করলাম। ঘোরানো, ঝকঝকে পরিষ্কার সিঁড়ি উঠে গেছে ওপরে। সে এক দারুণ ভালোলাগা। ঘোরানো সিঁড়ির পাশে ধাপে ধাপে রয়েছে কাচের জানলা। সেরকমই একটা জানলাতে দেখলাম মৌমাছিরা বাসা বেঁধেছে। উঠে গেলাম আরও ওপরে যেখানে সিঁড়ি শেষ হয়েছে আর তার পরের পথটুকু পেরোতে হবে একটা লোহার মই-এ পা রেখে। তারপর গোপন কুঠুরির একটা ছোটো দরজার মতো অংশে খরগোশের মতো নিজের শরীরটা তুলে নিলেই ছাদে। আহ্, উঠে যা দেখলাম তা অবর্ণনীয়, অতুলনীয়। এ যেন সেই জগত যেখানে আমি বরাবর যেতে চেয়েছি। যতদূর চোখ যায় সবুজের সমারোহ। আকাশ এসে চুমু খাচ্ছে সবুজ বনানীর গালে। পড়ন্ত বিকেলে সূর্যদেবকে সাক্ষী রেখে এক অমর প্রেমগাথা অনুভব করলাম।

বাতিঘরের বাতিটা ঢাকা রয়েছে সাদা পরদা দিয়ে। ঠিক পাঁচটাতে পরদা সরিয়ে আলো জ্বালানো হবে। অত ওপরে উঠে নিজেকে কেমন যেন পাখির মতো মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল এই প্রবল হাওয়ায় ডানা দুটো মেলে ধরলেই পাখির চোখ দিয়ে এই অপার সৌন্দর্যে ডুব দিতে পারব। কিন্তু অগত্যা নামতে হল নিচে কারণ সময় হয়েছে আলো জ্বালাবার। ওই সময় বাইরের কাউকে আর থাকতে দেওয়া হয় না। লাইট হাউস লাগোয়া জমিটিতে বেশ সুন্দর করে বাগান করা হয়েছে। নিয়মিত পরিচর্যা করা হয়। এখানেই একটা কৃষ্ণচূড়ার ছায়ায় কিছুক্ষণ বসে রওনা দিলাম পেটুয়াঘাট মৎস্য বন্দরের দিকে। পেটুয়াঘাট দেশের অন্যতম সেরা মৎস্যবন্দর। এখানেই রসুল নদী মিশেছে সাগরে। রসুল নদীর এপারে পেটুয়া ঘাট, অন্যপারে খেজুরি। এই খেজুরির হিজলিতে পোর্তুগিজদের প্রথম বাণিজ্যকুঠি তৈরি হয়েছিল।

পড়ন্ত বিকেলের সোনা রোদ খেলা করছে রসুল নদীর বুকের উপর। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকলাম ঘাটে। বাইনোকুলার দিয়ে মাঝে মাঝে দেখতে চেষ্টা করলাম খেজুরি দ্বীপের খণ্ডচিত্র। খেয়া করে খেজুরির লোকেরা পেটুয়াঘাটে আসা যাওয়া করেন। এরপর নীলকমলদা আমাদের নিয়ে ঘাট সংলগ্ন বাজারে গেলেন। নদীর ধারেই ছোট বাজার। এখানে খুব সস্তায় সুস্বাদু নানারকমের চপ সহযোগে মুড়ি ও চা খেলাম। তারপর সন্ধ্যা নামার একটু আগেই বেরিয়ে পড়লাম। গন্তব্য এখান থেকে ৫ কিলোমিটার দূরে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর উপন্যাসে বিখ্যাত হয়ে ওঠা সেই কপালকুণ্ডলা মন্দির। এখানে পৌঁছতে প্রায় সন্ধ্যাই হয়ে গেল। মেন রাস্তা দিয়ে নেমে সোজা গেলেই মন্দির। জোর পায়ে হাঁটতে লাগলাম। রাস্তার শুরুতেই সাহিত্যসম্রাটের আবক্ষ মূর্তি। সামান্যই হাঁটা পথ পেরিয়ে পৌঁছলাম মন্দিরের সামনে। দরজা বন্ধ, খোঁজ করে জানলাম পাশেই একটা বাড়িতে চাবি আছে। গিয়ে ডাকতেই একজন ভদ্রমহিলা বেরিয়ে এলেন। তার কাছ থেকেই জানলাম এখন ওনাদের পরিবারের দায়িত্বেই রয়েছে এই মন্দির। তিনি সানন্দে তার হাতের কাজ ফেলে আমাদের টর্চের আলোয় ঘুরিয়ে দেখালেন মন্দির প্রাঙ্গণ ও মন্দিরের ভিতর অংশ।

মন্দির সংলগ্ন এলাকায় ঘুরে আমার এক দারুণ আনন্দ হল, আবার একবার অনুভব করলাম– 'সবার উপরে মানুষ সত্য'। এখানকার স্থানীয় মানুষদের আন্তরিকতায় সত্যিই মুগ্ধ হতে হয়। সরল, নিরহংকার মানুষগুলোর সাথে কথা বলে মনে পড়ে গেল বীরভূমের দুজন মানুষের কথা– যাদের ভদ্রতায় আপ্লুত হয়েছিলাম। একজন ছিলেন আমাদের টোটোচালক দাদা যিনি হাসিমুখে আমাদের সব আবদার সহ্য করে দেখিয়েছিলেন আনাচ-কানাচ। আর অন্যজন হলেন খোয়াই-এর একজন দোকানি কাকু, যিনি শুকনো ফলের বীজ, ফুল প্রভৃতি দিয়ে অলংকার বানান– পৌষমেলার মাঠের সামনে পরদিন সকালে দেখতে পেয়ে ডেকে কথা বলেছিলেন। এখানেও পেয়ে গেলাম তেমনি কিছু মানুষের সান্নিধ্য। তীব্র গরমের হাত থেকে রক্ষা পেতে সন্ধেবেলা গ্রামের মানুষেরা এসে বসেছেন মূল রাস্তা লাগোয়া খোলা মাঠে। মাঠের একদিকে প্রাচীন শিবমন্দির। আলাপ করলেন একজন বৃদ্ধ– কোথা থেকে এসেছি, কোথায় আছি, মন্দির দেখতে পারলাম কি না– আরো কত গল্প। ভদ্রলোকের ছেলেরা কলকাতায় থাকেন– তিনিও মাঝে মাঝে যান। কি সুন্দর গল্প করলেন আমাদের সাথে– যেন কতদিনের চেনা! নিপাট ভদ্রলোক। শিবমন্দিরে গিয়ে কথা হল কিছু নারী ও পুরুষের সাথে– তারা নীলপূজার সন্ন্যাস পালন করছেন। জানালেন এই মন্দির চত্বরেই থাকবেন সারারাত। আমাদের জানালেন মন্দির প্রতিষ্ঠার ইতিহাস। আন্তরিকতার সাথে আমাদের প্রসাদ দিলেন। ভাবতে অবাক লাগে– সময়ের অভাবে আমাদের ব্যস্ততম জীবনে অনেক সময় পরিচিত মানুষও অচেনা হয়ে যায়। কিন্তু এখানে অপরিচিত মানুষ মুহূর্তে পরিচিত হয়ে যায়– আর এই জন্যই জীবন এখনও বহমান। অনেকটা ভালোলাগা আর আনন্দ ঝুলিতে ভরে ফিরে এলাম ঘরে।

পরদিন সকালে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলাম সমুদ্র লাগোয়া জেলে পাড়ায়। বাঁধের উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ঝাউবন-এর মধ্য দিয়ে পৌঁছে গেলাম বোল্ডার-এর কাছে। ভাঙন রুখতে এইপাশটা বোল্ডার দিয়ে বাঁধানো। এখানে দেখা হল একদল কচি-কাঁচার সাথে– যারা আপনমনে খেলছিল। আর দুটি মেয়ে শিমূল তুলো কুড়িয়ে প্যাকেটে রাখছিল। ওরা এই জেলে পাড়ারই বাসিন্দা। ওদের গল্প শুনলাম। ওদের সঙ্গে কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে ফিরে এলাম রিসর্টের পিছনের ঝাউবনে। সেখানে তখন সমুদ্র থেকে পাড়ে এসেছে মাছ। গোছাচ্ছে জেলেরা– চিংড়ি, কাঁকড়া আর নাম না জানা কিছু মাছ। ওদের থেকে টাটকা মাছ কিনলাম আর সেগুলো রিসর্টের রাঁধুনী দাদা দারুণ সুস্বাদু ঝোল বানিয়ে দুপুরে দিলেন ভাতের সাথে। আহা, অপূর্ব সে স্বাদ! ওনার হাতের রান্না পোস্ত সত্যিই অসাধারণ– খুব যত্ন নিয়ে তৈরি করা, এখানে আর একজনের সাথে আলাপ হল। রিসর্টের পাশের বাড়ির ভদ্রমহিলা– ঝাউবনেই তো আমরা বেশিরভাগ সময় কাটাচ্ছি– ওনার সাথে হঠাৎই পরিচয় হয়ে গেল। এখানে ডাবের খোঁজ করতে উনি বাড়ি থেকে চারটে ডাব যত্ন করে আমাদের দিয়ে গেলেন সঙ্গে দা ও গ্লাস। সন্ধেবেলা ওনার বাড়ি থেকেই গরুর টাটকা দুধ এল। সে স্বাদ সত্যিই ভোলার নয়। এরকম টুকরো বহু ভালোলাগা এক হয়ে এক দারুণ ছবি তৈরি হল মানসপটে, যা মনের কোণে স্থায়ী হয়ে থাকবে বহুদিন। গ্রাম বাংলার রূপ এখনও সত্যিই অমলিন। কিন্তু রুটি-রুজির টানে ফিরে আসতেই হয়– ফিরে এলামও পরদিন। সকালবেলা সমুদ্র ও ঝাউবনকে বিদায় জানিয়ে ব্যাগপত্তর কাঁধে রওনা হলাম কাঁথির উদ্দেশ্যে। পথে দাঁড়ালাম এক সুন্দরী কৃষ্ণচূড়ার ছায়ায়, যাকে প্রথম দেখাতেই ভালোবেসে ফেলেছিলাম যাওয়ার দিন। দু'চোখ ভরে তার রূপের কাজল চোখে মেখে, মন রাঙিয়ে ফিরে এলাম গাড়িতে। গাড়ি ছুটে চলল কাঁথি শহরের দিকে। আমরা ট্রেনে চেপে বসলাম, ফিরে এলাম চেনা ছকে, কিন্তু গণ্ডিছুটের আনন্দের রেশ রয়ে গেল সারা শরীরে-মনে।

লেখক পরিচিতি

শিক্ষিকা। ছুটির ফাঁক ফোঁকর পেলেই ছোটার নেশা।
অভিজ্ঞতা-বিনিময় পাতায় পাতায়।

পটের গ্রাম নয়া

রত্না ভট্টাচার্য

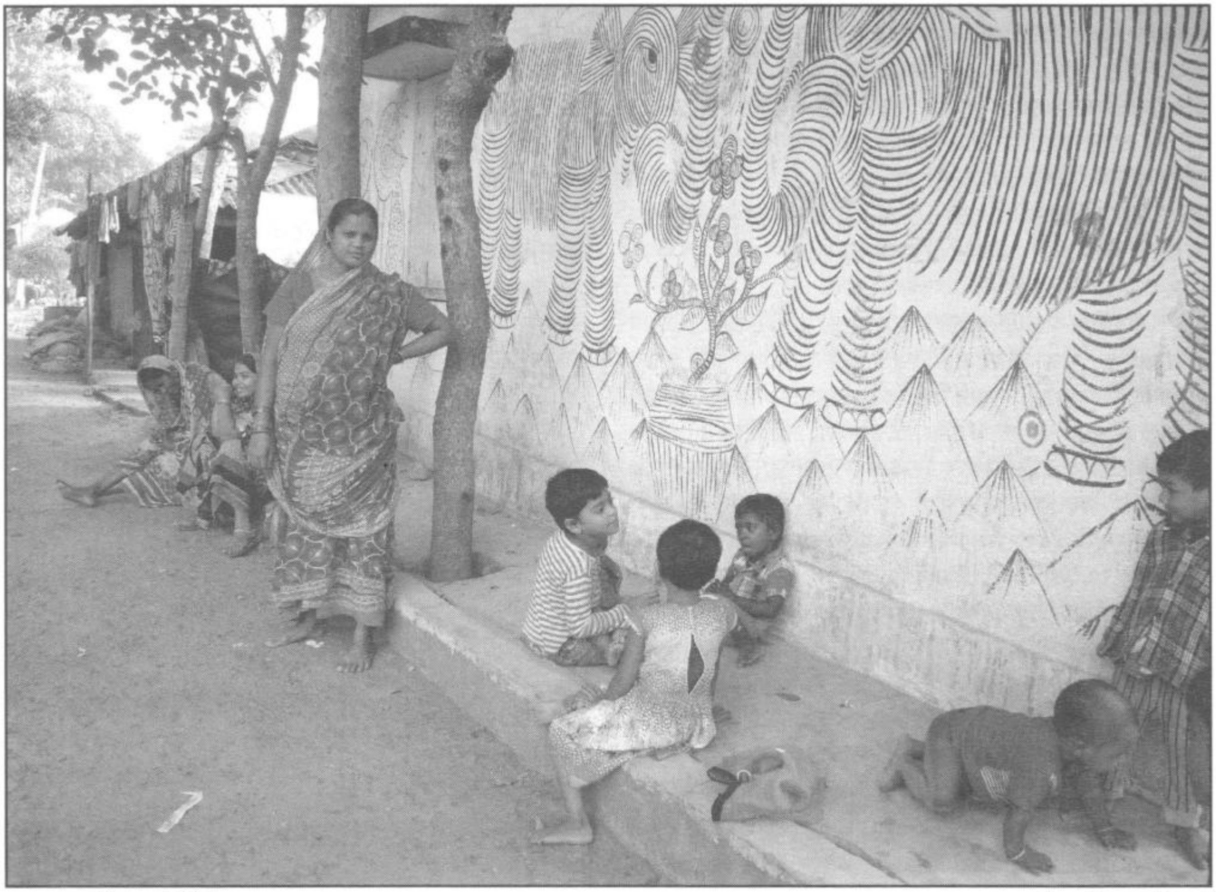

নয়াগ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর

ছবি- শক্তিপদ ভট্টাচার্য

পশ্চিম মেদিনীপুরের পিংলা ব্লকের অন্তর্গত নয়াগ্রাম আজ আর অচেনা গ্রাম নয়, বরং গত পাঁচ-ছ বছর ধরে এই গ্রামই হয়ে উঠেছে শহরের মানুষদের কাছে ফ্যাশন ডেস্টিনেশন। কারণ বেশ কয়েকবছর হল পোশাকে পটচিত্র আঁকার চল শুরু হয়েছে, এখন সেটাই হয়ে গিয়েছে ফ্যাশন ট্রেন্ড। আধুনিকতার মোড়কে সাবেকিয়ানাকে বহন করাই এখন দস্তুর, তাই নয়ার এত চাহিদা। দূরত্বও বেশি নয়, কলকাতা থেকে মাত্র ১৩০ কিলোমিটার। সর্ব-সাকুল্যে আড়াই থেকে তিন ঘণ্টার পথ অতিক্রম করলেই পৌঁছে যাওয়া যাবে উন্মুক্ত প্রকৃতির প্রাঙ্গণে এক অপূর্ব শিল্পের আঙিনায়। আজকের নয়াকে দেখলে ছ-বছর আগের নয়াকে কল্পনাও করা যাবে না। প্রথম দিকে প্রচারবিহীন হয়েও পটচিত্রের মতো পুরনো লোকশিল্পের উত্তরাধিকার বহন করে গেছে দীর্ঘদিন ধরে নয়ার পটুয়া শিল্পীরা।

ত্রিশ থেকে চল্লিশ ঘর পটুয়াকে নিয়ে নয়াগ্রাম অন্যান্য আর পাঁচটা গ্রামের মতোই অতি সাধারণ। কিন্তু অসাধারণত্ব ফুটে উঠেছে প্রতিটি বাড়ির রঙিন চিত্রিত দেওয়ালে। গ্রামের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল শিশু থেকে বৃদ্ধ প্রত্যেকে রং তুলি নিয়ে পটের প্রাণ প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত।

অতীতে এদের ভিটেমাটি ছিল নন্দীগ্রাম, ঠেকুয়া চক, আকুরপুর ও তমলুকের মতো মেদিনীপুরের বিভিন্ন স্থানে। চার-পাঁচ যুগ আগে এ অঞ্চলে পট দেখাতে এসে এখানকার পট দেখার চাহিদা ও মানুষের

দানে গড়ে ওঠে আজকের গ্রাম নয়া। রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত পুলিন চিত্রকর, দুখুশ্যাম চিত্রকর, শ্যামসুন্দর চিত্রকরের মতো আরও অনেকে পথ ছেড়ে দিয়ে ঘর বাঁধে। আস্তে আস্তে তারা তাদের নিজস্ব সমাজ সংসার গড়ে তোলে। হিন্দু, মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের বাড়িতেই যেহেতু পট দেখানোর সূত্রে যাতায়াত সেহেতু এরা দুই সম্প্রদায়ের আচার-বিধি পালন করে থাকে। কেবল তাই নয়, জন্মগত নাম ও পেশাগত নাম হিন্দু-মুসলমান দুই-ই এদের হয়ে থাকে। এরা নিজেদের বিশ্বকর্মার বংশধর বলে মনে করে। আবার কোনও পটুয়ার মতে, ফকির পটুয়া নামে এক চিত্রকর এক নরখাদক দৈত্যের ছবি এঁকে সেই দৈত্যকে বোকা বানিয়ে হত্যা করেছিল। সেই ফকির পটুয়া থেকেই এদের উৎপত্তি। গ্রাম বাংলার জনশিক্ষা ও গণসংযোগের দায়িত্ব এরা আদিকাল থেকে বয়ে আনছে। পটচিত্রের ধারা বিবরণী শোনানো হয় গানের মাধ্যমে। গানের কথা ও সুর বংশানুক্রমে পটুয়াদের মুখে মুখে প্রচারিত। লোকশিল্পের এমন ধারা খুব কমই আছে যেখানে ছবি ও গানের মেলবন্ধন ঘটেছে।

পটের চাহিদা অনুযায়ী দু-ধরণের বিষয় নিয়ে পট তৈরি হয় যেমন সামাজিক ও ধর্মীয়। বীরভূম, বাঁকুড়ার পটের থেকে নয়ার পটের বর্ণময়তা, উজ্জ্বলতা, ভাবনা চিন্তা অনেক বেশী। পটচিত্রগুলিতে ব্যবহৃত হয় পরস্পর বিরোধী রং যাতে পট আরও উজ্জ্বল দেখতে লাগে। আজও ওরা দেশীয় প্রথায় যেমন সেগুন গাছের পাতা থেকে লাল, অপরাজিতা ফুল থেকে নীল, গাছের পাতা থেকে সবুজ, হলুদ গাছের কন্দ থেকে হলুদ, কালোর জন্য ভুসো কালি আর কুসুম মাটি থেকে সাদা রং তৈরি করে নেয়। উজ্জ্বলতা ও স্থায়িত্ব বজায় রাখতে ব্যবহার করে কাঁচা বেলের আঠা। তুলির জন্য আছে ছাগল বা কাঠ বেড়ালির লোম।

পট হয় দু-রকমের। (১) দীঘল পট বা জড়ানো পট (২) চৌকোপট। ক্যালেন্ডারের মতো পাকানো পটে উঠে আসে মূলত পুরাণভিত্তিক বিষয়। এগুলি প্রায় ১৫ থেকে ৩০ ফুট লম্বা। দ্বিতীয় পটগুলি ফ্রেমের মতো আয়তাকার বা বর্গাকার। এগুলি মঙ্গলকাব্য বা মহাকাব্য বিষয়কে কেন্দ্র করে তৈরি হয়– যেমন সতী বেহুলা, পুতনা বধ, মাতা চণ্ডী, মনসা মাতা, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ ইত্যাদি। গ্রামের মহিলা শিল্পীরা নিপুণ হাতে পটের বুকে ফুটিয়ে চলেছে মাছের বিয়ে, রাধাকৃষ্ণ, গণেশ, ধ্যানদাত্রী লক্ষ্মী ইত্যাদি।

নয়ার পটের বিষয়বস্তু পুরাণাশ্রয়ী হলেও বর্তমানে সমসাময়িক আন্তর্জাতিক ঘটনাবলিও স্থান করে নিয়েছে। সমসাময়িক ঘটনার মধ্যে পণপ্রথা, সাক্ষরতা, ঘরে ঘরে শৌচালয় গড়ে তোলার সুর মনকে নাড়া দিয়ে যায়। পটের গানে রয়েছে আদিম সারল্য ও কল্পনার তরল প্রকাশ। এদিক দিয়ে তাদের সমাজ সচেতন শিল্পীও বলা যেতে পারে।

একটা কথা মনে রাখা দরকার যে পট আঁকার জন্য প্রাকৃতিক রং ব্যবহার করা হলেও পোশাকে কিন্তু ব্যবহার করা হয় ফেব্রিক। শাড়ি বিক্রি হচ্ছে ২,০০০ থেকে ২,৫০০ টাকায়। আর শার্ট বা সালোয়ার ৫০০ টাকা থেকে শুরু। পোশাক অনুযায়ী গলার মালা, কানের দুলও রয়েছে যাতে পটের ছবি আঁকা থাকছে। আজকের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যের পশ্চাতে রয়েছে এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগ। ২০১০ থেকে পটুয়ারা ঘর সাজানোর জিনিস বা পোশাকেও পটের ছবি আঁকা শুরু করে। আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। নয়ায় থাকতে চাইলে অতিথি বৎসল পটুয়াদের বাড়িতে কিংবা রিসোর্স সেন্টারে। থাকা-খাওয়া নিয়ে প্রতিদিন মাথাপিছু খরচ ৬০০-৮০০ টাকা।

যোগাযোগ- মন্টু চিত্রকর, ৯৭৩২৭৩১৭৭৬। যাওয়াটা খুব একটা দুরূহ নয়। হাওড়া থেকে লোকাল ট্রেনে বালিচক স্টেশন, তারপর ট্রেকারে নয়া প্রায় ২০ কিলোমিটার। ৬ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে প্রথমে ডেবরা, ডেবরা থেকে বাঁদিকের রাস্তা ধরে বালিচক, বালিচক থেকে মুন্ডমারি হয়ে পিংলার নয়াগ্রাম। বালিচক-ময়না রাজ্য সড়কের পাশেই নয়া।

কার্তিক মাসে এখানে একটি বাৎসরিক মেলা অনুষ্ঠিত হয়। পুজোর কিছুদিন আগে থেকেই নয়ায় লোক সমাগম হতে শুরু করে। চলে দর দস্তুর, কেনা কাটা। কলকাতা থেকে আগত গাড়ির ভিড় লেগেই থাকে। পটুয়াদের হাতে তৈরি পোশাক পড়ার ইচ্ছা থাকলে এবার পুজোর আগে একবার নয়ায় চট করে ঘুরে আসাই যায়।

আরও ছবি- ছবির পাতা-২

পরিচিতি

ভ্রমণের নেশা। জেলার উৎসব, সংস্কৃতি, মেলা ইত্যাদি নিয়ে প্রকাশ করেছেন একাধিক পুস্তক। 'ভ্রমণ আড্ডা'র সংগঠক।

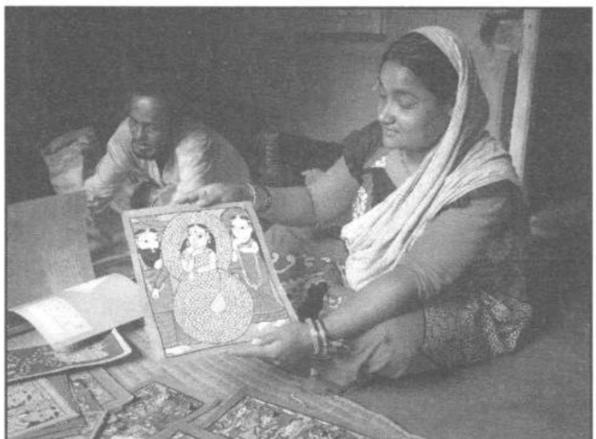

পটচিত্র — ছবি- শক্তিপদ ভট্টাচার্য

কলমে আন্দামান

শ্রেয়সী নন্দী

(অনেকদিন পর কিছু লিখতে বসেছি। এক সফটঅয়্যার ইঞ্জিনিয়ারের কলমে ধরা দিল সুন্দরী আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ।)

সাগরবেলায় আন্দামান ছবি- শর্মালী দাস

আন্দামানের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের দৌলতে আটবছর বয়সে দেখা– 'সবুজ দ্বীপের রাজা'। তারপর থেকেই ইচ্ছে ছিল নীল সমুদ্রের সবুজ রানি দ্বীপপুঞ্জে একবার যাওয়ার। সুযোগ ঘটল ২০১৫ সালে। দুর্গাপুজোর ছুটি নিয়ে বাড়ি আসা, তারপর দ্বাদশীর সকালে জেট এয়ার ওয়েজের বিমানে সপরিবারে পাড়ি পোর্টব্লেয়ার।

ভোরবেলা (সকাল ৫টায়) বিমান ছেড়েছিল কলকাতার মাটি। তারপর প্রায় দুঘণ্টা বাদে বিমানের জানলার কাচ দিয়ে প্রথম উঁকি আন্দামানের ঘন সবুজ বনানীরেখার দিকে!

পোর্টব্লেয়ারে নেমে গাড়িতে করে গেলাম হোটেল ধনলক্ষ্মীতে। এখানে উল্লেখ্য সারা পোর্টব্লেয়ার শহরেই দেখলাম বাঙালির আধিপত্য। হোটেলে স্নান খাওয়া সেরে বিকেলে বেরোলাম ইতিহাসখ্যাত সেলুলার জেলের উদ্দেশে। ব্রিটিশ স্বৈরাচারী শাসকের শত অত্যাচারেও ভারতের বীর বিপ্লবীরা মাথা নোয়াননি। তাঁদের স্পর্শধন্য সেই ভূমিতে শ্রদ্ধায় মাথা নুয়ে এল। বীর দামোদর সাভারকরের মতো কত হাজার হাজার বীর ফাঁসির মঞ্চে প্রণাম জানিয়েছেন ভারত-মাতাকে, বেতের চাবুক তাঁদের মনোবলকে দমাতে পারেনি কোনওদিন।

সেলুলার জেলের পর এবার গন্তব্য করবিসিস কোভে। নীল সমুদ্রের জল, সাদা বালি আর নারকেল গাছে ছায়াঘেরা বিচ। সন্ধ্যের অন্ধকারে এবার গন্তব্য আবার সেলুলার জেলে, উদ্দেশ্য লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো। ওমপুরির মন্ত্রমুগ্ধকর কণ্ঠে সারা সেলুলার যেন আরও একবার ফিরে গিয়েছিল বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকের সেই দিনগুলোয়।

দ্বিতীয় দিন সকালে যাত্রা শুরু রস আইল্যান্ডের উদ্দেশে। পোর্টব্লেয়ারের সমুদ্রতট থেকেই দেখতে পাওয়া যায় এই

দ্বীপটিকে, ২০০৮-এর সুনামির আঘাত থেকে পোর্টব্লেয়ারকে বাঁচিয়েছিল একদা ইংরেজ সৌখিন সাহেবদের বাসস্থল এই দ্বীপটি। রস আইল্যান্ডের নীল সমুদ্র, সাদা বালি আর ইংরেজদের স্মৃতি রেখে যাওয়া ভাঙা গির্জা আর নাচঘরকে বিদায় জানিয়ে এবার আন্দামানের প্রধান আকর্ষণ নর্থ বে দ্বীপের স্কুবা ডাইভিং।

নর্থ বে-তে স্কুবা ডাইভিং ছাড়াও সমুদ্রের নিচের অধিবাসীদের সঙ্গে পরিচিতির জন্য স্নরকেলিং ও সি-ওয়াকিং-এর ব্যবস্থা আছে। আমি আর বাবা ভগবানের নাম নিয়ে নর্থ বে-র পেশাদার স্কুবা ডাইভারদের নির্দেশবাণী মাথায় রেখে জলে ঝাঁপ দিই। জীবনের এক অন্যতম স্মরণীয় অভিজ্ঞতা। হাজার হাজার রং-বেরঙের কোরাল আর মাছে সমৃদ্ধ এই সমুদ্র। কখনও ছোটো ছোটো ক্লাউন ফিশ হাত ছুঁয়ে যাচ্ছে, কখনও বা পায়ের নিচে স্ট্যাগহর্ন কোরাল। স্কুবা ডাইভিংয়ের ঠিক আগে গ্লাসবটম বোটে গাইডের শোনা কথা অনুসারে শেখা ব্রেন কোরাল, মাশরুম কোরাল বা টেবিল কোরাল এখন একেবারে চোখের সামনে।

আধঘণ্টার স্কুবা ডাইভিং শেষে সমুদ্র থেকে মাথা তুলতেই বৃষ্টি। এখানে উল্লেখ্য, পেশাদার গাইডরা স্কুবা ডাইভিং-রত ছবি তুলে দেয়জীবনের এক অবিনশ্বর স্মৃতি হিসেবে।

তৃতীয় দিন সকালে পোর্টব্লেয়ার থেকে জাহাজে রওনা হলাম হ্যাভলকের উদ্দেশে। দোদুল্যমান যাত্রার শেষে হ্যাভলক আমাদের স্বাগত জানায় তার নিজস্ব শান্ত সৌন্দর্যে। এল ডোরাডোর রিসর্টের ব্যক্তিগত সমুদ্রসৈকত পুরোপুরি আমাদেরই জন্য– একথা শুনেই মন খুশিতে ভরে ওঠে।

হ্যাভলকের সেই সমুদ্রসৈকতে ভাঁটার সময় জল সরে যায় অনেকটা– সমুদ্রগর্ভের অনেক প্রবাল বালিতে ভেসে ওঠে। হ্যাভলকের রাধানগর নামের সৈকতটি তার সুবিশাল বালিপাড় আর ভয়ঙ্কর কুমির– এই দুইয়ের জন্য বিখ্যাত।

চতুর্থ দিন সকালে নীল আইল্যান্ড। এই দ্বীপ সার্থকনামা। জলের নীল রংয়ের যে কতরকম বৈচিত্রময় আভা হতে পারে তা এখানে না এলে অজানাই থেকে যেত। ক্যানভাসে আর তুলিতে যেন কোনও শিল্পীর সৃষ্টি। এখানকার লক্ষ্মণপুর, ভরতপুর আর সীতাপুর বিচের অন্ত্যহীন বালিরেখা ধরে হেঁটে যাওয়া কিংবা লক্ষ্মণপুরের ন্যাচারাল ব্রিজের প্রাগৈতিহাসিক ভয়াবহ সৌন্দর্য সত্যিই অবর্ণনীয়।

পঞ্চম দিনে নীল থেকে আবার ফেরা পোর্টব্লেয়ারের চেনা রাস্তায়। সেদিনটা কাটালাম অল্প শপিং করে। পরের দিন কাকডাকা ভোরে রওনা জারোয়া জঙ্গল বারাটাং-এর উদ্দেশে। আমাদের ভাগ্য প্রসন্ন– জঙ্গলের রাস্তায় দেখা মিলল দুই জারোয়ার। বারাটাংয়ের শেষ প্রান্তে পৌঁছে স্পিড বোটে প্রাণ হাতে করে চললাম চুনাপাথরের গুহা দেখতে। চারপাশের ঘন জঙ্গল আর জলের সমাবেশ মনে ভয়ের সঞ্চার করতে বাধ্য।

শেষদিনটা রাখা ছিল রেড স্কিন দ্বীপের জন্য। রেড স্কিন এবং পার্শ্ববর্তী জলিবয়– এই দ্বীপ দুটি তাদের প্রবাল সমাহারের জন্য সরকারিভাবে সংরক্ষিত। এখানকার প্রবালের বৈচিত্র ও জলের স্বচ্ছতা নর্থ বে-কে খুব সহজেই হার মানায়। গ্লাসবটম বোটে বসে গাইডের সাহায্যে দেখলাম ব্রেন কোরাল, মুক্তো জন্মানো অয়স্টার, স্ট্যাগহর্ন কোরাল, সমুদ্রশশা আরও কত কি! এরপর জলে ঝাঁপ দিই স্নরকেলিংয়ের জন্য। এখানকার গাইডরা খুবই দক্ষ– তারা আমাকে সাহস জুগিয়ে সমুদ্রের গর্ভে দাঁড় করিয়ে হাতে তুলে দিয়েছিল সমুদ্র শশা। অস্ট্রেলিয়ার গ্রেট ব্যারিয়র রিফের সমকক্ষ আন্দামানের প্রবাল সমৃদ্ধ সমুদ্রগর্ভ।

ভালোলাগা, দুঃখ আর অনেক স্মৃতি নিয়ে নীল জল, প্রবাল আর সাদাবালিকে বিদায় জানিয়ে ফিরে এলাম কলকাতায়।

আরও ছবি- ছবির পাতা-২

পরিচিতি

সফল সফটওয়্যার প্রয়োগবিদ।
নেশায় ভ্রমণ ও লেখা।

লেখকদের প্রতি

'গণ্ডীছুট' পত্রিকায় ভ্রমণ সম্পর্কিত লেখা পাঠানোর আমন্ত্রণ রইল–

- এ-ফোর মাপের কাগজে এক পিঠে পরিষ্কার হস্তাক্ষরে উপযুক্ত মার্জিন এবং দুটি লাইনের মাঝে উপযুক্ত ফাঁক রেখে লেখা পাঠাবেন।
- লেখা ১২০০ থেকে ১৪০০ শব্দের মধ্যে হওয়া কাম্য।
- অনুরোধ লেখার জেরক্স বা কার্বন কপি পাঠাবেন না।
- লেখকের ঠিকানা এবং ফোন নম্বর অবশ্যই লিখবেন। ই-মেল থাকলে জানাবেন।
- লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিখবেন।
- ছবি থাকলে সিডি অথবা পত্রিকার ই-মেলে পাঠাবেন।
- ছবি ৩০০ ডিপিআই রেজুলিউশনের হতে হবে। প্রিন্ট ছবি পাঠাবেন না।
- ছবির সঙ্গে ক্যাপশান পাঠাবেন অবশ্যই।
- লেখা বা ছবি পত্রিকার ই-মেলে (অ্যাটাচ করে) বা নিচের ঠিকানায় পাঠাবেন।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা
সম্পাদক
ড. হরিসাধন দে অধিকারী
বি-৬/৮৭,
কল্যাণী, নদিয়া
পিন-৭৪১২৩৫
ই-মেল
gandichhut@gmail.com
harisadhan.deadhikari@gmail.com

ইতিহাসকে ছুঁয়ে স্মৃতির আলোকে হেমকুণ্ড সাহিব

দিবাকর দাস

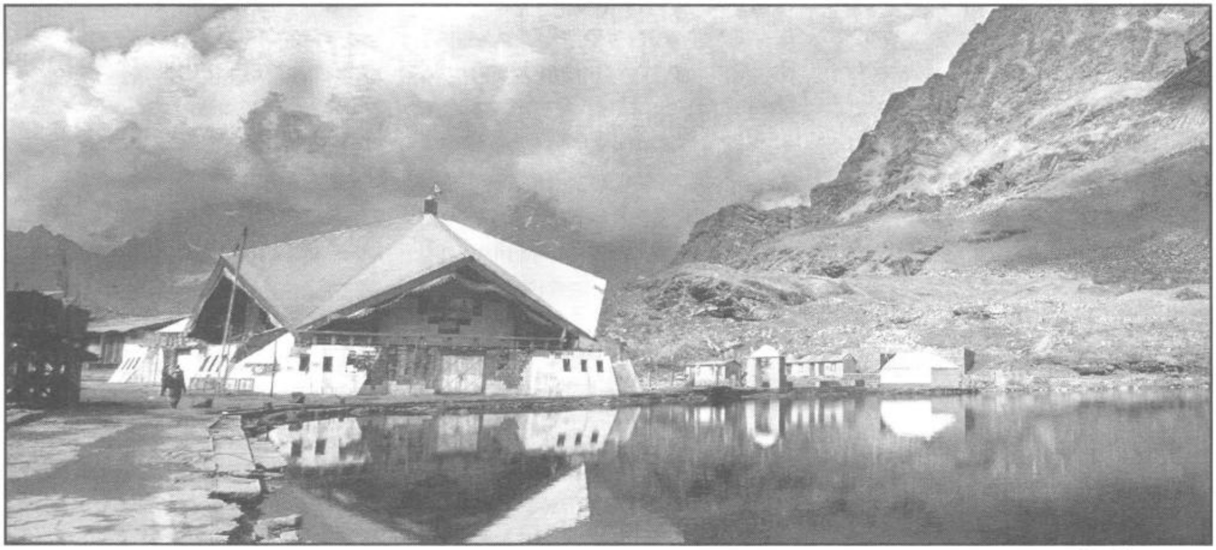

ছবি- দিবাকর দাস

২০০৬ নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ভুইন্দর খাল (খাল- গিরিবর্ত) অতিক্রম করার অভিযান বিভিন্ন সমস্যায় মাঝপথে পরিত্যক্ত করে আমরা (সংবেদনার ছয় সদস্য) যোশিমঠে। হাতের সময়টা কাটানোর জন্য চেষ্টা হল হেমকুণ্ড সাহিব ঘুরে আসার। বহু অনুনয় বিনয় করেও বন দপ্তরের অনুমতি মিলল না। ওনাদের এক কথা– যাত্রা বন্ধ হো গ্যায়া। আভি উপ্পার যানেকা অনুমতি নেহি দে সেকতা। মন চাইছে প্রবলভাবে। পথ যোগালেন তিনি। আমাদের হোটেলের পাশেই এক নেতাজীর দোকান। কথা প্রসঙ্গে ওনাকে বলতেই, উপায় হল। ঘাঙরিয়াতে ওনার এক বন্ধুর হোটেল আছে। তার ম্যানেজার থাকে পুলনা গ্রামে। ফোনে যোগাযোগ হল। ব্যবস্থা পাকা।

পরদিন সকালে খানিক ভেজা ছোলা, সামান্য শুকনো খাবার আর কিছু জামাকাপড় স্যাকে ভরে সটান রাস্তায়। সকাল ৯টার মধ্যেই উনিশ কিলোমিটার দূরের অলকানন্দা ও লক্ষ্মণ গঙ্গার সঙ্গমের গোবিন্দঘাট গুরুদ্বারে। সন্তজীরা অবাক। সেখানকার লঙ্গরে রুটি-সুজির হালুয়া দিয়ে প্রাতরাশ করে আমরা পথে নামলাম। গন্তব্য ঘাঙরিয়া বা গোবিন্দধাম। রাস্তা চোদ্দ কিলোমিটার। পথে পড়বে পুলনা গ্রাম। সেখানে খোঁজ করতে হবে ম্যানেজার দীপকজীর।

সহজ চড়াই পথের ডান পাশে পুলনা গ্রাম। লোকজন বিশেষ নেই। ঠান্ডার প্রকোপ বাড়ছে। অনেকেই যোশিমঠের আরও নীচে কোনও গ্রামে নেমে গেছে। সামান্য বিরতির পরে আমরা আবার পাথর বাঁধানো পথে। মাঝে মাঝে দু-একজন ভেড় বখরির রাখাল।

ভুইন্দর গ্রামে পৌঁছে কাউকেই চোখে পড়ল না। বাড়িগুলোর দরজায় তালা। বন্ধ দরজার পাল্লায় একটা বা দুটো কাঠের পাটা আড়াআড়ি পেরেক ঠুকে লাগানো। শীতের মরশুমে ভালুকের হাত থেকে গৃহ সামগ্রী রক্ষার প্রচেষ্টা। এখানেই এল বৃষ্টি। তবে বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না বৃষ্টি। আমরা আবার পথে।

খানিকটা হালকা চড়াই শেষে একটা লোহার ব্রিজের উপর দিয়ে পেরিয়ে এলাম লক্ষ্মণ গঙ্গা। এখানে নদীর রূপ মনভোলানো। শুরু হল চড়াই। ইংরেজি 'জেড' অক্ষরটাকে পাহাড়ের গায়ে যেন হেলান দিয়ে রাখা আছে। একটার পর একটা। চারিদিকে ভুজ গাছের রাজত্ব। এভাবে বেশ খানিকটা উঠে এলাম একটা বুগিয়ালে। বর্তমানে এর নাম কাঞ্জিলাল হেলিপ্যাড। এর পাশ দিয়ে সুন্দর বাঁধানো রাস্তা। একটা পাহাড়ি নালার উপর কালভার্ট করা। সেখানে একটা বছর ত্রিশ-পঁয়ত্রিশের ছেলে বসে। সকাল থেকে অনেকক্ষণ হাঁটছি। আকাশের অবস্থাও ভালো নয়। কাছে পৌঁছে কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই ছেলেটি বলল– 'বহুত দের লাগা দিয়া।' এবার আমাদের অবাক হওয়ার পালা। এই

সেই দীপক সিং বিস্ত। আমাদের ত্রাণকর্তা। অমায়িক। আন্তরিক। প্রকৃতি প্রেমিক। পুলনা থেকে সকাল সকাল উঠে এসেছে। হোটেল খোলা-ঘর পরিষ্কার করা– খানা বানানো– সব ব্যবস্থাই পাকা। সে আবার ইকো সোসাইটির মাতব্বরও বটে।

দীপকের সাথে ঘাঙরিয়া জনপদে চলে এলাম। ঘাঙরিয়া (উচ্চতা ৩,০৪৯ মিটার) নামকরণের উৎপত্তিও বেশ চিত্তাকর্ষক। আজ যা হেমকুণ্ড সাহিব আদিতে তার নাম ছিল লোকপাল দেবস্থান। ভোটিয়া সম্প্রদায়ের পবিত্র তীর্থস্থান। কথিত আছে, এই সরোবরে স্নান করে লক্ষ্মণমন্দিরে প্রার্থনা করলে নারীর পুত্র সন্তান লাভ হয়। এই লোকপাল তীর্থ করতে হয় এক কাপড়ে। অতীতে পুলনা গ্রাম বা ওদিকে ভুইন্দর খাল পার করে তীর্থযাত্রীরা সমাগত হত ঘাঙরিয়াতে। সেখানে রাত কাটাতো প্রার্থনা ও লোকগানে। ভোর হতেই পরনের ঘাগরা ছেড়ে ধুতি বা থান গায়ে চাপিয়ে এক বিপদসংকুল পথে উঠে আসতে হত পনেরো হাজার দুশো ফুট উচ্চতার সরোবর তীরে। ঘাগরা পরিত্যাগ করার এই জায়গা– তাই ঘাঙরিয়া। গুরুদ্বারা প্রতিষ্ঠার পরই এর নতুন নামকরণ হয় গোবিন্দধাম। বর্তমানে চার মাসের জমজমাট শহর।

গোবিন্দধাম থেকে হেমকুণ্ড পাঁচ কিলোমিটার। চড়াই পাঁচ হাজার ফুট। ফল, দমে ঘাটতি প্রতি পদক্ষেপে। রাস্তা সুন্দর বাঁধানো (হাজার খানেক ঘোড়া আর কয়েক লক্ষ মানুষের পায়ের চাপ সহ্য করে যতটা ভালো থাকা যায়)। মাঝে মাঝে রাস্তা হারিয়ে যাচ্ছে ঘন চির, পাইন, ভুজ ও রডোডেনড্রন গাছের আড়ালে। পথ যত এগোল গাছেরাও উচ্চতা হারাতে লাগল। শুরু হল ঘাস, পাথর আর ছপ ছপে জলা পাথুরে রাস্তা। সঙ্গের খাবার জল শেষ। বাঁহাতে নেমে আসা লক্ষ্মণ গঙ্গা নালা থেকেই বোতল ভরে নেওয়া হল। প্রায় সাড়ে চোদ্দহাজার ফিট উঠে এসেছি। শুরু হল সিঁড়ি (১,১৭৫টি)। একদিকে পথ পাহাড় বেয়ে উঠে গেছে আকাশে। অন্যদিকের আকাশটা মেঘ আর তুষারাবৃত শৃঙ্গ বুকে নিয়ে ডাকছে।

তোল– ছবি তোল। একটু দাঁড়া। গেলেই হল। এক্ষুনি নয় তো একটু বাদে। এগুলো অনেকটাই স্লথ গতির অজুহাত। আসল কারণ দমের ঘাটতি শেষ মুহূর্তের চড়াই ও বাঁক না পেরলে হেমকুণ্ডের দেখা পাওয়া যায় না।

অনেকেই জানেন, তবু একবার উল্লেখ করি এর ইতিহাস। দশম শিখগুরু গোবিন্দ সিং তাঁর লেখায় (বিচিত্র নাটক) এক লোকমুখে প্রচারিত সত্যযুগের গল্প পুনঃনির্মাণ করেন। সেই গল্পের নায়ক দুষ্টদমন এই সরোবরের তীরে সাধনা করে দেবত্ব লাভ করেন। কিন্তু তাতে তার মর্তবাসী বাবা-মা বড়োই অসন্তুষ্ট। ঈশ্বরবাসী পুত্রকে তারা ফিরে চান মর্তে। ঈশ্বরের ইচ্ছা থাকলেও দুষ্টদমন মোটেই রাজি না। তখন ঈশ্বর বলেন, কলিযুগে ধর্মপ্রতিষ্ঠার জন্য দুষ্টদমনের জন্ম হবে ধরাধামে। তিনিই দশম শিখগুরু গোবিন্দ সিংজী। এই ঘটনা গ্রন্থসাহিবের অন্তর্ভুক্ত হয় ১৭৩০ খ্রিস্টাব্দে। একে বিশদে ব্যাখ্যা করেন ভাই সন্তোষ সিং (১৭৮৭-১৮৪৩)। ঊনবিংশ শতকের শুরুতে পণ্ডিত তারা সিং নরোত্তম আবার অন্য উপাখ্যান সামনে আনেন। মহাভারতের সূত্র উল্লেখ করে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, রাজা পাণ্ডু এখানে ধ্যান করেন। প্রচলিত লোককথায় রামচন্দ্রের ভাই লক্ষ্মণ এখানে সাধনা করেন। শক্তিশেলে আহত লক্ষ্মণকে এখানে এনে শুশ্রূষা করা হয়। লক্ষ্মণ সুস্থ হয়ে উঠলে দেবতারা যে পুষ্প বৃষ্টি করেন তার থেকেই সৃষ্টি ফুলো কি ঘাঁটি।

তবে ভাষ্য অনুযায়ী নরোত্তমজীই প্রথম শিখ পণ্ডিত যিনি হেমকুণ্ডে আসেন। এঁনার বিবরণ পড়ে কবি-ইতিহাসবিদ ভাই বীর সিংও আসেন। কিন্তু কেন জানি না, এদের বিবরণ শিখ সমাজে স্বীকৃতি পায়নি। তবে বীর সিং-এর বিবরণে আকৃষ্ট হয়ে সেনাবাহিনীর এক অবসরপ্রাপ্ত গ্রন্থি সন্ত সোহন সিং উৎসাহিত হন জায়গাটাকে দেখার জন্য। সমস্যাটা ছিল কেউ-ই ঠিক ঠাক রাস্তার হদিস দেননি। হয়তো ভাই বীর সিং-ও সশরীরে এখানে আসেননি। তা না হলে তিনি কেন সন্ত সোহন সিংকে এত প্রশ্ন/সন্দেহ করছিলেন। সোহন সিং তো ওনার কাছ থেকেই রাস্তার হদিশ পেতে পারতেন। অথবা সেই সময়ের রচিত সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিশদে না বলাই হয়তো ছিল স্বাভাবিক। সোহন সিং এলাকাটা সম্বন্ধে ঠিকই আন্দাজ করেছিলেন কারণ হাতের কাছেই পাণ্ডুবর্ধন জনপদ। খোঁজ করতে করতে সাধারণ তীর্থযাত্রীদের কাছে তিনি লোকপাল নামে এই জায়গার সন্ধান পান। ১৯৩৪-এ বাবা কার্তার সিং বেদীকে সাথে করে তিনি এখানে আসেন। বার কয়েক যাওয়া আসা করার পর ওনার মনে সরোবরের তীরে গুরু গ্রন্থ সাহিব স্থাপনের বাসনা জাগে। অবশ্য এও শোনা যায় সোহন সিংকে প্রথম লোকপাল নিয়ে গেছিলেন একদন ভোটিয়া মহিলা। তাঁরা বদ্রীনাথ থেকে বোধহয় বর্তমানের কুন্টখাল অতিক্রম করে "ফুঁলো কি ঘাঁটি" হয়ে যাচ্ছিলেন সেখানে। কেউ কেউ আবার বলেন তিনি একাই ওই বন্ধুর পথ আরোহণ করেছিলেন।

মজাটা এরপরই। প্রথমে অমৃতসর শিখ গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটি এই খোঁজকে ধর্তব্যের মধ্যেই আনেনি। পাত্তা না পেয়ে সোহন সিং ১৯৩৪-এর শীতেই দেখা করেন অমৃতসরে ভাই বীর সিং-এর সাথে। এনার কথা আগেই উল্লেখ করেছি। প্রাথমিক দ্বিধা কাটিয়ে তিনিই প্রথম একুশ হাজার টাকা সাহায্য করেন। তাই নিয়ে সোহন সিং এলেন মুসৌরী। বাড়ি তৈরির সরঞ্জাম কিনতে হবে। লক্ষ্য দশ ফুট বাই দশ ফুটের একটা ঘর বানানো। সেখানে তার সাথে আলাপ হয় মিলিটারি সার্ভে বিভাগের হাবিলদার মদন সিংজীর। দুজনে পাণ্ডুকেশ্বরে এসে উপযুক্ত অনুমতি ও লোক লস্কর জোগাড় করেন। ১৯৩৬-এ ঘর তৈরি হয়। সেই বছরই চাকরি থেকে অবসর পান মদন সিং আর বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেন এই হেমকুণ্ডে। হিন্দু লোকপাল মন্দির প্রথম এই দানেই সংস্কার হয়েছিল। বর্তমান রূপটি ১৯৮৮ সালে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অবদান। ১৯৩৭-এ গ্রন্থ সাহিবের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯৩৯-এ সোহন সিং দেহ রাখেন। এর এগারো বছর পর ১৯৫১-তে খালসা প্রধান হরিদ্বার থেকে

গোবিন্দধাম পর্যন্ত তীর্থযাত্রীদের সুবিধার্থে জায়গায় জায়গায় গুরুদ্বার বানানোর আদেশ দেন। ১৯৬০-এ হেমকুণ্ডে আসেন মাতা রাম কাউর। এক নিতান্ত সাধারণ গৃহবধূ। কিন্তু ওঁনার স্বপ্ন ও প্রচেষ্টায় শিখ সমাজ সরোবরের তীরে এক মহান স্থাপত্যের পরিকল্পনা করে। তৈরি হয় সাত সদস্যের 'হেমকুন্ট সাহিব ম্যানেজমেন্ট ট্রাস্ট'। সেটা ১৯৬৪-র কথা। একমেব অদ্বিতীয় এই উপাসনা গৃহ পাঁচ কোণ বিশিষ্ট। পাঁচ দ্বার পঞ্চ ইন্দ্রিয়, চারদিক ও উর্ধ্ব এবং পঞ্চভূতের প্রতিভূ। যে কোনও মত ও ধর্মের অবাধ প্রবেশের জন্য এর পাঁচটি দরজাই সবসময় খোলা। পৃথিবীর একমাত্র গুরুদ্বার যার সাথে শিখ স্থাপত্যের কোনও বাহ্যিক অনুকরণ নেই। সরল, জ্যামিতিক, নিরাভরণ! ছাদ টিনের। ঢাল এমন যাতে প্রচণ্ড বরফ পড়লেও ছাদের কোনও ক্ষতি হবে না। তবে পরিকল্পনা মাফিক কাজ শুরু হতে আরও চার বছর গড়াল।

প্রথম সমস্যা এত বড়ো বিল্ডিং-এর নির্মাণ সামগ্রী কীভাবে দশ হাজার ফুট উঁচুতে তোলা হবে। বহু জায়গার রাস্তার বাঁক মাত্র আট ফুট। অনেক ইঞ্জিনিয়ারিং উদ্ভাবনের পর সে সমস্যা মিটলেও দেখা গেল ওই উচ্চতায় অতদিন ধরে কাজ করা বাস্তবেই অসম্ভব। তখন দিল্লির রাকাবকুঞ্জ গুরুদ্বারার মাঠে বর্তমান গুরুদ্বারার মূল কাঠামো ও ছাদ ছোটো ছোটো ইস্পাতের টুকরো জুড়ে তৈরি করা হয়। এরপর হিসাব করে নাম্বার মার্ক দিয়ে সেই কাঠামো খুলে একটি একটি করে নিয়ে যাওয়া হয় হেমকুণ্ডে। কাজ শেষ হতে ১৯৯৩। আর গুরু গ্রন্থসাহিব পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয় ১৯৯৪ সালে।

এ হেন ইতিহাসের গেট আর মাত্র হাত কয়েক দূরে। শিরধ্বজা দেখা যাচ্ছে। সিঁড়ি ছেড়ে আমরা ধরলাম বাঁধানো চড়াই পথ। কিছুটা স্বস্তি। হাওয়ার দাপট বোঝা যাচ্ছে আওয়াজে। আমরা পাহাড়ি ঢালের আড়ালে। আমরা ছয় বন্ধু ছাড়া কেউ কোথাও নেই। পাহাড়ে চলার পথে এমনতো কতই হয়েছে। পাসের মাথায় আমরাই পূজারী, আমরাই ভক্ত। সে তো দেবতাদের যাওয়া আসার পথ। আর এতো তাদের স্নানের সরোবর। সবাই একসাথেই প্রবেশ করলাম স্বর্গ সরোবরের উদ্যানে। গুরুদ্বারার রক্ষক, পথ পাশের দোকানি সবাই নিচে নেমে গেছে। সব বন্ধ। প্রবেশ পথের বাঁহাতে বিশাল গুরুদ্বারা। সামনে বিস্তীর্ণ সরোবর। তাকে ঘিরে সপ্তশৃঙ্গরাজি। প্রত্যেক শৃঙ্গের মাথায় গুরুজীর নিশান (সেও কিছু কম বড়ো নয়)। পাহাড়ের ঢাল গতরাতের বরফ-বারিতে প্রায় সফেদ। চাতালে ছাদ থেকে গড়িয়ে পড়েছে বরফের স্তূপ। কিছুটা এগোতেই সরোবরের ধার ঘেঁসে লোকপাল লক্ষ্মণের মন্দির। প্রবাদ এই লক্ষ্মণকে নিয়েই। নীল আকাশের তলায় সরোবরের জলে পাহাড়ের প্রতিবিম্ব। আড়ম্বরহীন ব্যাপ্তি। ঘণ্টা খানেক সরোবরের আশপাশে ঘুরে আমরা তৃপ্ত। নাই বা হল ভিতরে ঢোকা কিন্তু আমরা তো সেই পরিবেশ সেই উৎকণ্ঠার সাক্ষী, যার স্বাদ নিশ্চয়ই পেয়েছিলেন সন্ত সোহন সিং...

সাল অনুসারে যাত্রীসংখ্যার পরিসংখ্যান—

১৯৭৭-৫১৬ জন
১৯৮০-৬,০৫০ জন
১৯৯০-১,৮৯,৩৪০ জন
২০১৫-৪,৫০,০০০ জন

বর্তমান তথ্য বিশ্লেষকরা জানাচ্ছেন, হেমকুণ্ড যাত্রীদের শতকরা পঞ্চাশ শতাংশই উচ্চপর্বত জনিত (হাই অল্টিটুড সিকনেস) অসুবিধায় ভোগেন। তাদের জন্য চিকিৎসা পরিষেবা সামান্য বা নেই বলা চলে। ভাবনা হয় এত চাপ পাহাড় ও তার বাস্তুতন্ত্র সহ্য করতে পারবে তো?

পরিচিতি

চাকুরিজীবী। ভ্রমণ আর ফোটোগ্রাফিতে অসীম আগ্রহ। লেখালেখি বিরামহীন। চিত্রশিল্পী হিসেবেও খ্যাতি আছে। 'পলাশ কথা' পত্রিকার সম্পাদক।

ঘুড়ি ৮

প্রসঙ্গ ভ্রমণ

বাঙালির মধ্যে প্রথম সার্থক ভারত পর্যটক সম্ভবত চৈতন্যদেব। বস্তুত তাঁর ভ্রমণ বিবরণ দিয়েই বাংলা সাহিত্যে অসচেতন ভ্রমণ সাহিত্যের উদ্ভব— একথা বলা সম্ভবত অত্যুক্তি হবে না।

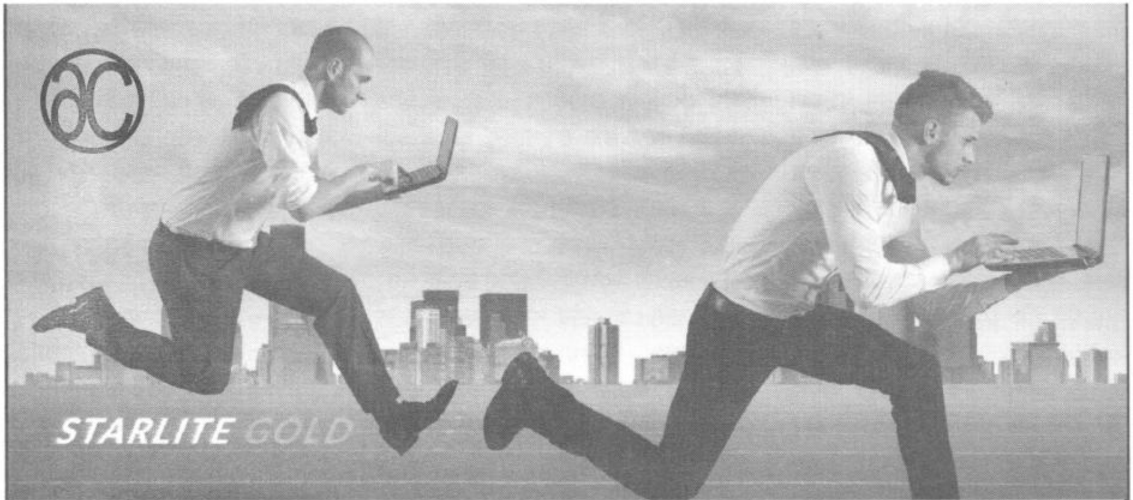

STARLITE
FAST FORWARD

ANJANEYA COMTECH PVT. LTD.

Authorized Dealer of Office Automation Products from
SHARP, BENQ, NEC, PANASONIC,
CANON, HP, DELL, LENEVO

1, Gibson Lane, Room No. 201, Kolkata-700 069
Ph. : +91 33 2231 7617 Fax : +91 33 2231 7618
Mobile : +91 9748753070 / 9007730278
e-mail : anjaneya.comtech@gmail.com
website: www.starlitememory.in

বিস্মৃত ইতিহাসের পথ বেয়ে

প্রদীপ্ত ভট্টাচার্য্য

রোগাটে ঘোড়াটা হাঁপিয়ে উঠেছে, পাথুরে পাহাড় চড়তে কার না কষ্ট হয়। ঘোড়া থেকে নেমে গাছের ছায়ায় বসে ছোকরা সাহেব। আরও চারটে-পাঁচটা মালবাহী খচ্চর নিয়ে জনা দশেক অনুচরও আশেপাশে জিরিয়ে নিতে বসে, সাহেবমনিবকে লুকিয়ে চুট্টা জ্বালায় কেউ কেউ। পথ তো কম আসা হল না, দিন পনেরো আগে জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রখর দাবদাহ মাথায় নিয়ে কলকাতা ছেড়ে বেরিয়েছে ওরা। দিনমানে দিনমণির অসহ্য তাপ এড়াতে রাত্তির-ভর পথ চলেছিল ওরা। গাছের ছায়ায় বসে সাহেব তার নোটবই খোলে, গভর্নর সায়েব পই পই করে বলে দিয়েছেন, যাত্রাপথের খুঁটিনাটি সমস্ত বিবরণ টাটকা টাটকা লিখে রাখতে। মন্বন্তরপীড়িত সমতলভূমি পিছনে ফেলে তরাইয়ের ঘাসবন, নাবাল জমি, পাখি-ডাকা শালজাতীয় মহীরূহের বন টপকে সবে পাহাড় ভাঙা শুরু হয়েছে, এখানে আপাতত শুধু অবিশ্রান্ত ঝিঁঝির ডাক। মেঘ-কুয়াশার বন, আকাশে উঁচু মাথা তুলে দাঁড়িয়ে শাল, ধুপি, ওক, বার্চ গাছের দল। এখানে নানান ধরনের অজস্র প্রজাপতির ঝাঁক তিরতির করে উড়ে বেড়ায়, ওদের কোনও শব্দ নেই, শুধু মনমাতানো রং আছে। গাছের শীতল ছায়ায় শরীর জুড়োয় সাহেবের, নোটবই কোলেই পড়ে থাকে, পাহাড়ি কুয়াশার মতো ঘুম নেমে আসে তার দু-চোখে। ঘুমের ঘোরে সে দেখে, শেয়ালের ডাক আর শকুনের কান্নার মধ্যে পথ দিয়ে হেঁটে চলেছে সারি সারি মানুষ, মেয়ে পুরুষ বাচ্চা বুড়ো জোয়ান, তাদের মানুষ বলে চেনাই দায়, সবাই হাড়-পাঁজরা বেরিয়ে আসা কঙ্কালসার– কোথায় চলেছে তারা কেউ জানে না... চলতে চলতে কেউ কেউ মাটিতে পড়ে যাচ্ছে, আর উঠছে না... 'Dire scenes of horror! which no pen can trace'... ধড়মড়িয়ে চটকা ভেঙে জেগে ওঠে সাহেব।

* * *

রাজাভাতখাওয়া চেকপোস্ট, আলিপুরদুয়ার স্টেশন থেকে ১৬ কিলোমিটার। আর রাজাভাতখাওয়া স্টেশনে নামতে পারলে তো (মুশকিল যে, কাঞ্চনকন্যা, উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস কেউ থামে না) কথাই নেই। সিঙ্গল লাইনটি টপকে এধারে চলে এলেই বক্সা টাইগার রিজার্ভের প্রবেশদ্বার, টিকিট কাউন্টার আর পরিমলদার চায়ের দোকান। নামেই টাইগার রিজার্ভ, আজ আর ওই জঙ্গলে একটিও বাঘ বেঁচে নেই! বক্সা চেকপোস্ট থেকে শিবমন্দির ওয়াচটাওয়ার ৪-৫ কিলোমিটার। শিবের থান বড় কথা নয়, এখানে অজস্র রংবেরঙের প্রজাপতি। গোবর, পশুপাখীর বিষ্ঠা আর বৃষ্টির পরে কাদা থেকে নুন চাটে প্রজাপতিরা (Mud-puddling)। ওদের দেখতে আধ ঘণ্টার জন্য না থামাটা অপরাধ হবে, যদিও এখানে ফরেস্টের অন্দরে সাধারণের প্রবেশাধিকার নেই। বক্সা টাইগার রিজার্ভের প্রবেশদ্বার থেকে জয়ন্তী মোড় পেরিয়ে সান্তালাবাড়ি মোটমাট ১৫ কিলোমিটার। পথে পড়বে ছবির মতো দুটি গাঁ, ২৮ মাইল আর ২৯ মাইল। হিসেবটা কোচবিহার থেকে মাইলের হিসেবে, সে আমলের রাজারাজড়াদের। মূলত নেপালি, মেচ, ভুটিয়া, ডুকপা (মূল কথাটা দ্রুগপা, তিব্বতে শিকড় এদের। উত্তরবঙ্গ ছাড়াও নেপাল, ভুটান, সিকিমে ছড়িয়ে আছে এরা। বাংলায় মানে করলে দ্রুগপা শব্দের কাছাকাছি হবে 'ড্রাগন-পুত্র') উপজাতির বাস সান্তালাবাড়িতে। সান্তালাবাড়ি থেকে হাঁটা শুরু, বাজে খরচ করতে চাইলে আরও শ দুয়েক টাকা দিয়ে আরও দুই কিলোমিটার মত গাড়ি চাপা যায়। তারপর হাঁটতেই হবে বক্সা রেঞ্জের ভিতর খাড়াই পথে (খাড়া হলেও সহজ)। মাঝে মাঝেই জিরেনছাউনি। দেখতে দেখতে বক্সা গ্রাম; হোটেল, হোমস্টে গোছের দু-একটা ব্যাপার আছে, চা পাওয়া যেতেই পারে। তারপর আরেক টানে ছোট্ট কাঠের পুল পেরিয়েই বক্সা ফোর্ট (২,৮০০ ফুট)। এই কেল্লা আদতে কে স্থাপন করেন তা আর জানা যায় না, যেটুকু জানা যায় তা হল এই যে, ভুটানরাজা ভুটানের মধ্যে দিয়ে তিব্বত যাওয়ার প্রাচীন রেশম পথের পাহারায় কাঠ আর বাঁশের তৈরি এই আস্তানাটি ব্যবহার করতেন। পরবর্তী কালে কুচবিহারের রাজা এটিকে ব্রিটিশের হাতে নজরানা হিসেবে সমর্পন করেন (সিঞ্চুলা চুক্তি, ১৮৬৫)। ব্রিটিশ এটির খোলনলচে বদলে কাঠ-বাঁশের বদলে দুর্ভেদ্য পাথরের দেওয়াল তৈরি করে আর জেলখানা হিসেবে ব্যবহার করা শুরু করে। সে কালে আন্দামানের সেলুলার জেলের মতোই কুখ্যাতি ছিল এই বক্সা ফোর্ট জেলখানার। প্রাকৃতিক অবস্থানজনিত কারণেই কয়েদীদের এখান থেকে পালানো ছিল একরকম অসম্ভব। ১৯৩০-এর দশকে অনুশীলন সমিতি বা যুগান্তর গোষ্ঠীর বহু বিপ্লবী এখানে বন্দী ছিলেন, যেমন কৃষ্ণপদ চক্রবর্তী। শুনেছি পঞ্চাশের দশকে কমিউনিস্ট কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়কেও কিছুকাল এখানে বন্দীদশা ভোগ করতে হয়েছিল।

* * *

পলাশীর (১৭৫৭) পরে মীরজাফর মসনদে বসেছিলেন, তা অবশ্য বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। মাঝে কিছুদিন মীরকাশেম এবং তারপর আবার মীরজাফর, শেষে মীরজাফরের মৃত্যুর (১৭৬৫) পরে তাঁর এক অপোগণ্ড পুত্তুর নাজমুদ্দৌলাকে পুতুলনবাব বানিয়ে বকলমে শাসন চালাতো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। ইতোমধ্যে বক্সারের যুদ্ধ (১৭৬৪) আর তার ফলশ্রুতি হিসেবে ১৬ আগস্ট ১৭৬৫-তে ঠুঁটো জগন্নাথ মুঘলসম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের হাত থেকে কোম্পানির

তরফে রবার্ট ক্লাইভ বার্ষিক মাত্র ২৬ লক্ষ টাকার বিনিময়ে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানি সনদ লাভ করেন। ক্লাইভের মতো স্রেফ ভাগ্যান্বেষণে সুদূর ইংল্যান্ড থেকে আসা স্বল্পশিক্ষিত কিন্তু ঘোর উচ্চাকাঙ্ক্ষী, খল ও ধূর্ত কেউ শাসনব্যবস্থার মাথায় বসলে যা হওয়ার কথা, বাংলা জুড়ে তখন লুঠতরাজ, নৈরাজ্য আর ডামাডোলের চূড়ান্ত। তার উপরে ভয়ানক খরায় ফসল-জ্বলে-যাওয়া ক্ষুধার্ত বাংলায় ক্লাইভের কোম্পানি ভূমিরাজস্ব বাড়িয়ে দিল ছয়গুণ (১৭৭১)। বাংলা তখন কালান্তক মন্বন্তরের কবলে, কোম্পানির অর্থগৃধ্নুতা তাকে এনে দাঁড় করালো নিশ্চিত অনাহার মৃত্যুর যমদুয়ারে। ১৭৬৯ থেকে ১৭৭৩, এই তিন-চার বছরে তাতে মরবে এক কোটি মানুষ, যা সেই সময়কার বাংলার জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ। খিদের জ্বালায় মানুষ পশুর মতো ঘাস, গাছের পাতা ছিঁড়ে খাবে, ঠুকরে খাবে মৃত জন্তু-জানোয়ার, এমনকি মৃত মানুষের দেহাংশ। এরই মধ্যে (১৭৭০) ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাইটারের চাকরি নিয়ে মোকাম কলকাতায় পা রাখেন উদ্যমী ইংরেজ তরুণ জর্জ বোগল। মানব-ইতিহাসের সম্ভবত ভয়ঙ্করতম এই মন্বন্তরে কলকাতার রাজপথে প্রতিদিন দেড়শো-দুশো মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেন বোগল, যেগুলো সৎকার না করেই স্রেফ নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া হত। যাই হোক, ইতিহাসের এই মর্মান্তিক ও চিরস্থায়ী ক্ষত পাশ কাটিয়ে আমরা ফিরে যাব তরুণ জর্জ বোগলের বিস্মৃত-প্রায় কাহিনীতে। ১৭৭২-এ বাংলার গভর্নর জেনারেল হয়ে এলেন ওয়ারেন হেস্টিংস, এসেই শক্ত হাতে ধরলেন শাসনব্যবস্থার রাশ। কর্মঠ তরুণ বোগলের কর্মপটুত্ব হেস্টিংসের নজর এড়ালো না, তিনি বোগলের পদোন্নতি ঘটিয়ে নিয়ে এলেন তাঁর বোর্ড অফ রেভিনিউ-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি করে। সব আঁধারই সয়ে যায়, সব কালোই ফিকে হয়ে আসে। মন্বন্তরের শ্মশানচিতাভস্ম মাখা বাংলাতেও ধীরে ধীরে জীবনের স্পন্দন ফিরে আসতে লাগল, হেস্টিংস মনোনিবেশ করলেন কোম্পানির ব্যবসাবাণিজ্য সম্প্রসারণে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধ (১৬৪৮) থেকেই পার্ল নদীর তীরে ক্যান্টন (গুয়াংঝাউ) বন্দর দিয়ে চিনের সঙ্গে বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির, মূলত রুপোর বিনিময়ে আমদানি করা হত সিল্ক, চা আর পোর্সেলিন। কিন্তু চিনের মূল ভূখণ্ডে প্রবেশাধিকার ছিল না ভিনদেশী বণিকের, নদীর পাড়ে উঁচু পাঁচিলের এধারে কেনাবেচা সারা হত। এদিকে তিব্বতের (ভারতে 'তিব্বত' শব্দটির চল ছিল না, বলা হত 'ভোট' বা 'ভোটিয়া'-দেশ। 'তিব্বত' বা Tibet কথাটা ইউরোপীয়রা সম্ভবত পারস্য থেকে নিয়েছিল) সঙ্গে সাবেক ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক আরও প্রাচীন। লাদাখের রেশম পথ ছাড়াও উত্তরবঙ্গ দিয়ে ভুটান, সিকিম ও পূর্ব নেপালের মধ্যে দিয়ে বেশ কয়েকটি পথে বাণিজ্য চলতো। তিব্বতীরা আনতেন চিনা সিল্ক, পশম, চমরির লেজের চামর, ভেড়া, মৃগনাভি, কাগজ ইত্যাদি। এদিকের এঁরা বিনিময়ে দিতেন সুতির কাপড়, কাচের সামগ্রী, মুক্তো, প্রবাল, মশলা, কর্পূর, পান ইত্যাদি। প্রাকৃতিক দুর্গমতার কারণেই তিব্বত ছিল এক সম্পূর্ণ অজানা ভূখণ্ড। চতুর হেস্টিংস দ্রুত বুঝে গেলেন, তিব্বতকে চিনে উঠতে না পারলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চিন সহ পূর্ব এশিয়ায় বাণিজ্য বিস্তার অসম্ভব। হেস্টিংস বেছে নিলেন আঠাশ বছরের যুবক জর্জ বোগলকে। বোগলকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দূত করে তিব্বতে পাঞ্চেন লামার কাছে পাঠালেন গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস, উদ্দেশ্য তিব্বতের সঙ্গে কোম্পানির বাণিজ্য সম্পর্ক বিস্তার। আর তলে তলে উদ্দেশ্য, অজানা এই ভূখণ্ডের হালহকিকৎ, নাড়িনক্ষত্রের হদিশ নেওয়া; সে দেশের ভূ-প্রকৃতি, আবহাওয়া, প্রাকৃতিক ও জৈবসম্পদ (জিনসেং জাতীয় ও অন্যান্য ভেষজ), মানুষ, রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, শাসনব্যবস্থা, পথঘাট ও ব্যবসা-বাণিজ্যের খুঁটিনাটি তথ্য সংগ্রহ, যা পরবর্তীকালে তিব্বতে ব্রিটিশ সেনা-অভিযান (১৯০৩ সালে ফ্রান্সিস ইয়ংহাজব্যান্ডের নেতৃত্বে তিব্বতে ব্রিটিশ সামরিক অভিযান হয়। পেশীশক্তির চাপে নিষিদ্ধ দেশটির খোলস ভেঙে তাকে বিশ্বমানচিত্রে সামিল করা হয়) করতে গুরুত্বপূর্ণ সামরিক তথ্য হিসেবে কাজে আসবে। গভর্নর হেস্টিংস তাই বোগলকে নির্দেশ দিয়েছিলেন একটি ছোট নোটবই সঙ্গে রাখতে, আর তাতে টাটকা টাটকা টুকে নিতে তার সফরের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা।

* * *

বক্সা ফোর্টের প্রবেশপথে বাহারি টাইলে-বাঁধানো দু'টি স্তম্ভে বেশ যত্ন করেই উৎকীর্ণ আছে রবীন্দ্রজন্মদিনে কয়েদীদের কবিকে লেখা পত্র ও রবিঠাকুরের কবিতায় তার উত্তর। চিঠি দু'টির তারিখ দেখে ভারি আশ্চর্য হলাম। রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্সাবন্দীরা পত্র দেন ৫ মে ১৯৩১, আর কবিগুরুর প্রত্যুত্তর আসে ২ জুন। বক্সা ডাকঘর সেই ১৯৩১ সালে এত সক্রিয় ছিল! তাহলে তো বক্সা পোস্টঅফিসটা একবার দর্শন করতেই হয়। কিন্তু টিম লিডার পার্থ বললেন, এ পিঠে নয়, ফেরবার সময়, এখন চড়তে থাকুন, আকাশের গতিক সুবিধের বুঝছি না, বিকেল পড়ে আসবার আগেই লেপচাখা পৌঁছাতে হবে। বক্সা ফোর্টকে ডাইনে রেখে আবার পাহাড় চড়তে থাকি। আচ্ছা, এই তো সেই ধুলো-পড়া বিস্মৃত অতীতের পথ, এই পথেই তো আড়াই শতাব্দী আগে সেই রোগাটে কিন্তু নির্ভরযোগ্য একটি ঘোড়ার পিঠে বক্সাদুয়ার পাহাড় টপকে নিষিদ্ধ তিব্বত অভিযানে গিয়েছিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রেভিনিউ-সেক্রেটারি জর্জ বোগল! সালটা ছিল ১৭৭৪, আর কি আশ্চর্য, আড়াইশো বছর আগে এবারের মতই সে-ও ছিল এক জুন মাস! মে মাসে কলকাতা থেকে যাত্রা করে বোগল কুচবিহার পৌঁছান জুনের প্রথম সপ্তাহে। তরাইয়ের ভ্যাপসা গরম পেরিয়ে বক্সাদুয়ারের মাথার উপর ঝুলে থাকা পিচাকোনাম পাহাড়ের পথে ভুটানে পা রাখেন জর্জ বোগল, সেদিনটা ছিল জুনের ৯ তারিখ। মেঘেদের ওড়নায় মাথা ঢেকে দাঁড়িয়ে থাকা সেই সুউচ্চ পর্বতশ্রেণীর পথে এক জায়গায় জিরোতে থেমে হঠাৎ পিছন পানে নজর ঘোরান বোগল, হয়তো বা পেরিয়ে আসা দীর্ঘ পথের স্মৃতিতেই। বোগল লিখেছেন, কি অপরিসীম বৈপরীত্য দু'দিকের দৃশ্যে— সামনে গগনভেদী হিমালয়, আর নীচে যতদূর চোখ যায় দিগন্তবিস্তৃত 'প্লেইনস অফ বেঙ্গল';

দৃষ্টিপথে কোত্থাও কোনও প্রতিবন্ধকতা নেই, নিবিড় অরণ্যানী আর ফসলের ক্ষেত, অথবা অপার সবুজের মখমলী বিস্তারের মাঝে রূপোলী জরির কাজের মতো নদীর বালুতট।

চারিদিকে আরও ঘন হয়ে আসে আদিম বন। মাঝামাঝি উঠে দম নেবার গ্রাম খাতলিং। গাঁয়ে ভুট্টা আর এলাচের ক্ষেত, আলুবোখরার গাছ এই জুনে ফলবতী। পাখীর কূজনমুখরিত ক্রান্তীয় অরণ্য ছেড়ে ধীরে ধীরে ঢুকে পড়ছি পাহাড়ি বাঁশ, শাল, সিলভার ওক, বার্চ আর মেঘকুয়াশার রাজ্যে যেখানকার আদিম নিস্তব্ধতা ঝরনা আর অন্তহীন ঝিঁঝির কলতানে একটুও বিরক্ত হয় না। বক্সা ফোর্ট থেকে খুব বেশি হলে আর মাত্র দুই কি আড়াই কিলোমিটার, চড়াইয়ে হাঁফ ধরায় দূরত্বটা যেন মনে হয় আরও কিছু বেশি, এসে পৌঁছনো গেল লেপচাখা। উচ্চতা সামান্য, ৩,০০০ ফুটের মতো। গহন ঢেউ-খেলানো পর্বতরাজির মাঝে একটা ছোটখাট চিল্ড্রেন্স পার্কের মতো সমতল লন পাওয়া গিয়েছে, যেন খাড়া পাহাড়ে হঠাৎ একটা তাক। সেখানে বাহুল্যবর্জিত ছিমছাম দু'টি কুটির, প্রতিটির ফুট-আটেক উঁচু কাঠের দোতলায় দুটো তিনটে করে ঘর, সামনে রেলিং-দেওয়া ঘোরানো ব্যালকনি। গাঁয়ের মানুষ হোমস্টে হিসেবে চালায়, যদিও নীচে আলিপুরদুয়ার বা কুচবিহারে মধ্যস্বত্বভোগী কমিশন-এজেন্ট আছেন। দু'টি কুটিরের একটিতে আমাদের তিনদিনের আস্তানা আগে থেকে ঠিক করে রাখা ছিল, যদিও পৌঁছে দেখলাম জুনের এই প্রথমার্ধে লেপচাখায় পর্যটক তেমন নেই (পরের দিন দু-তিনজন এসেছিল, বিকেলে পৌঁছে এক রাত্তির থেকেই দুদ্দাড় নেমে গেল তারা, জোঁকের ভয়েই বোধহয়। পাহাড়ে বর্ষা নেমে গিয়েছে দিন সাতেক আগেই)। ঘরে স্যাক নামিয়ে ঘর্মাক্ত জামা ছেড়ে খোলা চত্বরটির কিনারায় শেষ বিকেলের পড়ন্ত রোদে খালি গায়ে এসে দাঁড়াই আমরা ক'জন। সামনে নীচে ডাইনে বাঁয়ে অবাধ ডুয়ার্সের বৃষ্টিবন সমতল, বাঁয়ে জয়ন্তী নদীর চলন থেকে শুরু করে মশানি খোলা, বালা নদীর জিগজ্যাগ বিভঙ্গ এবং একেবার ডাইনে বক্সা খোলা– প্রায় তিরিশ কিলোমিটার বিস্তৃত একটি চোখ-জুড়ানো সবুজ মখমলের চাদর, যার মাঝে মাঝে মেঘরোদ্দুরের মায়াবীপনায় সবুজের নানান বর্ণান্তর দেখা যাচ্ছে। কোথায় গাঢ় কালচে সবুজ, কোথাও বা হালকা, কোথায় বা ঈষৎ হলদেঘেঁষা সবুজ। জানা আছে, জর্জ বোগলও বক্সাপাহাড়ের মাথায় উঠে ফিরে তাকিয়েছিলেন। ভূপৃষ্ঠের এমন বৈপরীত্য যে স্তম্ভিত না হয়ে পারেননি। নীচে দক্ষিণে বিস্তৃত বনাবৃত সমভূমির উপর দিয়ে দৃষ্টি চলে যায় বৃত্তাকার দিকচক্রবাল অবধি, কোথাও কোনও প্রতিবন্ধকতা নেই। কোনও উঁচুনীচু টিলা, মিনার বা শৃঙ্গ নেই, যতদূর চোখ যায় শুধু পরিব্যাপ্ত সমতলভূমি; বনাচ্ছাদিত কিংবা ফসলের ক্ষেত, গোচারণভূমি, বালুময় নদীখাতরেখা, পুতুলঘরের মতো গ্রাম থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে। আর সামনে, উল্টোদিকে? সেদিকটা জুড়ে যেন প্রাচীরের মতো বিরাজ করছেন মহামহিম হিমালয়ের উচ্চতর আমীর-ওমরাহেরা। মেঘের মুকুট মাথায় গগনচুম্বী শৃঙ্গরাজি, গহীন অরণ্যাবৃত উপত্যকা, পাহাড় আর পাহাড়। সে দৃশ্য বোগলকে বিস্ময়ে হতবাক করেছিল, বোগল নিজেই লিখেছেন। বোগলের আড়াইশো বছর পর আজ এই জুন মাসেও তার একচুল অন্যথা হল না। এবং আজ জুনের ১০ তারিখ!

* * *

দেখতে দেখতে পশ্চিমের আকাশ জুড়ে দিনান্তের হোলি খেলে সূর্য ডুবে গেল, উপত্যকায় তার রেশটুকু থেকে গেল আরও কিছুক্ষণ। পিছনে গগনভেদী ভুটান-পাহাড়ের মাথায় ঘন মেঘ জমেছে। সূর্য ডুবতেই হালকা শীতের আমেজ, গরম কাপড় অবশ্য লাগবে না এই সময়। বাহারি কাপে ধোঁয়া-ওঠা চা দিয়ে গেলেন হোমস্টের মালকাইন 'বড়ি' (বৃদ্ধাকে সম্মানসূচক সম্বোধন)। আমরা তখনও চত্ত্বরের কিনারায় বাঁশের চটা দিয়ে বানানো বেঞ্চিতে বসে অনিমেষ তাকিয়ে রয়েছি নীচের সেই অদৃষ্টপূর্ব দৃশ্যপটের দিকে। এমন সময় নাট্যমঞ্চের দু-দিক থেকে সরে-আসা যবনিকার মতো মেঘের দল দু-দিক থেকে ধেয়ে এসে মুছে দিল সব। হঠাৎ করেই শীত যেন বাড়ল, পিছনে ফিরে দেখি, ভুটান পাহাড় তো দূরস্থান, গজ বিশেক দূরে আমাদের আস্তানা কুটিরটিও মেঘে সম্পূর্ণ ঢেকে গিয়েছে। দিনের মতো ঘরে ফিরে আসি, ফুলহাতা জামাটামা পরে ব্যালকনিতে পাতা চেয়ারে এসে বসি। টিমলিডার পার্থ ও নেপালী ভাষাবিদ দেবাশীষ কাজ শুরু করে দিয়েছেন, হোমস্টের হেঁসেলে সেঁধিয়ে গিয়ে সান্ধ্যকালীন পকোড়া ও রাত্তিরের চিকেন কারির বন্দোবস্ত দেখছেন। দলের তরুণতম সদস্য মৃন্ময় ও আমি বসে রয়েছি, বাঘা ক্যামেরাম্যান দুর্জয় ঘরে একটু গড়িয়ে নিচ্ছেন। চরাচরব্যাপী হিমকুয়াশার পাতলা আস্তরণে পাঁচ গজের বেশি নজর চলে না, বৃষ্টি আসবে কি? আসুক, এই পাহাড়ে বৃষ্টিবালার লাস্য নেশা আরও বাড়িয়ে দেবে। সমগ্র পৃথিবীর থেকে যেন বিচ্ছিন্ন আমরা ব্যালকনিতে বৃষ্টির পথ চেয়ে স্থানু বসে থাকি। 'চেয়ে চেয়ে শুধু চেয়ে' কেমন ঝিম ধরে আসে। মন জুড়ে অদ্ভুত এক প্রশান্তির আবেশ, পরিব্যাপ্ত বৃহৎ-এর সামনে এলে মানুষ নিজের ক্ষুদ্রতা মর্মে মর্মে অনুভব করতে পারে। সেই অনুভব প্রতিপলে বুঝিয়ে দেয়, শান্তি আছে শুধু উপলব্ধিতে, বস্তুতে নয়। সে অপার্থিব শান্তির পরশ লেগে আছে এই বন-পাহাড়ের চোরবাটোর প্রতিটি নুড়িপাথরে, ক্ষুদ্র গোমপার ভেতরে ভগবন তথাগতের সামনে মাখন-ভর্তি পাত্রে জ্বলা প্রদীপের শীর্ণ আলোকশিখায়, প্রতিটি পাখীর শিসে, প্রজাপতির বর্ণালীতে, বন্য অর্কিডের ঝোলানো পাতা থেকে চুঁইয়ে-পড়া প্রতিটি বৃষ্টিবিন্দুতে।

অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে বেশ, সোলার-চার্জার হাত-লণ্ঠন দিয়ে গেছে দাজু। অলক্ষ্যে কখন জানি মেঘ কেটে গেছে, সামনে নিবিড় আঁধারে দূরে দেখা যাচ্ছে কয়েকটি আলোর বিন্দুর জটলা। আরেক রাউন্ড চা নিয়ে আবার এল যে দাজু, তাকে জিজ্ঞেস করে জানলাম, ওগুলো আলিপুরদুয়ার শহরের আলো। চা-পকোড়া খেতে খেতে আগামীকালের প্ল্যান ঠিক হল, আগামীকাল আমরা পাহাড়ের আরও গভীরে ভুটানের দিকে আরও একটা গ্রাম বেড়াতে যাব, নাম অচেলুং।

—কত দূর?

—তা ধরুন, এখান থেকে আড়াই কি তিন কিলোমিটার হবে। একটু উপরের দিকে, পিছনে যে পাহাড় দেখা যাচ্ছে, ওরই কোলে।

তা ভাল। নীচ থেকেই তো এসেছি, নীচেই ফিরতে হবে, আপাতত না হয় আরও উপরের দিকেই যাওয়া যাক। কিন্তু যার প্রতীক্ষায় আজ

বিকেল-সন্ধ্যে কাটল, সেই বৃষ্টি এল না তো? সময় মতো চিকেনকারি এল, লজ্জা লজ্জা মুখে শুক্লা পঞ্চমীর চাঁদ এল, সাদামাটা বিছানায় সেই চাঁদের আলো মাথায় নিয়ে যথাসময়ে ঘুমও এল।

জর্জ বোগলের তিব্বত যাত্রার সতেরো বছর পর তিব্বতে গোর্খা আগ্রাসন হয় (১৭৯২)। চিনের সাহায্যে শেষ পর্যন্ত নেপালের রাজাকে পরাস্ত করে সে আক্রমণ প্রতিহত করেছিল তিব্বত, কিন্তু ফল হল যে তিব্বতে প্রবেশের গিরিপথগুলো বন্ধ হয়ে গেল বহিরাগতদের জন্য। চিরতুষারের দেশটি নিজের চারিধারে আগল তুলে দিয়ে নিজেই নিজেকে নির্বাসন দিল বিচ্ছিন্নতার আশীর্বাদী একাকিত্বে। তা সে যাই হোক, ভুটানের ভেতর দিয়ে তিব্বতের বাণিজ্যপথ তৈরিতে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল জর্জ বোগলের সেই অভিযান। যে পথে তিনি গিয়েছিলেন, সে পথে তাঁর আগে কোনও ইউরোপীয় যাননি। বোগলের অনেক পরে ১৮৪৮-এ প্রকৃতিবিদ জোসেফ ডাল্টন হুকার একই দিকে যাবেন শিংলিলার পথ বেয়ে, তাঁর আকরগ্রন্থ 'হিমালয়ান জার্নাল' লিখবার রসদ কুড়োতে। কথা যখন উঠলই, তখন বলে ফেলা যাক, জর্জ বোগলের একশো বছর পর ১৮৭৯ সালে ব্রিটিশ সরকারের নির্দেশে একই উদ্দেশ্যে তিব্বত যাবেন বছর তিরিশের এক বাঙালি, শরৎচন্দ্র দাস। শরৎ দাস দার্জিলিং-এর ভুটিয়া বোর্ডিং স্কুলের হেডমাস্টার, তাঁর সঙ্গে যাবেন সহশিক্ষক উগেন গ্যাৎসো, যিনি কিনা সিকিমের রিনচেনপং মঠে দীক্ষিত। তিব্বতে তখন ভিনদেশীর প্রবেশ নিষিদ্ধ, তাই এবারের যাত্রা সম্পূর্ণ গোপনচারণা। পথও ঈষৎ আলাদা, দার্জিলিং পাহাড় থেকে রাম্মাম হয়ে টংলু টপকে ব্রিটিশ ভারতের সীমানা পেরিয়ে শিংলি পাহাড়ের পথে হি-লা পাস ধরে বৌদ্ধ ধর্মপ্রচারকের ছদ্মবেশে ওঁদের নিষিদ্ধ সেই দেশে প্রবেশ। সে অন্য গপ্প, অন্যরকম রোমাঞ্চকর, কিন্তু আজ সে কথা নয়, অন্য কোনওদিন, অন্য কোনও সুযোগে।

জর্জ বোগল কলকাতা থেকে রওনা হওয়ার ঠিক এক বছর পর ১৭৭৫-এ দেশে ফিরলে তাঁকে আরেকবার কোম্পানির দূত হিসেবে তিব্বত ও চিনে পাঠাবার কথা হয়। পাঞ্চেন লামা তখন চিনে অবস্থান করছেন। কিন্তু বেইজিং-এ থাকাকালীন গুটিবসন্তে পাঞ্চেন লামার মৃত্যু হয়। এর কিছুদিনের মধ্যে ৩ এপ্রিল ১৭৮১, কলকাতার কুখ্যাত ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে অকালে বোগল মারা যান। তাঁর সমাধি পাওয়া যাবে পার্ক স্ট্রিট গোরস্থানের প্লট নম্বর ১৪৪৫-এ। এতই অনাড়ম্বর আর অনাদৃত সে সমাধিবেদী যে বুঝতে অসুবিধে হয় না, ইতিহাসের ছেঁড়া পাতায় লেখা জর্জ বোগলের কাহিনী কালের হাওয়ায় বিস্মৃতির নিকষ অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। ইতিমধ্যে হেস্টিংসও অবসর নিয়ে দেশে ফিরে যান। বক্সা পাহাড় বেয়ে ভুটানের মধ্যে দিয়ে তিব্বতের সঙ্গে বাণিজ্য সম্ভাবনা চাপা পড়ে যায় ইতিহাসের ঝরা পাতার স্তূপে। হেস্টিংসের নির্দেশ মেনে একটি ডায়রিতে তাঁর তিব্বত পরিক্রমার অনুপুঙ্খ বিবরণ দৈনিক লিখে রাখতেন বোগল। এক সম্পূর্ণ অজানা ভূখণ্ডের সমাজজীবন, ধর্মবিশ্বাস, লোকাচার ও ভূপ্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের আশ্চর্য খুঁটিনাটি। সে দিনলিপি তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর অন্যান্য জিনিসপত্রের সঙ্গে ফিরে যায় ইংল্যান্ডে। একশো বছর পরে তা খুঁজে পেয়ে প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ সালে, টমাস ম্যানিং নামে আরেক লাসা-পর্যটকদের ভ্রমণ বিবরণের সঙ্গে এক মলাটে। ইয়েল ইউনিভার্সিটির সৌজন্যে এই বইটির একটি স্ক্যান-করা (পিডিএফ) প্রতিলিপি আমি ইন্টারনেটে খুঁজে পেয়েছি। তার যত পড়ি, তত যেন এক সাংঘাতিক মাদকের নেশায় জড়িয়ে পড়ি, স্বপনে-জাগরণে এক অচ্ছেদ্য বন্ধন তৈরি হয়ে যায় এই মেঘ-পাহাড়-বন-বরফের দেশের সঙ্গে।

* * *

লেপচাখা ও আশপাশে অচেলুং এবং অন্য গাঁ-গুলোয় মূলত দ্রুগপা জনজাতির বাস। এখানকার দ্রুগপাদের বেশির ভাগের আদি নিবাস ভুটান। এখনও সেখানকার আত্মীয়পরিজনের বিয়ে-শাদিতে পায়ে হেঁটে সমর্থ মেয়ে-পুরুষেরা ভুটান চলে যায় অনায়াসে। অচেলুং যেমন। মাত্তর বিশ ঘর দ্রুগপা আর একটি ছোট্ট গোমপা নিয়ে অচেলুং। মূল উপজীবিকা চাষবাস, সেও মরশুমী। অন্য সময়ে ওরা চলে যায় হয় ভুটানের শহর ফুন্টশোলিং-এ অথবা নীচে হ্যামিলটনগঞ্জে লেবারের কাজে। অচেলুং-এ সোনম দ্রুগপার বাড়িতে প্রচুর চিনি-দেওয়া চা খেতে খেতে এই সব শুনছিলাম। আশপাশের পাঁচ গাঁয়ের (কথার কথা) সোনমই হল একমাত্র হ্যামিলটনগঞ্জের হাই স্কুলে পড়া মেয়ে, এখন হ্যামিলটনগঞ্জেই একটি এন জি ও-তে কাজ করছে। ওদের এন জি ওটি পরিবার পরিকল্পনা ও মাতৃস্বাস্থ্য-সচেতনতা নিয়ে এই অঞ্চলের গ্রামগুলোয় কাজ করে। সখেদে সোনম বলে, এখানে এখনও বাড়িতেই প্রসব করায় স্থানীয় 'বড়ি'-আম্মা। পুঁচকেগুলো পাহাড়ি পথে লাফাতে লাফাতে পড়তে যায় বক্সা প্রাইমারি স্কুলে। শুনে মনে পড়ে গেল, বক্সা ফোর্ট পেরিয়ে চড়াই ধরবার আগে বাঁ-হাতে টিনের চালার তিন-কামরা ঘর থেকে কচি কচি গলায় সুর করে নামতা পড়ার আওয়াজ শুনেছিলাম বটে। সোনমের বাড়ির একচিলতে বারান্দা থেকে দূর পাহাড়ের খাঁজে কয়েকটি নীল টিনের ছাদের একই ধাঁচের বাড়ি দেখা যায়, গাঁয়ের বাড়ি? মনে হয় না। সোনমই বলে দেয়, ওটা সীমা সুরক্ষা বলের ৫৩ ফালাকাটা ব্যাটেলিয়নের আউটপোস্ট। এ তল্লাটের নজরদারির ভার ওরাই সামলায়, হাজার হোক ভুটান তো একরকম বিদেশই, আর বিশ্বজুড়ে এমন সব রক্তাক্ত কাণ্ডকারখানা ঘটছে যে তার ব্যাপারীরা কোন পথে দেশের অন্দরমহলে সেঁধিয়ে যাবে বোঝা মুশকিল। তাই নজর তো রাখতেই হয়। উঠে পড়ি আমরা, সোনম বিদায় জানালে প্রতিজ্ঞা করে আসি, আবার আসব। লেপচাখা থেকে অচেলুং-এর পুরো পথটাই রংবাহারি প্রজাপতিদের, ও পথে ওরাই ওড়ে। এত নিলাজ ওদের ব্যবহার কি বলব, থেকে থেকেই ক্যামেরা-ধরা হাতে, টুপিতে, কাঁধে এসে বসে ওরা। তাই নিয়ে আমরা হাসাহাসি করি; ওরা এবার সবচেয়ে বেশি হাসছে যে, তার চশমার ডাঁটিতে গিয়ে বসতে চায়। ওদিকে আজও আবার কালো মেঘ জমেছে পাহাড়ের মাথায়, সূর্য আলগোছে তার আড়ালে সরে দাঁড়িয়েছে। পাহাড় বেয়ে ক্রমশ নীচে নেমে আসছে মেঘের দল, আঁধার মেঘের বুকে বিদ্যুৎ-এর হীরের হার ঝলকে ওঠে কয়েকবার। আস্তানার দিকে পা চালাই। কিন্তু প্রজাপতিরা যেন অনিকেত, ওরা

ব্যস্ততাহীন, ঘনিয়ে-আসা মেঘের পটে কালচে সবুজ পাহাড়ের গায়ে ফুলে ফুলে পাতায় পাতায় ভয়ডরহীন খেলেই বেড়ায়। এই অনাবিলতার ঐশ্বর্যে ভালো থেকো অচেলুং, ভালো থাকিস তোরা লজ্জাহীন প্রজাপতির ঝাঁক।

বৃষ্টি থেকে বাঁচতে আশ্রয় নিলাম পথের ধারে একটি জিরেনছাউনি বা 'দংখাং'-এর নীচে। মেঘে মেঘে বেলা হয়েছে, বেলাই বা বলি কেন, যেন সন্ধে ঘনিয়েছে দুপুর দুটোতেই। খানিক অপেক্ষায় বোঝা গেল, বৃষ্টিকুমারীর সাজগোজ এখনও সম্পূর্ণ হয়নি, আমাদের আস্তানায় সহি-সলামত ফিরে যাওয়ার সুযোগ তিনি দেবেন। পথের শেষটুকু প্রায় দৌড়ে এসে ঢুকে পড়লাম লেপচাখার ছোট্ট গোমপায়। মূল গোমপার বাঁয়ে চিরাচরিত প্রথায় একটি 'মেন্ডং' (স্তূপ) যাতে তিব্বতী মহামন্ত্র 'ওঁ মণিপদ্মে হুঁ' উৎকীর্ণ আছে। খুব বেশি হলে পনেরো বাই পনেরো গোমপাটির ভিতরে সারি দিয়ে মোম জ্বলছে আর উঁচু বেদীতে অনির্বাণ দুটি আঁখি মেলে পদ্মাসনে বসে আছেন ভগবন তথাগত। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে আজ অবধি আমি আমাদের নিজস্ব হিন্দু দেবদেবীর মূর্তিতে সৌন্দর্য্য ছাড়া অন্য কিছু দেখতে পাই না, কিন্তু এই গহন পাহাড়ে এই বৌদ্ধ গোমপার পরিবেশ আমায় আবারও অজানা কোনও এক মহানতা, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার পরিসীমার বাইরে কোনও এক বিশালত্বের সামনে আত্মসমর্পণেচ্ছু করে তোলে। এই হিমপাহাড়ের এখানে ওখানে নানা গোমপা আর স্তূপে এ অপার্থিব অনুভূতি আমার আগেও হয়েছে।

দিন আর সন্ধ্যের পারম্পর্য ঘুচিয়ে অবশেষে বৃষ্টি নামল লেপচাখায়। কুটিরের টিনের চালে তার অবিরাম নৃত্যছন্দে ঘোর লেগে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি কি জানি। আগামীকাল আবার সমতলে ফেরা। এ নিঃসীম প্রশান্তির দেশ ছেড়ে হুড়োহুড়ি, টানাপোড়েন আর প্যাঁচপয়জারের দুনিয়ায় কোমর বেঁধে নেমে পড়া।

* * *

বক্সাদুয়ার হয়ে ভুটান পাহাড়ের পথ ধরে ডিসেম্বর মাসে পশ্চিম তিব্বতের শিগাৎসে শহরে পৌছান জর্জ বোগল। শিগাৎসে শহরে পাঞ্চেন লামার বাসস্থল তাশিলুম্ফো নামে বিশাল মঠনগরী (দালাই লামার বাসস্থান লাসা), সেই কারণে পাঞ্চেন লামার চলতি নাম তাশিলামা বা তেশুলামা। প্রায় মাস চারেক বোগল ছিলেন সেখানে। তাঁর সঙ্গে পাঞ্চেন লামার গভীর সখ্য গড়ে ওঠে। ভারতে ফিরে আসবার সময় তেশু লামা তাঁদের বন্ধুত্বের চিহ্নস্বরূপ একটি তিন-সুতোয় তিব্বতি পুঁতি দিয়ে গাঁথা মালা (three charmed strings of beads forming one necklace) নিজের গলা থেকে খুলে বোগলকে উপহার দেন। তাঁর নিজস্ব অনুভবে তাঁর জীবনের সবচেয়ে শান্তিময় কিছু সময় কাটিয়ে ৭ এপ্রিল ১৭৭৫ লামার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে জর্জ বোগল বাংলায় প্রত্যাবর্তনের পথ ধরেন। তাঁর নিজের ভাষায়– "...I may set this down as the most peaceful period of my life. It is now almost over, and I am about to return to the hurry and bustle of Calcutta". আজ বোগলের এতকাল পরে এই পাহাড়-বন ফেলে সমতলে ফেরবার কালে আমার ভাষা কি অন্য কিছু হবে? নাঃ, কিছু জিনিস চিরায়ত, সতত পরিবর্তনশীল এই ব্রহ্মাণ্ডে কিছু জিনিস আছে যা শাশ্বত। ফিরতি পথে বক্সা ফোর্ট ঘুরে দেখি, সামান্য কয়েকটি পাথরের দেওয়াল অবশিষ্ট আছে। গোদের উপর বিষফোঁড়া হয়েছে পূর্ত দপ্তরের উদ্যোগে সরকারি সৌন্দর্যায়ন। উল্টোদিকে বক্সা গ্রামের পথে সেই বক্সা পোস্ট অফিস, আর একটি সংগ্রহশালা। সংগ্রহশালায় ভুটানি নেপালী জনজাতির ঐতিহ্যগত পোষাকপরিচ্ছদ, শিরস্ত্রাণ, শিকারের অস্ত্রশস্ত্র সাজানো হয়েছে, যদিও এ প্রয়াস আমায় খুব একটা প্রভাবিত করেনি; মনে হল আরও যত্নের, আরও পরিকল্পনা ও মমত্বের প্রয়োজন আছে। তারপর সেই ছোট্ট খোলার উপর ছোট্ট কাঠের সাঁকোটি পেরিয়ে আরেকবার ফিরে তাকাই– শিগাৎসে থেকে কলকাতা প্রত্যাবর্তন কালে জর্জ বোগলও আবেগ চেপে রাখতে পারেননি। তিনি লিখেছেন– "Farewell ye honest and simple people! May ye long enjoy that happiness which is denied to more polished nations; and while they are engaged in the endless pursuit of avarice and ambition, defended by your barren mountains, may ye continue to live in peace and contentment, and know no wants but those of nature." আড়াইশো বছর আগে বলা বিদায়ের এই কথা ক'টি যেন কেমন ঋষিবাক্যের মত মনে হয়! ভালো থেকো তোমরা লোভ আর আকাঙ্ক্ষার কলুষমুক্ত অনাবিল প্রকৃতির সহজিয়া সুরের ছন্দে মাতোয়ারা হয়ে, ভালো থেকো চির-প্রশান্তির স্বপ্নের দেশ আমার।

* * *

তথ্যসূত্র:

১. মানদণ্ড ছেড়ে রাজদণ্ড– তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় (দে'জ)

২. পলাশীর অজানা কাহিনী– সুশীল চৌধুরী (আনন্দ)

৩. শাংগ্রিলার খোঁজে–হিমালয়ে গুপ্তচারণার তিন শতক– পরিমল ভট্টাচার্য (অবভাস)

৪. Narratives of The Mission of George Bogle to Tibet (1774-75) and of The Journey of Thomas Manning to Lhasa (1811-12), ed by Clements R Markham, Truber & Co. London 1876 (Scanned copy by courtesy of Yake University Press)

৫. Trespassers on the Roof of the World: The Secret Exploration of Tibet by Peter Hopkirk, Kodansha Globe Paperback– April 15, 1995

ছবি- 'ছবির পাতা-১'

পরিচিতি

অর্থনীতির অধ্যাপক।
প্রকৃতির কোলে ভ্রমণ অহরহ।
ভ্রমণ কথা ও বিবিধ অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখার নেশায় আক্রান্ত।

সাগরের ঢেউ গুনতে– গোপালপুরে

দেবনারায়ণ মাঝি

'গোপালপুর-অন-সি'... খুবই পরিচিত নাম। মনে প্রশ্ন ছিল 'অন-সি' কেন? নামটার মধ্যে আমি খুঁজে পাই অদ্ভুত এক সিক্তভাব। প্রায় হঠাৎ করেই ঠিক করলাম দু'দিনের জন্য ঘুরে এলে কেমন হয়। ট্রেনের টিকিট কাটতে গিয়ে ফলকনামা ছাড়া আর কোনও ট্রেনের রিজার্ভেশন পাওয়া গেল না, তাই হাওড়া থেকে সকাল ৭টা ২৫ মিনিটের ফলকনামা এক্সপ্রেসে চেপে বসলাম। ট্রেনের উপরের বার্থে হালকা ঝিমুনিতে পৌঁছে গেলাম বালাসোর। তারপর নীচের বার্থে বসে বাকিপথের সৌন্দর্য্য দেখতে দেখতে এগিয়ে চললাম। দু'দিকের ছোটো ছোটো টিলা যেন পথ দেখিয়ে দিচ্ছে আর চিলিকার কিছু অংশ বলে দিল এগিয়ে যাও সাগর স্বাগত জানানোর জন্য অপেক্ষা করছে। পথের সৌন্দর্য সাথে বাড়ির তৈরি ফ্রায়েড রাইস আর চিকেন কষা যাত্রাপথের আনন্দ আরও বাড়িয়ে দিল। ৩০ মিনিট দেরিতে বিকেল ৫টায় ব্রহ্মপুর (বেরহামপুর) স্টেশনের ২নং প্লাটফর্মে নামলাম। স্টেশনের স্লোপিং ওভারব্রিজ দিয়ে ১নং প্লাটফর্মের বাইরে বেরিয়েই শেয়ারের অটো নিয়ে জনপ্রতি ১৫ টাকায় ১০ মিনিটে বাসস্ট্যান্ড পৌঁছে গেলাম। গোপালপুরগামী বাস দাঁড়িয়েছিল। উঠে বসলাম। ৫ মিনিট পর বাস ছাড়ল। ছোট্ট শহর। মনের মধ্যে নতুন জায়গা দেখার অদ্ভুত উন্মাদনা। বেশ কিছুটা যাওয়ার পর একটা গেট দেখলাম। ইংরেজি ও ওড়িয়ার সাথে বাংলাতেও লেখা আছে 'গোপালপুরে স্বাগতম'। গোপালপুর জায়গাটি ওড়িশার দক্ষিণপ্রান্তে বঙ্গোপ-সাগরের তীরে গঞ্জাম জেলার একটি ছোট্ট শহর। ব্রহ্মপুর রেলস্টেশন থেকে দূরত্ব প্রায় ১৫ কিলোমিটার। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়ার সময়ে গোপালপুর গড়ে উঠেছিল বাণিজ্যিক বন্দর হিসেবে। ব্রহ্মদেশ থেকে চাল আমদানির জন্য এই বন্দরের খ্যাতি ছিল। বর্তমানে শান্ত বেলাভূমি, জেলে বস্তিদের গ্রাম, কাজুবাদামের বাগান, গোপালজীর মন্দির আর ৩৮ কিলোমিটার দূরের সতীর একান্ন পীঠের অন্যতম একটি পীঠ ঋষিকূল্য নদীর তীরে তারাতারিণী মন্দির-এর জন্য গোপালপুরের খ্যাতি। ৪৫ মিনিটের পথ পেরিয়ে এসেছি। অন্ধকার নেমে এসেছে। কয়েক মিনিট পর বাসটি 'এল টার্ন' নিয়ে দাঁড়ালো। কন্ডাক্টর বললেন এসে গেছে। কানে ভেসে এল খুব চেনা শব্দ। উৎসাহী চোখ বাসের জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল। রাস্তার পরে ধাপকাটা সিঁড়ি, নীচে অল্প আলোতে সার বাঁধা ছোটো ছোটো দোকান, ঠিক তার পরেই চোখ আটকে গেল, কালো জলের উপর সাদা ঢেউয়ের সারি। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ধাতস্থ হয়ে ব্যাগ নিয়ে বাস থেকে নামলাম। বাঁদিকে দোকানের সারি ডানদিকে বিচ। বিচ রোড ধরে একটু এগোতেই রাস্তার ডানদিকে অর্থাৎ সমুদ্রের দিকে একটা হোটেল দেখতে পেলাম– হোটেল সি সাইড ব্রিজ। দোতলা হোটেল, সবকটি রুমই সমুদ্রমুখী। নীচতলার একটা রুম পছন্দ হয়ে গেল। অবস্থানগত দিক দিয়ে আমার মনে হয়েছে গোপালপুরের সবচেয়ে ভালো হোটেল এটি। ঘরে ব্যাগপত্র রেখে ইলেকট্রিক কেটলিতে লিকার চা বানিয়ে বারান্দায় রাখা ডেক চেয়ারে বসলাম। ডিসেম্বরের ১৫ তারিখ, ঠান্ডা নেই, উপভোগ্য হাওয়া বইছে। বিচ রোডের আলোর হালকা আভা সমুদ্রের জলে পড়েছে। মনে হচ্ছে যেন সাদা ওড়না উড়িয়ে উচ্ছ্বল যুবতীরা সার বেঁধে এগিয়ে এসে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। ডেক চেয়ারে এলানো শরীর মন অজানা আবেশে আচ্ছন্ন হয়ে এল। হোটেলের ছেলেটি রাতের খাবারের জন্য ডাকতে আসতেই আচ্ছন্ন ভঙ্গ হল। হোটেলেই খাবারের ব্যবস্থা আছে। মানের দিক দিয়ে বেশ ভালো আর দামও ঠিক ঠাক। খেয়ে আরও কিছু সময় ডেক চেয়ারে বসে শুতে গেলাম। উচ্ছ্বল যুবতীদের ঘুমপাড়ানি গান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন খুব ভোরে ঘুম ভাঙলো ওই উচ্ছ্বল যুবতীদের প্রাণ ভোলানো হাসিতে। দরজা খুলতে চোখ পড়ল নীলকান্তমণির মতো বিস্তীর্ণ জলধির উপরে ভেসে চলা বালিকাদের ধীর লয়ে এগিয়ে আসা। দিনমণি সবে দিকচক্রবালে উঁকি দিচ্ছে, রাঙা হচ্ছে আকাশ। বেশ কয়েকটি সাদা মেঘের ভেলা দিনমণির আগমন বার্তা জানানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। সবকিছু যেন স্বপ্নের মতো আমার মনকে ভরিয়ে রাখল বেশ কিছু সময়। চা খেয়ে তৈরি হয়ে ক্যামেরা নিয়ে হোটেলের নিজস্ব সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এলাম। হোটেল থেকে নেমে ৫০ ফুটের মধ্যেই জল। দিনমণি বেশ কিছুটা উপরে উঠে গেছে। মিঠে রোদে ধীর পায়ে সমুদ্রকে বাঁদিকে রেখে জলের ধার দিয়ে হেঁটে চলেছি। কিছুটা হাঁটার পর ছোটো ছোটো গর্ত দেখতে পেলাম। শুরু হল লুকোচুরি খেলা। ছোটো ছোটো কাঁকড়া পায়ের শব্দে গর্তে ঢুকে যাচ্ছে আবার কিছু পরে উঁকি দিচ্ছে। লুকোচুরি খেলার ফাঁকে তাদেরকে ফ্রেমে বন্দী করলাম। বেশ কিছু ছোটো ছোটো মরা মাছ ঢেউয়ের সাথে তীরে আসছে, বেশ কয়েকটি কাক খুব আনন্দের সাথে তাদের প্রাতরাশ সেরে নিচ্ছে। বেশ কিছুটা এগিয়ে দেখলাম বেশ কিছু নৌকা সার বেঁধে ডাঙায় দাঁড়িয়ে আছে। জেলেরা নৌকার পাশে বসে তাদের নিত্যদিনের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে– জাল সারাই, জলে নামার আগে নৌকাকে প্রস্তুত করা ইত্যাদি। কালচে নীল জলে ভেসে আসছে বেশ কিছু নীল, হলুদ পাল তোলা নৌকা। হয়তো সারা রাত মাছ ধরে ক্লান্ত শরীরে, খুশী মনে তীরে ফিরছে। বেশ কিছু সময় দাঁড়িয়ে থাকলাম ওদের অপেক্ষায়।

ছবি- দেবনারায়ণ মাঝি

ততক্ষণে বেশ কিছু মহিলা ঝুড়ি নিয়ে জড়ো হয়েছে মাছ কিনে বাজারে কিছু বেশি দামে বিক্রি করার জন্য। নৌকাগুলি থেকে কয়েক ঝুড়ি নাম জানা আর নাম না জানা রূপালি মাছ নামল। দরাদরির পর মহিলারা মাছগুলি কিনে নিয়ে বাজারের উদ্দেশে চলে গেল। বেলা বাড়ার সাথে সাথে বিচে বেশ কিছু মানুষের আনাগোনা শুরু হয়ে গিয়েছে। ফিরে এলাম হোটেলে। প্রাতরাশ সেরে বিচরোড ধরে সমুদ্রকে ডানদিকে রেখে এগিয়ে চললাম। উদ্দেশ্যহীন যাত্রা, এটা আমাদের ভ্রমণের একটা অঙ্গ। মিনিট ১৫ হাঁটার পর পৌঁছে গেলাম একটা খাঁড়ির ধারে। সমুদ্রের জল স্থলভাগে ঢুকে তৈরি হয়েছে খাঁড়িটির, স্ফটিক স্বচ্ছ নীল জল, সার দিয়ে দাঁড়িয়ে রংবেরঙের নৌকা। দেখতে বেশ ভালোই লাগছিল, ফ্রেমবন্দী হল রংয়ের ছটা। পাশেই বেশ কয়েকটি ঝুপড়ি দেখে এগিয়ে গেলাম। আমি একেবারেই সহ্য করতে পারি না এমন একটা গন্ধ ভেসে আসছে, তাও এগিয়ে গেলাম কাছ থেকে দেখব বলে। মাছকে রোদে দিয়ে শুঁটকি মাছ তৈরি হচ্ছে। নানান রকমের মাছ জালের উপর সূর্যের আলোতে ফেলা আছে। ঝুপড়ির মহিলা, বাচ্চাদের সাথে বেশ কিছু সময় কাটিয়ে এবার সমুদ্রকে বাঁদিকে রেখে ঢেউয়ের দোলার ছোঁয়া নিতে নিতে হোটেলের দিকে এগিয়ে চললাম। লক্ষ্য করলাম আমাদের আগে ও পিছনে আর কেউ নেই। ছোট্ট কোস্টাল ট্রেকের আস্বাদ নিতে নিতে হোটেলে পৌঁছে গেলাম।

দিনমণি প্রায় মধ্যগগনে সমুদ্রকে আরও গভীরভাবে পেতে নেমে পড়লাম তার বুকে। ঢালু লালচে বেলাভূমিতে আছড়ে পড়ছে ঢেউ। ঢেউয়ের নাচের তালে নিজেকে মানিয়ে নিতে প্রথমে একটু অসুবিধা হচ্ছিল। স্ফটিকস্বচ্ছ জলে শরীরকে সিক্ত করে প্রায় ঘণ্টাখানেক পর হোটেলে ফিরে গেলাম। দুপুরের খাবার ঘরের সামনের বারান্দায় বসে তৃপ্তিভরে খেয়ে একটু জিরিয়ে নিলাম।

বিকেলে ঘুম থেকে উঠে দেখলাম বিচে যেন মেলা বসে গেছে। স্থানীয় মানুষেরা, স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা বিচে জড়ো হয়েছে। বেশকিছু স্কুলের বাচ্চা ইউনিফর্ম ছেড়ে ছোটো প্যান্ট পরে নানানরকম কসরতে ব্যস্ত। কেউ ডিগবাজি খাচ্ছে, কেউ বা জিমনাস্টিক দেখাচ্ছে কেউবা বন্ধুদের নিয়ে নানানরকম মশকরায় মত্ত। একটা উট ও একটা খচ্চরকে দেখলাম সওয়ারি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমিও ক্যামেরা হাতে বিচে নেমে পড়লাম। স্কুলের বাচ্চাগুলোর সমুদ্রের জলে অদ্ভুত দক্ষতায় ভল্ট খাওয়ার দৃশ্য হাই শাটার স্পিডে ক্যামেরাবন্দী করলাম। বিচে রয়েছে শামুক, ঝিনুকের তৈরি ঘর সাজানোর উপহার সামগ্রীর দোকান ও কয়েকটি খাবারের দোকান। দিনমণি দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে লাইটহাউসের পাশ দিয়ে ঢলে পড়েছে। ধীরে ধীরে ছোট্ট বিচ রোডে আলো জ্বলে উঠল। বিচ রোডের খাবারের দোকানগুলিতে ভিড় জমতে শুরু করেছে। ৫ মিনিট হাঁটা পথে দেখে নিলাম গোপালজির মন্দির। মন্দিরটি অষ্টাদশ শতকে তৈরি। কালো কষ্টিপাথরে তৈরি গোপালজির বিগ্রহ দেখে ভক্তিতে মাথা নুয়ে এল। বাকি সন্ধেটা বারান্দায় রাখা ডেক চেয়ারে বসেই কেটে গেল।

পরদিনও গোপালপুরে থাকব। একইভাবে ঘুরে বেড়িয়ে, স্নান করে কাটাব ঠিকই ছিল। সকাল থেকে একইভাবে কাটল সারাদিন। বিকেলে বাজারের পথে হাঁটতে গিয়ে ঢুকে পড়লাম একটা ছোট্ট রাস্তায়। দেখলাম রাস্তার দুপাশের বাড়িগুলোর সামনের উঠোনে মহিলারা জল দিয়ে ধুয়ে দিচ্ছে। বাজার থেকে ফিরতি পথে আবার ওই পথে গিয়ে দেখলাম ওই মহিলারা ওই জায়গাগুলিতে খুব সুন্দর সুন্দর আলপনা দিচ্ছে। বিষয়টি জানতে চাইলাম। বলল, কাল অগ্রহায়ণ মাসের শেষ অর্থাৎ সংক্রান্তি তাই এই আয়োজন। মনে হচ্ছিল সত্যিই মা লক্ষ্মীর আসন পাতা হয়েছে, উনি নিশ্চয়ই এই সহজ-সরল মানুষগুলির বাড়ি আলোকিত করবেন আর সারা বছরই অধিষ্ঠান করুন এই বাড়িগুলিতে। অল্প কথাবার্তায় মানুষগুলোর আন্তরিকতা দেখে মুগ্ধ হলাম। উনাদের সাথে বেশ কিছুটা সময় কাটিয়ে হোটেলে ফিরে এলাম। এসে ব্যাগ গুছিয়ে গোপালপুর-অন-সিকে বিদায় জানিয়ে আটটার বেরহামপুরগামী শেষ বাসটিতে চেপে বসলাম। সত্যি গোপালপুর 'অন-সি', এটাই যথাযোগ্য নাম। বাস চলতে শুরু করল, চোখের আড়ালে চলে যেতে লাগল উচ্ছল যুবতীদের সুমিষ্ট বিদায় সম্ভাষণ। ক্ষীণ হয়ে এল তাদের হাসির রোল। মনের মধ্যে ভেসে উঠল কিছু টুকরো মুহূর্ত... কাঁকড়াগুলোর সাথে লুকোচুরি, স্কুলের বাচ্চাগুলোর দামালপনা, মাছ ধরে ফিরে আসা জেলেগুলোর হাসিমুখ, মাঝ সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়া নৌকাগুলোর বিদায় মুহূর্ত, জেলে বস্তির বাচ্চাগুলোর নিষ্পাপ চাউনি, গ্রামের মহিলাদের সুদৃশ্য আলপনা, সমুদ্রের বুকে যুবতীদের সাদা ওড়না নিয়ে ধেয়ে আসা আর সেই ছোট্ট আট বছরের মেয়েটি, নাম তার টিয়া, যার দোকান থেকে কয়েকটি ঝিনুক দেওয়া চাবির রিং কিনেছিলাম, ঝিনুক ছিল কিন্তু রিং ছিল না। সে কিন্তু খরিদ্দার হাতছাড়া করেনি, দৌড়ে গিয়ে অন্য একটা দোকান থেকে রিং নিয়ে এসে নিপুণ দক্ষতায় ঝিনুকের মধ্যে পরিয়ে দিয়েছিল। চোখ খুলে দেখলাম বাসস্ট্যান্ড পৌঁছে গেছি। বাসস্ট্যান্ড থেকে একটা রিকশা করে রাত ৯টায় স্টেশনে পৌঁছে গেলাম। আমাদের ট্রেন রাত ১০টায়। ঠিক সময়ে ট্রেন এল পরদিন সকাল ১১টায় বাড়ি পৌঁছে গেলাম।

আমি সেই অর্থে লেখক নই। যা দেখলাম, অনুভব করলাম তার সবটুকু মনে হয় লিখতে পারলাম না। মনের সেই না বলতে পারা অনুভূতিগুলো শুধু নিজের জন্যই রেখে দিলাম। জানি না আমার এই লেখা দ্বিতীয় কোনও ব্যক্তির দৃষ্টির গোচরে আসবে কি না বা তার মনকে ছুঁয়ে যাবে কিনা, তবে আমি নিশ্চিত 'গোপালপুর-অন-সি' তাকে নিরাশ করবে না। বকখালি থেকে শুরু করে কন্যাকুমারি থেকে গোয়া হয়ে বোম্বের জুহু অবধি যে কটা বিচ আমার দেখার সৌভাগ্য হয়েছে তার মধ্যে গোপালপুরের বিচ আমার মনে স্থায়ী জায়গা করে নিল।

পরিচিতি

শিক্ষকতার পাশাপাশি ভ্রমণের নেশা।
কলমে সে সব অভিজ্ঞতা বিনিময়।

কবে আমি বাহির হলেম

অম্বিকা বেজ

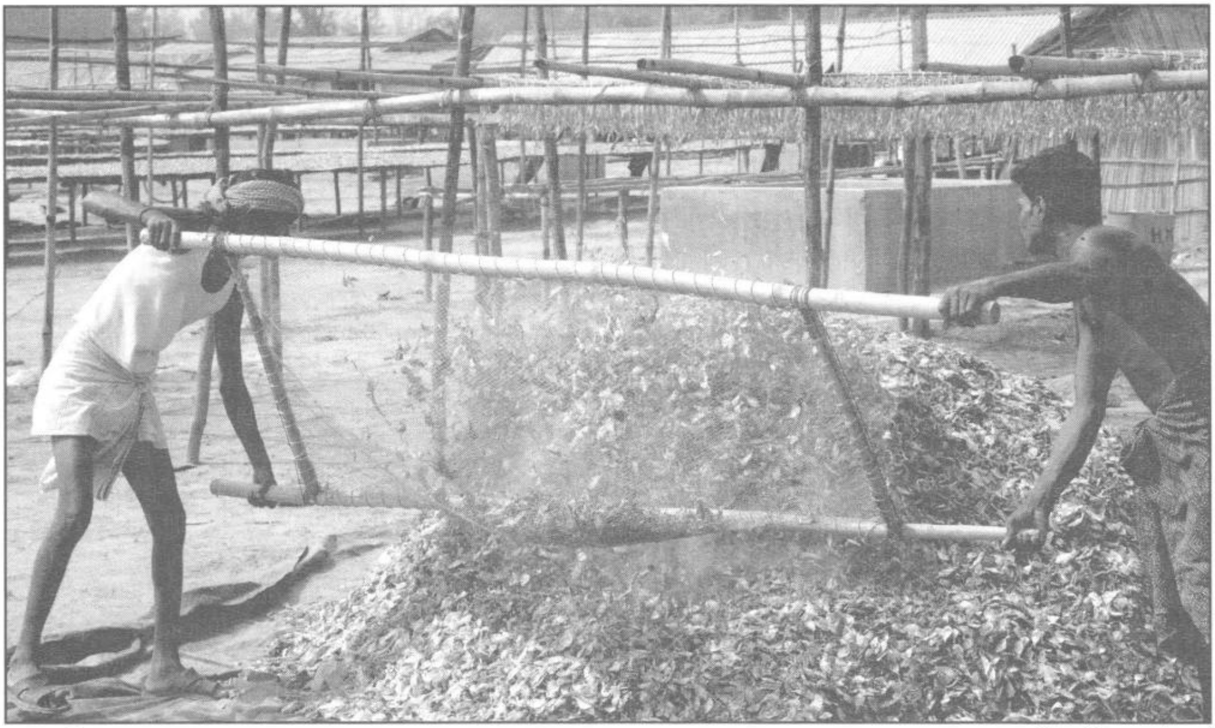

জেলেবস্তির রোজনামচা

ছবি- শক্তিপদ ভট্টাচার্য

ভদ্রেশ্বরের 'ভ্রমণ আড্ডা'-র ১১ জনের দল প্রথাগত ও চিরাচরিত পথ ছেড়ে অন্যপথে– 'কোস্টাল ট্রেক' অর্থাৎ সমুদ্র সৈকতের পাড় ধরে হাঁটা। উদ্দেশ্য সমুদ্রের সৌন্দর্য, তার শান্ত ও অশান্ত রূপ, সেখানকার পরিবেশ, উপকূলীয় গ্রাম্য মানুষদের জীবনযাত্রার প্রতি সম্যক ধারণা অর্জন।

আমাদের ট্রেকপথ উড়িষ্যার কোণারক থেকে চিলিকা, প্রায় ৯০ কিলোমিটার হাঁটা। এই প্রথম মা-বাবাকে ছেড়ে আমার বাইরে বেড়ানো। তাও আবার পায়ে হেঁটে। মনে একরাশ বিস্ময় মাখা আনন্দ। যেন "আমরা নূতন যৌবনের দূত"– কি যেন জয় করতে চলেছি। সঙ্গে আমাদের পরমপ্রিয় শ্রদ্ধেয় শক্তিদা আর রত্নাদি– আমাদের অভিভাবক।

যথাসময়ে ট্রেনে হাওড়া থেকে যাত্রা শুরু। পরদিন সকালে ভুবনেশ্বর। সময় নষ্ট নয়– একটু ফ্রেস হয়ে জলখাবার সেরে বাসে কোণারক। কোণারকের মন্দির দর্শন করে দুপুরের খাবার খেয়ে যাত্রা শুরু বহু কাঙ্ক্ষিত হাঁটা পথে। দলনেতা শক্তিদা তাঁর উপদেশগুলি পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিলেন। বাঁয়ে সমুদ্র, ডাইনে গভীর জঙ্গল। কোথাও কোথাও ছোটো ছোটো গ্রাম। মাঝখানে বিস্তীর্ণ বেলাভূমি, মাথার উপরে সূর্যদেব সঙ্গে শীতল বাতাস।

সমুদ্রের সে কী রূপ! আপন গরিমায় সে সজ্জিত। কখনও নীল, কখনও সবুজ, কখনওবা ধূসর রং তার অসীম জলরাশির। কখনও সে শান্ত, কখনও অশান্ত। ঢেউ-এর পর ঢেউ দিয়ে তটে যেন কী সব লিখে দিয়ে চলেছে চুপিচুপি। যেন মা বসুন্ধরার পবিত্র চরণ ধুয়ে দিয়ে যাচ্ছে। সেখানে কোলাহল নেই– সমুদ্রতটে পড়ে আছে নানাপ্রকার মৃত সামুদ্রিক প্রাণী, রং-বেরঙের ঝিনুক, শুকনো গাছের ডাল, আরও কত কী।

সবার পিঠে রুকস্যাক ও ম্যাট্রেস। আমরা কজন মনের আনন্দে গান-গল্প-খুনসুটি-হাসি আর হেঁটে চলার আনন্দে মেতে রয়েছি। টুকটাক খাওয়া তো লেগেই আছে। চন্দ্রভাগা বিচ ধরেই শুরু হয়েছে আমাদের হাঁটা। দেখতে দেখতে অনেকটা পথ পেরিয়ে এসেছি– ক্লান্ত সৈন্যদল। ঘেমে নেয়ে একসা। বিশ্রাম চাই। দলনেতা প্রতি দু থেকে তিন ঘণ্টা

অন্তর বিশ্রাম দিচ্ছেন সেও মাত্র ১০ থেকে ২০ মিনিটের জন্য।

হাঁটার পথেই প্রথম মিলল কুলভদ্রা নদীর মোহনা। সেটা পেরিয়েই রামচণ্ডীর গ্রাম। শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কা যাওয়ার পথে এখানে চণ্ডীপুজো করেছিলেন– এমনই জনশ্রুতি। এখানেই সেদিনের রাত্রিবাস। ইলেকট্রিক নেই– মোমবাতির আলোয় রান্না-খাওয়া। পরদিন ভোরে উঠে হাঁটা শুরু পুরীর উদ্দেশে। গাছের পাতায়, আকাশের গায়ে যেন ঘুমের আবেশ। পাখিদের কলতান, সূয্যিমামার খিল-খিলিয়ে হাসি– সবমিলিয়ে দারুণ এক আমেজ।

মোহনা পার হতে গ্রামবাসীদের পরামর্শ মতো গ্রামের পথ ধরেই এগোই। একটার পর একটা গ্রাম– থালকাটা পাটনা, নিরখিয়া। গ্রামের বাড়িগুলোর গায়ে অসাধারণ লতা-পাতা-ফুলের আলপনা। খুবই মনোরম। গ্রামবাসীদের থেকেই জানতে পারি এখান থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে বেলেশ্বর গ্রাম। তারপরই সমুদ্রতটের দেখা মিলবে। কিছুটা চলতে চলতেই হঠাৎ বুঝলাম আমরা পথ হারিয়েছি গভীর জঙ্গলে– হিংস্র বন্য জন্তুর আনাগোনাও অস্বাভাবিক নয়। খুব ভয়ে অতি সন্তর্পণে এদিক ওদিক চলতে চলতে প্রায় ৪০ মিনিট পর সঠিক পথের হদিস মিলল। সেই পথে হেঁটে অবশেষে চোখে পড়ল সমুদ্রতট। ধড়ে যেন প্রাণ এল। ব্যাস, মনে অদম্য সাহস অর্জন করে আবার এগিয়ে চলা। না জানি সামনের পথে আরও কী কী রোমাঞ্চকর বিপদ ওঁৎ পেতে আছে! মাঝেমধ্যেই আমরা মরীচিকাও দেখতে পেয়েছি। কিন্তু কোথায় বেলেশ্বর গ্রাম? শুধুই তো নির্জন সমুদ্রতট। এবার কিন্তু ভয়-ভয় লাগছে। অনতিদূরে কিছু মানুষের দেখা পেলাম। তাদের থেকেই জানতে পারি সমুদ্রতট থেকে খানিক ভেতরে গেলেই বেলেশ্বর গ্রাম। শ্রান্ত-ক্লান্ত শরীরে আমরা এগোতে থাকি। অবশেষে দেখা মিলল ঘন জঙ্গলে বহু পুরোনো এক মন্দির চত্বর। সেখানেই এলিয়ে দিলাম আমাদের অবসন্ন শরীর। কিছুক্ষণ পরেই মিলল প্রসাদ– চিঁড়ে-কলা-গুড়-গোলমরিচ আর সামান্য কর্পূর দিয়ে তৈরি এক মণ্ড। ক্ষুধার্ত আত্মা যেন শান্তি পেল। মনে হল স্বয়ং শিবই আমাদের অন্ন খাইয়ে গেলেন।

এবার আমাদের চলা পুরীর দিকে। সন্ধ্যা নাগাদ আমরা পুরীতে পৌঁছলাম। ইউ বি আই-এর জাহ্নবী নিবাসে আজকের থাকা। রাতে খাবার খেয়ে ক্লান্ত শরীরে সোজা বিছানায়।

পরদিন সকালে প্রাতরাশ সেরে পুরীর সমুদ্রসৈকতে ঘোরাফেরা। দুপুরের খাবার খেয়ে আবার আমাদের যাত্রা শুরু। এবার চিলিকা। ধীরে ধীরে জনবহুল সৈকত পিছনে ফেলে আবার আমরা নিরিবিলি সমুদ্রতটে। দলনেতা জানালেন রাতে সমুদ্র সৈকতেই থাকতে হবে। জঙ্গল থেকে কাঠ সংগ্রহ করে রান্না হবে। আর সারারাত আগুন জ্বেলে রাখা হবে। হিংস্র বন্য পশুদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার এটাই উপায়। রাতে দুজন করে পালা দিয়ে পাহারা দেবে। ওরে বাবা! কী রোমাঞ্চ! ভয়ে গা শিউরে উঠল। কিছুদূর এগিয়ে দেখি জেলেরা মাছ ধরতে যাবে তারই প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। তাদের কাছেই জানা গেল কাছেই হরচণ্ডী গ্রাম। খানিক এগোতেই চোখে পড়ল একটা ছাউনি। বহু অনুরোধে সেখানেই রাত্রে থাকার ব্যবস্থা হল। সেখানে জেলে প্রধানের কাছে শুনলাম খাবার জল আনতে হবে হরচণ্ডী গ্রামের ভেতর থেকে। দাদার কথা মতো দেরী না করে জলের বোতল নিয়েই বেড়িয়ে পড়লাম জলের উদ্দেশ্যে। চারিদিকে বড় বড় গাছ আর ঝোপঝাড়– তারই মাঝখান দিয়ে চলতে চলতে ভাগবী নদীর পাশে পৌঁছালাম। জল বেশি নেই– কোমর অবধি। নদীর ওপারেই হরচণ্ডী গ্রাম। নদী পেরোতেই দূরে ঘণ্টাধ্বনি কানে এল। জল আনতে গিয়ে জঙ্গলপথেই পড়ল এক প্রাচীন মন্দির। মন্দিরের মায়ের মুখমণ্ডল ভর্তি কয়েন আটকানো। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। দেখতে দেখতে ঝুপ করে অন্ধকার নেমে এল। সামনে কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। মনে সাহস আনতে আমরা সবাই মিলে গলা ছেড়ে গান ধরলাম। খানিক এগোতেই চোখে পড়ল কী যেন জ্বল জ্বল করছে। আমরা খুব ভয় পেয়ে গেলাম। পা চালালাম খুব জোরে। হঠাৎ একটা লণ্ঠন হাতে লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। শুনলাম জেলে প্রধানই নাকি তাকে পাঠিয়েছে আমাদের নিয়ে যেতে। আমরা হতবাক্– তার সঙ্গেই নিরাপদে ছাউনিতে পৌঁছলাম। সেখানেই পরমতৃপ্তির সঙ্গে রাতের খাবার খেলাম।

ছাউনিতে শুয়ে আছি। তারা ঝলমলে আকাশ। একদিকে ঘন জঙ্গল অপর পাশে দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্র। ঢেউ আছড়ে পড়ছে তটে। জলের সঙ্গে ফসফরাসের টুকরোগুলো এঁকে দিচ্ছে আলপনা। শান্তিতে চোখের পাতা এক করার উপায় নেই, ছাউনির পাশে শেয়ালের উপদ্রবে। কারণটা হল আমরা যে ম্যাট্রেস পেতে শুয়েছি তার নিচেই ছিল শুটকি মাছ। তারই লোভে ওরা নাকি রোজ আসে। কী রাজকীয় ব্যবস্থা প্রকৃতির কোলে!

ভোর হল। আজ আমাদের হাঁটা চিলিকার দিকে। জেলে প্রধানকে বিদায় জানিয়ে আমরা পথে নামি। পথ দেখাতে প্রসন্ন নামে একটা ছেলেকে আমাদের সঙ্গে দিয়ে পাঠালেন। অমায়িক ছেলে প্রসন্ন। ইংরেজি জানে ভালো মতো। পুরাণের গল্প কাহিনিও তার ভালো জানা। গল্প করতে করতে ওর সঙ্গে আমাদের হাঁটা। অল্পসময়েই ওর সঙ্গে বেশ হৃদ্যতা হয়ে গেল। যথাস্থানে পৌঁছে দিয়ে সে ফিরে যায়। যাবার সময় সে আর ফিরেও তাকায়নি। আমাদের মতো ওর মনটাও হয়তো বিষন্ন হয়েছিল।

মোহনা বরাবর হেঁটে চলেছি হরকাদা গ্রামের দিকে। অল্প জল, হাঁটু জল পেরিয়ে একটি নৌকো মিলল, তাতে চেপেই হরকাদা গ্রামে এলাম। ৫০-৬০ জনের বসতি। মহাজনের নৌকায় ওরা মাছ ধরতে যায়। বছরে ৬ মাস ওদের এই কাজ। এবার মোটরবোটে সাতপাড়া, ডলফিন হাউস দেখে নলবন পাখিরালয়। সেখান থেকে কালিজয় মন্দির ঘুরে আমরা ভুবনেশ্বরের পথে। আমাদের ট্রেক শেষ হল। সকলেরই মন খারাপ। এই কদিনের একসঙ্গে থাকা-খাওয়া-সমস্ত বাধা বিপত্তিকে একসঙ্গে মোকাবিলা করা– অসাধারণ অভিজ্ঞতার সাক্ষী হয়ে রইলাম।

ভুবনেশ্বর থেকে হাওড়া ট্রেন। হাওড়া থেকে যে যার ঘরে ফেরা। বড্ড কষ্ট হচ্ছিল সকলের। চোখের জলে সকলকে বিদায় জানিয়ে ঘরে ফিরি।

পরিচিতি

সঙ্গীত নিয়ে পড়াশুনা, বেড়ানো ভালোলাগা।
লেখালেখিতে প্রথম প্রয়াস।

তালে তালে চন্দ্রতাল

নন্দিনী দাস

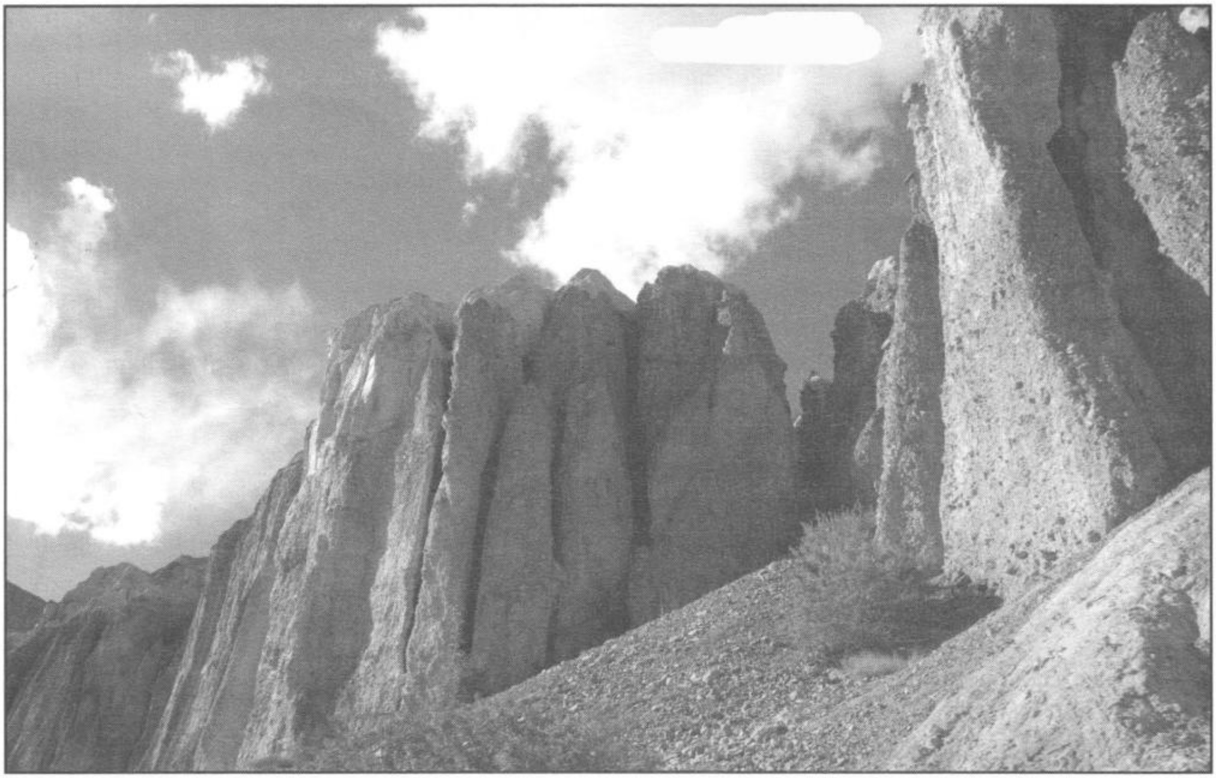

প্রকৃতির আপন খেয়ালে

ছবি-শর্মালী দাস

জনৈক ভূ-পর্যটক এবং চিত্রশিল্পীদের মতে সারা বিশ্বে নেচার ফটোগ্রাফির শ্রেষ্ঠ রসদ পাওয়া যায় ভারতবর্ষের স্পিতি উপত্যকায়। সেই টানেই বেরিয়ে পড়া ২০১৪-র শরতের মধ্যপর্বে।

১৪ সেপ্টেম্বর, সিমলাস্থিত এক ট্যুর কোম্পানি থেকে থাকা-খাওয়া এবং গাড়ির বন্দোবস্ত করে বেরিয়ে পড়লাম মানালির উদ্দেশে। পথে বৃষ্টি, শুধুই বৃষ্টি। সিমলা থেকে মানালির রাস্তায় মেঘবৃষ্টির বহর দেখে সঙ্গী ফটোগ্রাফারের মুখ ব্যাজার, মন ভারাক্রান্ত। যদিও সদাহাস্যময় গাড়িচালকের অভয়বাণী, 'স্পিতিতে দেখবেন সাফসুরত আকাশ'। যাইহোক প্রথমদিন প্রায় পর্যটকশূন্য মানালিতে রাত কাটিয়ে পরদিন সকালে গাড়ি ছুটল রোটাংয়ের দিকে। কিছুদূর এগোতেই কোঠির পর থেকেই কী সুন্দর আকাশ! অসাধারণ শৃঙ্গ, নির্মল বাতাস। দূরের পাহাড়ের তৃণভূমিতে বিচরণরত ভেড়াগুলোকে দেখে মনে হচ্ছে সবুজ পাহাড়ের গায়ে যেন সাদা গন্ধরাজের ফুল ফুটে আছে। মারি পৌঁছলাম ৯টায়। চারবছর আগে ভিড় আর ভিড়ই দেখেছিলাম এখানে মে মাসে। এখন মাত্র দুটো গাড়ি। প্রাতরাশ সেরে গাড়ি চলল। ক্রমে রোটাং, গ্রামফু ছাড়ল। তারপর এল স্পিতি হাইওয়ে। ঝাঁকুনির চোটে, মাথা ঠেকছে গাড়ির ছাদে। ড্রাইভারজি বললেন, সবে শুরু সামনে আরও খারাপ পথ এবং যে কদিন থাকব এই পথের পাথরই নিত্যসঙ্গী হবে। সরু রাস্তা, বোল্ডারময় পথ, মাঝে মাঝে বরফগলা ঝরনা। অনেক নীচে চন্দ্র নদী। দৃশ্যাবলী অসামান্য সুন্দর। দুর্গমতার দিকে তাকিয়ে লাভ কী? নাচতে নাচতে গাড়ি ক্রমাগত নামতে লাগল, শেষে ১২টা নাগাদ একদম চন্দ্রনদীর পাড়ে। সেখানে কিছু দোকান আছে। ট্রেকারদেরও দেখা যাচ্ছে, কেউ কেউ চন্দ্রনদীর পাড়ে টেন্ট ফেলেছে। এবারে পাহাড়গুলো বৈচিত্র দেখাতে শুরু করেছে। এক একটা পাহাড়ের পাথর এক এক রঙের। কোনওটা স্লেট রং, কোনওটা বাদামি, কোনওটা লালচে তো কোনওটা সাদা। পাশদিয়ে বয়ে চলেছে নীলবর্ণ চন্দ্রা নদী। তার তীরভূমিতে বহুবর্ণ

পাথর সারি সারি অগুনতি। নীল আকাশের প্রাকৃতিক ক্যানভাস। ফটোগ্রাফারের মন খুশ। সামনে বাতাল, ট্র্যাভেল এজেন্সির রসিদ মোতাবেক ওখানেই আজ থাকা এবং খাওয়ার বন্দোবস্ত। বাতাল পৌঁছলাম দুটোয়। ভাবছিলাম চারদিকে তো শুধু পাথর আর জল, খাবার কি মিলবে? যাইহোক বাতাল এল। কি আশ্চর্য বাতালের ছোট্ট ধাবায় থাকার বন্দোবস্ত নেই। কোনওরকমে চাল-ডাল-ভাজি মেলে, আমরা রসিদ দেখালাম। ওরা বলল, আমরা কোনও নির্দেশ পাইনি সিমলা থেকে এবং এখানে মোবাইল টাওয়ার পাওয়া যায় না। অথচ রসিদে লেখা খাওয়া এবং থাকাসহ প্যাকেজের কথা। বুঝলাম ছোটো করে ধোঁকা খেয়েছি। যাইহোক, এখন থাকার বন্দোবস্ত কোথায় করব? এই চিন্তায় মন আকুল। ড্রাইভারজি বললেন, চন্দ্রতাল চলুন, ওখানে টেন্ট আছে। চললাম তাই। এবার গাড়ি আরও সরু এবং ধ্বসপ্রবণ রাস্তা দিয়ে উঠতে শুরু করল পাক খেতে খেতে। কী সরু রাস্তা, সত্যিই একটা গাড়ির বেশি দুটোর জায়গা নেই। ওরা অনেক দূর থেকে দেখে উল্টোদিকের গাড়ি এলে কোনও মোড়ে দাঁড়ায়। তাও তো সরু। খুবই ভয় করছিল, কিন্তু এই ২৫ মিনিটের রাস্তায় আমাদের সামনে উল্টোদিক থেকে কোনও গাড়ি আসেনি ভাগ্যিস। যাইহোক, কিছুক্ষণ পরে টেন্টে পৌঁছলাম।

টেন্টটা একটা ভ্যালি মতো জায়গায়। চারপাশে সুউচ্চ শৃঙ্গ, বরফাবৃত। টেন্টের মালিক খুবই সেবাপরায়ণ। যেতেই সঙ্গে সঙ্গে রেস্ট নিতে বললেন, জোরে কথা বলতে বারণ করলেন। তারপর গরম চা আর ম্যাগি করে দিলেন। খুবই আন্তরিক আতিথেয়তা। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নামল, অন্ধকার হল। রাত্তিরে তাড়াতাড়ি ডিনার করতে হবে। তাপমাত্রা হু হু করে নেমে যাচ্ছে, হাওয়াও দিচ্ছে জোরে জোরে। বিকেল চারটেয় যখন টেন্টে ঢুকেছিলাম তখন এত গরম লাগছিল যে বেরিয়ে এসেছিলাম, আর এখন টেন্ট থেকে বেরোতেই পারছি না। পাশের বড়ো টেন্টে ডিনারের বন্দোবস্ত। কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে চাপাটি আর ডিমকারি খেলাম খুব তৃপ্তি করে। কিছুক্ষণ আগুন পোহালাম আর শুনতে লাগলাম চন্দ্রতালের কথা। এখানে পাহাড়ে নাকি ক্লাউডেড লেপার্ড আছে। ১৫ অক্টোবরের পর যখন সবাই টেন্ট তুলে সমতলে চলে যায়, তখন ওরা এখানেও ঘোরাফেরা করে। কবে বাতালে ধ্বস নেমে পর্যটক মারা গেছিল, সেসব গল্পও হচ্ছিল। গল্প করতে করতে রাত হল। আবার পাশের টেন্টে যেতে হবে, প্রাকৃতিক কর্মও করতে হবে। ভীষণ ঠান্ডা, ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে বাইরে এলাম। কিন্তু এ কী হেরিলাম, টেন্টের পিছনে দেখি অমাবস্যার নিকষ কালো আকাশ আর এক ঝাঁক তারা, আর বরফের চূড়াগুলো ওই কালো আকাশের তলে দৃপ্ত ভঙ্গিমায় জ্বলজ্বল করছে। কী সুন্দর, মনে হচ্ছে চূড়াগুলো যেন শ্বেতমার্বেল দিয়ে তৈরি। মন, হৃদয় ভরে গেল, অমাবস্যায় না এলে এ দৃশ্য বোধকরি দেখা যেত না। যাইহোক, ঠান্ডার তাড়নায় আবার আমাদের সুন্দর ছোট্ট নতুন টেন্টে ঢুকলাম। সারারাত এত ঠান্ডা যে টেন্টের মধ্যেও কেঁপে কেঁপে উঠছি।

ভোরবেলায় দেখি টেন্টের গায়ে বরফ টুকরো ছড়ানো। সকাল আটটায় বেড়িয়ে পৌঁছলাম চন্দ্রতাল, চন্দ্র নদীর উৎস। কী অসাধারণ সৌন্দর্য্য, চারদিকে বরফাবৃত শৃঙ্গ এবং তালের মধ্যে তার প্রতিচ্ছবি। অপার্থিব পরিবেশ। সকাল ১০টার মধ্যেই এত পরিষ্কার প্রতিচ্ছবি দেখা যায় যে চুপ করে ধ্যানগম্ভীর পাহাড় ও চন্দ্রতালের সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করতে করতে কখন যে দু'ঘণ্টা কেটে গেল বুঝতেই পারলাম না। ড্রাইভারজির আহ্বানে আমরা এরপর রওনা হলাম কাজার উদ্দেশে। যেতে যেতে পাহাড়ের গায়ে অসাধারণ খাঁজ দেখে মুগ্ধ হলাম। শুনেছিলাম স্পিতি উপত্যকা হল প্রাকৃতিক স্থাপত্যের সেরা নিদর্শন। চাক্ষুষ করে পরিতৃপ্ত হলাম। কাজা পৌঁছলাম বিকেলে। কাজা থেকে আমরা কি-গুম্ফা, কিব্বের ভিলেজ (এশিয়ার উচ্চতম গ্রাম), তাবো এবং ধাংকার মনাস্ট্রি দেখেছিলাম। ধাংকার বড়োই মনোমুগ্ধকর, দেখলে মনে হয় একটা হাওয়া দিলেই বোধহয় পুরোটা গুঁড়িয়ে পাহাড়ের নিচে তলিয়ে যাবে। অথচ ওটাই নাকি সবচেয়ে প্রাচীন বৌদ্ধ গুম্ফা। পরদিন মানালির দিকে ফিরতে হবে। মন ভারাক্রান্ত। পর্বতগাত্রের এবং শৃঙ্গের অপূর্ব দৃশ্য, সুন্দর নদী, ফুল, নির্মল আকাশ আর হাসিখুশি মানুষজন, স্পিতি উপত্যকা ছেড়ে যেতে মন চায় না। তবু ফিরতে হয়। কিন্তু স্মৃতি রয়ে যাবে আজীবন।

ছবি- ছবির পাতা-১

পরিচিতি

ভ্রামণিক। কেন্দ্র সরকারি সংস্থায় কর্মরতা। লেখালেখিতে উৎসাহী।

প্রসঙ্গ ভ্রমণ

বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে ভারতই প্রথম দেশ যে ইউরোপে পর্যটন দপ্তর খোলে। আর ওই দশকের গোড়াতে পশ্চিমবঙ্গেই ভারতের মধ্যে প্রথম ট্যুরিস্ট ব্যুরো গঠিত হয়।

সতোপন্থ তাল

শর্মালী দাস

সতোপন্থের পথে ছবি- লেখক

স্থানঃ বদরিকাশ্রম বা বদ্রীনাথ ধাম।
নদীঃ অলকানন্দা, যেন পাহাড়িয়া রাজকন্যে। ছলাৎ-ছলাৎ শব্দে অবিরাম তার বয়ে চলা। এই প্রবাহের শান্তি নেই, শ্রান্তি নেই। তাই তো যুগযুগান্ত ধরে হাজার-হাজার ভ্রমণপিপাসু-পুণ্যার্জনকামী মানুষের প্রবাহের অবিরাম চলারও কোনও শ্রান্তি নেই। শুধু একটুকু শান্তির খোঁজ। তার কাছে বার বার ফিরে ফিরে আসা। কিংবদন্তী এই যে, পাপী-তাপী মানুষ মনে-মনে বদ্রীনাথধামের কথা চিন্তা করলেই মুক্তি লাভ করে। কথিত আছে যে অন্য তীর্থে তপস্যায় যে ফল লাভ হয়, বদ্রীনাথ যাত্রার কথা ভাবলেই তার সমতুল্য ফল পাওয়া যায়।

পরিচিত পাঁচজন সতোপন্থ তাল যাবে শুনে আমিও তাদের লেজুড় হয়ে যাই। সালটা ২০১১। এ যেন ধার্মিক-অধার্মিকের মেলবন্ধন—প্রথমটায় এরকমই আমার ধারণা হয়েছিল।

সভ্যতার যত অগ্রগতি হয় ততই দুর্গমতার পশ্চাদপসরণ হয়। সেই হিসাবে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিতে বাসযোগে একই দিনে হরিদ্বার থেকে বদ্রীনাথ পৌঁছে যাওয়া যায়। উচ্চতা কমবেশি ১০,০০০ ফুটের কাছাকাছি। ছোটো শহর। বাস থেকে নেমে মন্দিরে পৌঁছতে ১০ মিনিটও লাগে না। যাত্রীর আনাগোনা বৃদ্ধির সাথে সাথে পাল্লা দিয়ে দোকানপাটও বেড়েছে। নদীর এপার-ওপার মিলিয়ে বেশ কিছু রেস্টুরেন্ট—হরেক জিনিস বিকিকিনির পসরা—সরকারি দপ্তর—ধর্মীয় জিনিসপত্রের দোকান। একটি লোহার পুলের উপর দিয়ে অলকানন্দাকে পারাপার করা যায়।

প্রথমেই তপ্তকুণ্ডে স্নান। শীতকে বুড়ো আঙুল দেখিয়েই। তপ্তকুণ্ডের জলে সারাদিনের পথচলার ক্লান্তি ধুয়ে বদরীবিশালজীকে দর্শন। রাতেই। তখনও কত মানুষ সাধু-গৃহী নির্বিশেষে অবিরাম

মন্দির প্রদক্ষিণ করছে। তবে উদ্দেশ্য ভিন্ন। সাধু অপার্থিব কিছু লাভের আশায় আর গৃহী পার্থিব ইচ্ছা চরিতার্থ করার আশায়। কিন্তু দুজনের ইচ্ছাই ত্রিভুজের একটি শীর্ষ বিন্দুতে বদরীনাথজীর চরণে সমর্পিত হচ্ছে। এটাই আমাদের ভারতবর্ষ। এখানে বিশ্বাসকে ভর করে হাসিমুখে ক্লেশ সহ্য করা হয়।

অলকানন্দার দুই তীরে দুই পর্বতশ্রেণী। বামে নর ডাইনে নারায়ণ পর্বত। নারায়ণ পর্বতের কোলে বদ্রীনাথ মন্দিরকে ঘিরে শহর গড়ে উঠেছে। নারায়ণ পর্বতের পিছনে গগনচুম্বী নীলকণ্ঠ পর্বত– চিরতুষারাবৃত। নদীর অপর পার থেকে এর অনুপম শোভা নজরে আসে। নাম তার নীলকণ্ঠ যে, চারিদিকে অমল-ধবল তুষারের মাঝে কণ্ঠদেশে খানিকটা কালো দাগ। যুক্তিবাদী মন বলে পাথরের মসৃণ অংশে বরফ স্থায়ী হয় না, নীচে নেমে আসে। কিন্তু সনাতন ভারতবাসী নীলকণ্ঠ নামের এহেন সার্থকতা দেখে বিমোহিত হয়। কথিত আছে, ঋষি নর-নারায়ণ দুই ভাই গৃহত্যাগ করে বদরীভূমিতে তপস্যায় বসেন। এই দুই ঋষিবর গৃহত্যাগের সময় মাকে প্রতিশ্রুতি দেন যে মাঝে মাঝে সংবাদ দেবেন। কিন্তু মাঝের দীর্ঘ বিরতিতে মা বিচলিত হয়ে খুঁজতে খুঁজতে নর-নারায়ণের তপস্যা ক্ষেত্রে উপস্থিত হন। মাকে দেখে দুই ভাই ভাবে যে মা তাদেরকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। তাই তাঁরা দুটি পর্বতের আকার ধারণ করে অলকানন্দার দুই তীরে অবস্থান করে। কিন্তু পরে মায়ের দুঃখ দেখে ঋষি নারায়ণ মাকে বদরিকাশ্রমে থাকার অনুমতি দেন। সেই থেকে দুই ঋষিবরের মাতা নির্জন প্রান্তরে মানা গ্রাম যেখানে প্রায় শেষ হয়েছে, তার উল্টোদিকে মন্দিরে একাকী অধিষ্ঠান করছেন। যেখানে বদরীনারায়ণের মন্দিরে প্রত্যহ বিশাল ভক্ত সমাগম হয়, নিত্য পূজা ও ভোগ হয় সেখানে মাতা মন্দিরে বছরে একদিন বামন দ্বাদশীর দিন পূজা হয়, মাতা-পুত্রের মিলন হয়। মা বলেই বোধহয় এত সহ্য করতে পারেন।

পরদিন বদ্রীনাথে থাকার পরিকল্পনা। পাহাড়ের উচ্চতার সাথে নিজেদের ধাতস্থ করে নেওয়া। সময়টা ইংরেজি আগস্ট মাসের মাঝামাঝি। লাগাতার বৃষ্টি। মনে দ্বিধা জাগে আমাদের উদ্দেশ্য সফল হবে তো! চারদিন আমরা আটকে রয়েছি। এদিকে প্রত্যেকেরই নিজ নিজ কাজের হাজিরা খাতায় সই করার সময়সীমা ক্রমে কমে আসছে। পঞ্চমদিন বৃষ্টি নিজেকে একটু লাগাম পরাতেই সকাল সকাল বেরিয়ে পাহাড়ি বন্ধুদের খুঁজে ধরে আনা হয়। লটবহর সমেত রওনা দিই। পুল পার করে অলকানন্দাকে ডান দিকে রেখে অর্থাৎ বদরীনারায়ণ মন্দিরের অবস্থান যে দিকে সেই দিক দিয়ে আমরা যাত্রা শুরু করি। পাহাড়ের পাদদেশে প্রশস্ত সমতলক্ষেত্র। চাষ-আবাদ হয়। পাথরের উপর পাথর সাজিয়ে পাঁচিল দেওয়া। দুই দিকে পাথর-পাঁচিলের মাঝে সিমেন্ট বাঁধানো স্বল্প পরিসরের রাস্তা। এই রাস্তা এঁকে বেঁকে সর্পিল গতিতে গেছে যেন মনে হয় পাহাড়ি গলি। কিছুদূর গিয়ে এই পথের শেষ। বর্ষায় কর্দমাক্ত পথ পিছল। বৃষ্টিতে কোথাও কোথাও সমভূমি ধ্বসে অলকানন্দার দিকে ধুয়ে নেমে গেছে। দিয়ে গিয়েছে বিপজ্জনক পিচ্ছিলতা। এই উৎরাই নামার সময় হাতের কাছে যা পাই, গাছের মরা ডাল, কাঁটা ঝোপ, গাছের গুঁড়ি এমনকি তৃণদল– সবকিছুকেই খড়-কুটার মতো আঁকড়ে ধরি, নিজের পতন রোধ করি। একসময় এই রাস্তাও শেষ হয়। সামনে তখন নুড়ি-পাথর-বালির চড়াই। উল্টো দিকে অলকানন্দার শুকনো– জমাট বরফ। এই নুড়ি-পাথরের চড়াইয়ে কোথাও পা দিয়ে দাঁড়ানো যায় না। চলাই মূলমন্ত্র। চরৈবেতি। সর্বদা হাল্কা পা ফেলে শরীরকে বাতাসে ভাসিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয় দ্রুত। না হলেই পা হড়কাবার ভয়। চরৈবেতি কথার মানে এখানে এসে হাড়ে-হাড়ে উপলব্ধি করলাম। কিছুটা গিয়েই ঘাড় ঘুরিয়ে নিজের উচ্চতা পরখ করতে যাই। তখনই অনুশাসনের সুরে পাহাড়িয়া সাথী নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে চলতে বলে। পিছনে দেখতে নিষেধ করে। তাহলেই নাকি গন্তব্যে পৌঁছে যাওয়া যাবে অনায়াসে। এই কথাটার মানে পরেরদিন মর্মে-মর্মে উপলব্ধি করি। আর মনে মনে ভাবি এইসব আনপড় লোকেরা জীবনের এত গূঢ় তত্ত্ব কি অনায়াসে বুঝতে পারে, বলতে পারে, অপরকে শেখাতে পারে, নিজের জীবন শৈলীতে প্রয়োগ করতে পারে। তাদের কাছে বর্তমানটাই সত্য। সঞ্চয়ের প্রবণতা কম, দিন আনে–দিন খায়। অসুখ হলে চিকিৎসার পয়সা নেই, পরিবারের ভরণপোষণেরও পয়সা নেই। তাদের কাছে দিন-দিন প্রতিদিন। এইভাবে জীবনটাকে সরল বিশ্বাসে কাটিয়ে দেয়। 'নিজের পায়ের দিকে তাকাও'– এটা শুধু বিপদসঙ্কুল পাহাড়ে চলার মন্ত্র নয়, জীবন দর্শনও বটে। এই বিশ্বাসের তরণিতে চড়ে জীবনের বৈতরণী পেরিয়ে যায়। শেখে কোথা থেকে? উত্তর– পাহাড় থেকে। আমরা ছয়জনাও শিখি। চারজন পাহাড়িয়া বন্ধুর সাহায্যে ভঙ্গুর স্থান পেরোনোর বিদ্যাটা আমরা আয়ত্তে এনে ফেলি। বালি-মাটি-পাথরের মিশ্রণে পায়ের চাপে একটুখানি নির্ভরযোগ্য জায়গা তৈরি করে শরীরের ভারসাম্য বজায় রেখে এগিয়ে চলা। আতসকাচের নিচে অতিবাহিত জীবনকে কাটাছেঁড়া করলে তো এটাই দেখা যায়, যে মানুষ জীবনচর্চায় যত ভারসাম্য রেখেছেন সে তত সফল।

পিছনে ছেড়ে এসেছি চাম্‌তোলি। চাম্‌তোলিতে কিছুটা সমভূমি ও একটি গুহা আছে। কিন্তু প্রথমদিনের যাত্রা লক্ষ্মীবনে শেষ করা হয়। বদ্রীনাথ থেকে সাড়ে সাত কিলোমিটার দূর। পাহাড়ের কোলে প্রসারিত সমভূমি। কথিত আছে লক্ষ্মীদেবী এখানে সাধনা করেছিলেন। প্রমাণ কিছু নেই কিন্তু বেশ কিছু গাছের উপস্থিতি জায়গাটাকে বেশ মনোরম করেছে। লক্ষ্মীবন আসতে প্রাথমিক চড়াইটুকু ছাড়া মোটের উপর সমতল ভূমিকে অতিক্রম করতে হয়। চড়াই ভাঙার পর একটি ঝরনার সাথে দেখা হয়। পাহাড়ের উঁচু গা থেকে ফেনিল জলরাশি নিয়ে ঝাঁপিয়ে নিচে পড়ছে। সকালের দিকে এর চেহারা সাধারণ গোছের। কিন্তু বিকেল বেলায় এই সাদামাটা চেহারাটা কতটা যে ভয়ঙ্কর হতে পারে তা ফেরার পথে বোঝা গেছে। ঝরনা বরাবর আড়াআড়ি কিছু উঁচু পাথর ফেলা আছে। সেগুলিতে পা দিয়ে লাফিয়ে সহজ ছন্দে ঝরনা পেরিয়ে যাওয়া যায়।

রান্নার দায়িত্বে যে আছে সে সবার আগে এসে রান্নার ব্যবস্থা করে। তিনজন দিন-দিন থাকতে এখানে পৌঁছে যাই। আশপাশটা হেঁটে ঘুরে দেখতে থাকি। এখানেও গুহা আছে। হঠাৎ ঠান্ডা কনকনে হাওয়ার

সাথে ছিটেফোঁটা বৃষ্টি শুরু হয়। অগত্যা গুহাতে আশ্রয় নিতে হল। নিকষ কালো, সোজা হয়ে দাঁড়ানো যায় না, হামাগুড়ি দিয়ে গিয়ে মাটিতেই টান টান, জোব্বা পরা অবস্থায়। সবার শেষে সন্ধ্যার মুখে বাকি দুজন সদস্য তাঁবু নিয়ে পৌছলো। লক্ষ্মীবনে তাঁবু টাঙিয়ে থাকা-খাবার ব্যবস্থা হয়। সন্ধ্যা একটু ঘন হতেই খেয়ে দেয়ে স্লিপিং ব্যাগের ভিতর।

পরদিন সকালবেলা চারিদিক চনমনে রোদ্দুরে ভরে যায়। দলের এক সদ্য একটা উঁচু পাথরের উপর বসে গীতা পাঠ করে। এক অনির্বচনীয় পরিবেশ তৈরি হয়। তাঁবু গোটানো, রান্না করা, নিজেদের তৈরি করা– সবই দ্রুত লয়ে চলতে থাকে। অবশেষে দ্বিতীয় দিনের যাত্রা শুরু হয়। বদ্রীনাথ মন্দিরের পিছনে নারায়ণ পর্বত ও নীলকণ্ঠ পাহাড় দেখা যায়। আর এখানে সেই সব পাহাড়ের পাশ দিয়ে যেতে হয়। নীচে হিমবাহ আর উপরে বড়ো বড়ো পাথর। নানা আকারের, বিচিত্র বর্ণের কিন্তু অনুজ্জ্বল। সারাবছর বরফের তলায় থাকে, তাই। আমরাও এ পাথর থেকে ওই পাথরে লাফিয়ে পার হই। যেখানে কুয়াশা-মেঘ হাত ধরাধরি করে বিশালবপু গিরিশ্রেণীকে ঝাপসা করে দেয় সেখানেই মনুষ্যেতর প্রাণীদের কী অনায়াস গমন।

এবার শুরু হয় শিরদাঁড়া পথ, (রেজর) এড রিজ, মানুষের শিরদাঁড়া নয়। কোনও বিশাল জন্তুর শিরদাঁড়ার দুই দিকে যেমন ঢালু হয়ে নেমে গেছে শরীর, এপথও তেমনি। মাঝখানে সরু পথ, দুইদিকে গভীর খাদ। পাথরের এবড়ো খেবড়ো পথ। এ যেন হাঁটুর শক্তি পরীক্ষা। শুধুমাত্র নিজের পা-টুকুর দিকে নজর দিয়ে চলা, আশপাশের সৌন্দর্য উপভোগ করা যায় না, পাছে পড়ে যাই। এই একাগ্রতা অর্জুনের অস্ত্র-শিক্ষার, শুধুমাত্র পাখির চোখ দেখার একাগ্রতা। চারিদিকে আকাশছোঁয়া শুভ্র পর্বতশ্রেণী তার সৌম্য মূর্তি নিয়ে বিরাজমান। এ যেন অনন্তকে উপলব্ধি করা। এপথ দিয়ে যুধিষ্ঠির মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করেছিলেন।

বিকেলে এসে পৌছলাম চক্রতীর্থে। আমরা তিনজন। পিছনে আছে দুজন। একজন তাঁবু নিয়ে সতোপন্থ তালের দিকে এগিয়ে গেছে। আজ শুধুমাত্র পাঁচকিলোমিটার পথ অতিক্রম করেছি। বাকি আছে তিন কিলোমিটার, সতোপন্থ তাল পর্যন্ত। আমরা তিনজন দ্বিধান্বিত– এগিয়ে সামনের জনকে ধরব না পিছনের দুজনের জন্য অপেক্ষা করব। তারই মধ্যে রাতে থাকার জন্য একটা গুহা খুঁজে রাখা হল। খাবার বানাবার জন্য একটা টিনের কৌটো খুঁজে রাখা, আগুন ধরাবার জন্য মরা ঝোপঝাড় সংগ্রহ করা– সবই করা হল। কৌটোর চেহারা দেখে দু-একজন প্রশ্ন তোলে কৌটোর অতীত নিয়ে, অতীতে ব্যবহার নিয়ে। কিন্তু আমরা নাচার। পরিস্থিতি আমাদের স্বাভাবিক অনুভূতিগুলো ভোঁতা করে দিয়েছে। ইতিমধ্যে পিছিয়ে পড়া দুজন এসে পড়েছে। সন্ধ্যা সমাগত। আমরা সবাই এগিয়ে যেতে চাই। কিন্তু আমাদের সাথে যে পাহাড়িয়া সাথীরা আছে তাঁরা তীব্র আপত্তি জানায়। আপত্তির কারণ পরদিন সকালবেলা ওই পথ পেরোবার সময় টের পাই। যে সদস্য এগিয়ে গেছে তার কাছে তাঁবু আছে, রান্নার সরঞ্জাম আছে কিন্তু শীতবস্ত্র নেই। আমাদের কাছে তাঁবু নেই কিন্তু গুহা আছে। শীতবস্ত্রের অভাবে সারারাত সে সতোপন্থ তালের ধারে হাড়-কাঁপানো শীত সহ্য করে। চক্রতীর্থ থেকে একটা চড়াই দেখা যায়। তার ওপারে কী আছে দেখা যায় না। কিন্তু আসল রহস্য তো ওপারেই। জমাট বাঁধা বরফের উপর বড়ো বড়ো পাথর পড়ে আছে। পায়ের চাপে কোথাও পাথর বসে যায়, ধ্বসে যায়। পাথর পাল্টে পা রাখতে হয়।

চক্রতীর্থ নামের পৌরাণিক কাহিনী হল নারায়ণ যখন তপস্যায় বসেন তখন এইখানে তাঁর সুদর্শন চক্রটি রেখেছিলেন।

পরদিন সকালবেলা রওনা দিয়ে দশটার মধ্যে তিন কিলোমিটার অতিক্রম করে তালে পৌছে যাই। পথমধ্যে বিকট আওয়াজ। সর্বাঙ্গ কেঁপে ওঠে। আসলে দূরে নীলকণ্ঠ পাহাড়ের গা থেকে বরফের চাঁই ভেঙে পড়ছে– অ্যাভলাঞ্চ। চারিদিক বাষ্পে ধোঁয়ার মতো ঢেকে যায়। সাদা বরফের স্তূপ তড়িৎ গতিতে পাথরে ধাক্কা খেতে খেতে নিচে নেমে আসে। আর অন্য পারের পাহাড়গুলো শব্দ লোফালুফি করে প্রতিধ্বনি তোলে। নিরাপদ দূরত্ব থেকে প্রকৃতির এই রূপ-বদল মনে ভীতির সঞ্চার করে না। কিন্তু ভাবি সেইসব অভিযাত্রীদের কথা যারা এই ধরণের তুষারধ্বসের মধ্যে পড়ে জীবন বিপন্ন করে। বাঁচার আপ্রাণ চেষ্টা করে।

সম্মুখের চড়াই শেষ চড়াই জেনে আমরা প্রফুল্ল চিত্তে উঠে যাই। নিচে দেখা যায় পান্না সবুজ সতোপন্থ তাল। উচ্চতা মোটামুটি সাড়ে ১৪,০০০ ফুট। ত্রিকোণ আকার। চারিদিকে তুষার-প্রাচীর। তারই প্রতিবিম্ব জলে। স্বচ্ছ স্থির-জল। উপরে সুনীল আকাশ। শোনা যায় তালের তিনদিকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের অধিষ্ঠান।

দুর্গম পথের ক্লান্তি নিমেষে উধাও। নির্বাক আমরা, নির্নিমেষ আমরা।

আশেপাশে দুয়েকটা গুহার অস্তিত্ব আছে। আমাদের পাহাড়িয়া সাথীরা ওই গুহাতেই রাত কাটায়। মানা ইত্যাদি গ্রামের অধিবাসীরা মৃতের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করতে সতোপন্থ তালে আসে। সামনে দূরে স্বর্গারোহিণী পর্বত দেখা যায়। ওই পর্যন্তই, যাওয়া হয় না।

এবার ফেরার পালা। পরের দিন সকাল সাড়ে আটটায় আমরা রওনা হই। যে সদস্যের উপর রান্নার দায়িত্ব সে সবার আগে, মাঝে আমি আর পিছনে বাকি চারজন। প্রত্যেকের সাথেই এক বা একাধিক পাহাড়িয়া সাথী রয়েছে। সতোপন্থ তাল থেকে রওনা দেবার পর আমাদের পরস্পরের সাথে আর দেখা হয়নি। প্রথমজন লক্ষ্মীবনে পৌছে সকলের জন্য খাবার ব্যবস্থা করে এগিয়ে যায়। চক্রতীর্থ পৌছবার আগে হিমবাহ-পাথুরে উঁচু নিচু অঞ্চলে আমি পিপাসার্ত। এক পা-ও এগোতে পারছি না। আমার কাছে জল নেই। আমার সাথীকে আমার টুপিটা দূরে যে জলের রেখা দেখা যাচ্ছে সেখান থেকে ভিজিয়ে আনতে বলি পিপাসা মেটাবো বলে। কিন্তু সে রাজি হয় না। চোখে-মুখে ভয়ার্ত ভাব। নিজের ওই সঙ্কটময় অবস্থাতেও বুঝতে পারি যে দিকে জলের চিহ্ন আছে সেই দিকটা কতটা ভয়ানক। ওর নিজের জলের কিছুটা অংশ আমাকে দেয় এবং আমি ছন্দে ফিরি। তারপর ক্রমান্বয়ে উতরাই। চক্রতীর্থ-শিরদাঁড়া পথ পেরিয়ে

লক্ষ্মীবন আসি। তখন ঘড়িতে সাড়ে বারোটা। খেয়ে খানিক বিশ্রাম নিয়ে দেড়টা নাগাদ আবার রওনা দিই। চামতোলির কাছে এক বৃদ্ধ মেষপালকের সাথে দেখা। সে ওখানে একাই থাকে। প্রকৃতির ভয়ালতার সাথে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। আছে শুধু একটা ছোট্ট কাঠের ঘর-স্টিলের একটা থালা-গ্লাস-দুটি বাটি। আর আছে বুকভরা আনন্দ। অদ্ভুতভাবে একাকিত্বকে জয় করেছে প্রকৃতির সাথে নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে।

আসার সময় চাম্‌তোলির আগে 'সাদামাটা চেহারার' যে ঝরনার কথা বলেছিলাম সেটা দুপুর তিনটের সময় ভয়াল চেহারা নিয়েছে। দূর থেকে গর্জন শোনা যাচ্ছে। প্রচণ্ড স্রোত। যেন জলের তোড়ে চলার পথে যা কিছু পাবে এক ধাক্কায় ঠেলে সরিয়ে দেবে। এই অবস্থায় আমার সঙ্গীকে একটা নিরীহ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি 'আপনি কীসে ভয় পান?' উত্তরে ততটাই নিস্পৃহ স্বরে বলে 'জলে'। আমার তো তখন ঘেমে জল অবস্থা! তখন ঝরনাটা আরও চওড়া হয়ে গেছে। আমার সঙ্গী কয়েকটা বড়ো পাথর জলের মধ্যে ফেলে জলে লাফাবার পথ করে দেয়। প্রবল স্রোতে আগের পাথরগুলো আছে না ভেসে গেছে বোঝার উপায় নেই। আমার পাহাড়িয়া সাথীর উপদেশ লাফিয়ে-ডিঙিয়ে-দৌড়িয়ে জলটুকু পেরোতে হবে। আমিও এক নিশ্বাসে এই পথ পেরিয়ে একটা ডাঙায় পৌঁছলাম। কিছুটা সমতল কিছুটা উতরাই পেরিয়ে অলকানন্দার তীরে এসে পৌঁছলাম। তখন পাঁচটা। আকাশে মেঘের ঘনঘটা। এদিকে আমি একাকী আর ওদিকে মানা গ্রামের শেষ প্রান্ত। মাঝে অলকানন্দার উপর জমাট বরফ। ফুটিফাটা। আমার সাথী বরফের কাঠিন্য যাচাই করতে গেছে। ফিরে এসে বলল যত জোরে সম্ভব দৌড়ান। আমি তার হাত ধরে জীবনের সেরা দৌড়টা দিলাম। ওইরকম প্রাণান্তকর দৌড়বার পরও নিচে এক সেকেন্ডও দাঁড়াবার জো নেই। এবার আমাকে একটা পাথর ধরে ঝুলে পড়তে হ'ল। কারণ যে কোনও সময় বরফের মধ্যে গহ্বর তৈরি হতে পারে। সারাদিনের রোদে জমাট বরফ অনেকটা নরম। তারপর লাফিয়ে উপরে ওঠা। বুকভরা নিশ্বাস নেওয়া। মুক্তির আনন্দ। আমি আর আমার ত্রাতা দুজনে হাত ধরাধরি করে নাচানাচি– মিষ্টিমুখ থুরি লজেন্সমুখ করি। যেন সাক্ষাৎ যমের হাত থেকে দে ছুট! আর সফল পলায়ন। এই আনন্দ প্রকাশের সময় ভুলে যাই শ্রেণীবিন্যাস-আত্মগরিমা। পাহাড় তো আমাদেরকে ভেদাভেদ ভুলতেও শেখায়। এরপর মুষলধারায় বৃষ্টি শুরু হয়। বাকি সদস্যদের জন্য আমরা অপেক্ষা করি। কিন্তু দেখা পাই না। আমরা নিজস্ব ডেরায় ফিরে আসি।

পাহাড়ের বিপজ্জনক ঢালে আমার বন্ধুরা সারারাত খোলা আকাশের নিচে আটকে থাকে। একবার অনিচ্ছায় গড়িয়ে অনেকটা নীচে অলকানন্দার দিকে আসে। আবার স্ব-ইচ্ছায়, স্ব-প্রচেষ্টায় উপরে ওঠে। এই উত্তরণ-অবতরণের মধ্য দিয়েই সেই রাতটা তাদের কাটে। তারমধ্যে রাতভর টুপটাপ ঝরে পড়া বৃষ্টির আস্ফালন। সঙ্গে আলো বলতে তিন সেলের একটা টর্চ। সেটা যেন জোনাক পোকার মতো জ্বলে। তমসাঘন রাতে চারজন বিপন্ন মানুষের আলোকবর্তিকা হতে না পারার লজ্জায় সেটা যেন আরও ম্রিয়মান। পরদিন সকালে তাদের সাথে যখন দেখা হয় তখনও তাদের চোখেমুখে আতঙ্কের ছাপ স্পষ্ট। জীবন-মৃত্যুর মধ্যে একটা সূক্ষ্ম সুতোর ব্যবধানের একটা তীব্র অনুভূতির ছাপ।

এতকিছুর পরেও পরের দিনই ভাবতে বসি সামনের বার 'কোথায়?' আসলে পাহাড়ের কষ্টিপাথরে নিজেকে যাচাই করা, সংযম-সাহস-ধৈর্য-প্রত্যয়ের পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হওয়া। পাহাড়ের মানুষদের সরল বিশ্বাস-আস্থাকে মনে মনে কুর্নিশ জানাই। কোথা থেকে পায় তারা অন্যের প্রতি এই ভরসা। একটাই উত্তর পাহাড় থেকে। সে যে সবকিছুর মধ্যে থেকেও স্বতন্ত্র। তাঁর ব্যক্তিত্ব ঈর্ষণীয়। তাই আমার মতো নগণ্য এক মানুষ, নাম-যশ-অর্থের প্রত্যাশা না করা মানুষ, বারে বারে ফিরে ফিরে যাই তার কাছে, যেমন মায়ের কাছে ক্ষুব্ধ-অশান্ত-তৃষিত মন নিয়ে যাই। মা যেমন বটের ছায়ার স্নিগ্ধতা দেয় তেমনি তিনিও আমাদেরকে তাঁর বিশালতা-গাম্ভীর্যতা-স্নিগ্ধতা-রুক্ষতা দিয়ে কাছে টানেন। কিছুতেই দূরে থাকা যায় না। যেন নিষিদ্ধ বস্তুর টান, ভয়ঙ্কর সৌন্দর্যের টান, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড মাঝে একাকিত্ব উপলব্ধি করার টান। একাকিত্বও যে এত মধুর হয়! শুধু শরীরের মেদ নয় মনের মেদও ঝরাতে গেলে পাহাড়ে হাঁটা দরকার। পাহাড়কে ভালোবাসা দরকার।

সভ্যতার অগ্রগতি-লোকবসতি তৈরি-চাষের খেত তৈরি-নদীতে বাঁধ দেওয়া-সেচ প্রণালী বানানো-রাস্তা তৈরি-জলবিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরি, সময় বাঁচাতে পাহাড়ের পাকদণ্ডী কমাতে টানেল তৈরি করে এক পাহাড়ের সঙ্গে অন্য পাহাড়ের সংযোগ তৈরি ইত্যাদি বহুবিধ কারণে পাহাড় ফাটানো হয়। মনে হয় এক পাহাড়ের সঙ্গে অন্য পাহাড়ের নীরবে কথা চালাচালি হয়। এরা ভিতরে ভিতরে সবাই ঐক্যবদ্ধ-সংঘবদ্ধ। এদিকের পাহাড় ফাটানোর প্রতিশোধে অন্যদিকের পাহাড় নিজেকে ধ্বসিয়ে চলাচলের রাস্তার উপর পড়ে যেন পথ অবরোধ করে দেয়।

লেখার শুরুতে বলেছিলাম এ যাত্রা যেন ধার্মিক-অধার্মিকের মেলবন্ধন। ধার্মিক মানে যে ধারণ করতে পারে। এখানে ধারণ করা হয় জীবন দর্শনকে। সেই অর্থে যাত্রা শেষে আমরা সবাই ধার্মিক হ'লাম।

আরও ছবি- ছবির পাতা-২

পরিচিতি

জীবিকায় কস্ট অ্যাকাউন্টটেন্ট। জীবনচর্চায় ফোটোগ্রাফি।

লং ড্রাইভে ডুয়ার্সের হাতিপোতা নারারথলি বিল

প্রসাদ বিশ্বাস

সময়টা ঠিক মনে নেই, গভীর রাত, পার্থ আর আমি জেগে, কাকাবাবুকে জাগানো হল। বাকি দু'জন অর্বাচীন বেঘোরে ঘুমচ্ছে। এতো অন্ধকার এখানে, নিজের সিটের পিছনে ঝুঁকে বসা পার্থর উদ্বিগ্ন মুখটাও ঘাড় ঘুরিয়ে যে দেখব তার উপায় নেই, শুধু ওর ঘন ঘন গভীর নিঃশ্বাস আমার ঘাড়ে এসে পড়ছে। কাকাবাবু অচঞ্চল, দৃষ্টি স্থির রেখে নিরাকার নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে কিছু একটা প্রত্যাশায়। এ ভয়ানক অন্ধত্বকেই বুঝি তমসা বলে। এইমাত্র চালসা ক্রস করে এই কালো নির্জনে এসে পড়লাম, গাড়ির আলোতে দুপাশের জঙ্গলের রূপ বড়ো ভয়াবহ লাগছে। ভয় কে জয় করার জন্যই আমার আজন্ম দৌড়। গাড়িটা রাস্তা (এন এইচ ৩১-এ) থেকে নামিয়ে একটু ফাঁকা জায়গা দেখে থামলাম। চারদিক থেকে অসংখ্য নিম্ন পিচের চেনা অজানা শব্দ-মেঘ আমাদের ঘিরে ছিল, আমি থামতেই ওরা চুপ। তখনও ইঞ্জিনের আস্ফালন বন্ধ হয়নি। স্করপিওর তীব্র লাল আলোয় দূর দূর পর্যন্ত রাস্তার নিঃসঙ্গ বিস্তার, ডানে বাঁয়ে ঘন অরণ্যের ঠাস বুনন। কেউ জেগে নেই। শুধু 'আমরা', অনাহূত পাঁচ মক্কেল আর 'ওরা', যাদের এই রাজত্ব। হেডলাইট নিভিয়ে ইঞ্জিন অফ করতেই এক আলাদা জগত। গাড়ির কাচগুলো নামিয়ে দিয়েছি, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বিচিত্র শব্দ-সম্মিলিত অর্কেস্ট্রার সে এক অদ্ভুতুড়ে সুর। তোমাকে তো শুনতেই হবে। ওদের দেখা যায় না, ওরা শুধু বলে ওরা আছে, অ্যালার্ট করে এখন আমরা ওদের জিম্মায়। প্রাথমিক দৃষ্টি-বন্ধ্যাত্বের সময়টুকু কাটিয়ে উঠেছি, এখন এই আঁধারেই চোখ সয়েছে। বেশ দেখা যাচ্ছে উঁচু গাছের মাথায় মাথায় হাওয়া ধরেছে। একটা অখাদ্য গলায় চিৎকার, ওটা পেঁচা ডাকছে। খুব ক্ষীণস্বরে কুকুর আর শেয়ালের উত্তর প্রত্যুত্তর শোনা গেল দূরে। এটাই একমাত্র চেনা স্বর। 'কিন্তু এটা কীসের... ?' চমকে উঠে জিজ্ঞেস করি, হাড় কাঁপানো বিকট ডাক। 'ভাগ্য ভালো তোমার... ময়ূর ডাকছে... ময়ূর'। এত সুন্দর পাখির এই গলা!

আমরা চাপড়ামারি ওয়াইল্ডলাইফ স্যাঙ্কচুয়ারি এরিয়ার মধ্যে এখন। হু হু করে বাতাস আসছে জানলা দিয়ে। অসুবিধের কিছু নেই। কেন দাঁড়িয়ে আছি? কারণ নেই! দাঁড়িয়ে আছি কোন অজানা মুহূর্তের জন্যে, কোনও অভূতপূর্ব অনুভবের আস্বাদনের জন্য; একটা হাতিও হুশ করে বেড়িয়ে আসে যদি, জঙ্গলের কালো বর্ম ভেদ করে, জানি দেখা যাবে না, কিন্তু অনুভব তো করা যাবে, শোনা যাবে ওদের গাছ ভাঙার শব্দ। চরম উৎকণ্ঠায় অপলক আমরা কজন। চোখ বুজলেই অন্ধকারটা বেড়ে যাচ্ছে, তাই বিস্ফারিত চোখের মণি। মন বলছে আসুক হাতি, দেখি কি হয়, মাথা বলছে না না। সেবার বাঁকুড়ায় ফটো তুলতে গিয়ে, এক দাঁতালের তাড়া খেয়ে যাই যাই অবস্থা, কোনওক্রমে গ্রামবাসীদের প্রবল প্রচেষ্টায় গজানন আমাকে রেহাই দেয়। প্রাণ নামক পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে পালিয়ে আমি তখন একটি প্রাচীন পলাশ গাছের পেছনের কাঁটা ঝোপের কোটি কন্টক শয্যায়, চরম আক্রোশে দাঁতালের গুঁতোগুলো ওই পলাশ গাছই সামলে ছিল। এখানে তো আমনা সামনি ব্যাপার, গাড়িটার নম্বর প্লেট থেকে হয়তো চেনা যাবে আমাদের! রেলের চাকায় অজস্র সঙ্গী হারানোর মধুর প্রতিশোধ নেবে কি ওরা, আজ? ভয় হচ্ছিল। এটা নিখাদ পাগলামো। ফিসফিসিয়ে কাকাবাবু বলে উঠল... 'ওয়েলডান প্রসাদ, আই অ্যাম প্রাউড অফ ইউ...'।

আমি তো অবাক, আরে এই লোকটাই তো বাগডোগরার কাছে, হোটেলে আমার আর পার্থর এই রাত্রিকালে হাতির দেশে যাবার বিরুদ্ধে মুখর ছিল। জঙ্গলের গহীন রহস্যময়তার কী অমোঘ আকর্ষণ! প্রেসিডেন্সির দাপুটে ছাত্রটি জাগিয়ে দিল নাকি সেটা মদিরাময় মননের পৌরুষ, তর্কের ব্যাপার। তবে আমার সাহসটা যে বেশ বাড়ল সন্দেহ নেই। পার্থর আশা 'সামথিং বিগ', টিভির এক বিজ্ঞাপনের মতো আশপাশ থেকে মচ মচ করে এসে টুপ করে গাড়ির বনেটের উপর লাফিয়ে উঠবে একটা লেপার্ড। ঘন নিঃসীম বনান্ধকারে ওর জুল জুল চোখদুটো শুধু জ্বলবে, আমাদের দেখে। 'কাচ আছে তো, কিছু করতে পারবে না'। কাকাবাবু বলল, এ কাচ ভাঙা ওর কাছে নস্যি...। আবার সব চুপ। কতক্ষণ কাটল মনে নেই, অন্ধকারে দৃষ্টি আর সময় দুটোই ধীরে চলে। পাশের ঝোপ থেকে একটু জোরে আওয়াজ হল, কে যেন দ্রুত চলে গেল, ইঁদুর কুলের কেউ হবে হয়তো। কিন্তু অনেকক্ষণে অভ্যস্ত হয়ে পরা শব্দগুলোর মধ্যে এটা নতুন। ঝিঁ ঝিঁদের কনসার্ট চলছেই। কিন্তু এখন গা সওয়া। একটু অন্যরকম কিছু শুনতে চাইছি, খস খস, ফস ফস, মচ মচ, এই আর কি... কিন্তু মট মট নয়, নো মট মট। কিছু একটা উড়ে গেল কাছের কোনও গাছ থেকে, ডানার ঝাপটানি শুনতে পেলাম। হঠাৎ লুকিং গ্লাসে একটা আলোর বিন্দু। ক্রমশ তা কলেবরে বাড়ছে। কী ওটা! আয়নায় ফুটকির সাথে সাথে আমার আতঙ্কও বাড়ছে, যখন দেখলাম একটা আলো ভেঙে দুটো হল, বুঝলাম কোনও চারচাকার হেডলাইটস। পুলিশ নয়তো! ধরলে কী জবাব দেব, এত রাতে, এত দূর থেকে এসে, ভয় পাবার জন্য দাঁড়িয়ে আছি। এই রোমাঞ্চকর অনুভূতিই মাটি হবে ওদের অজস্র বিবেকহীন প্রশ্নবাণে, কেটে পড়াই শ্রেয়।

ডাকাতও হতে পারে। ট্রাক ড্রাইভারদের থেকে এ রুটের অনেক গল্প শুনেছিলাম, আজই সেবকের কাছে ঘটনাটা ঘটল। একটা বাঁকের আগে, রাস্তায় লাইট জ্বলছে, দুটো অপরূপা সুন্দরী হাত দেখাল,

লিফট চেয়ে, স্লোও করলাম। কিন্তু ছ্যাঁত করে উঠল বুকটা। ডাকাতির পরিকল্পনা। স্বল্পবসনা তন্বীদের দুর্নিবার টানে কিংবা কোনও মহার্ঘ কিছু রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে থেমে যাওয়া হতভাগ্যদের সর্বস্ব লুটের ঘটনা রাতের হাইওয়েতে কারও অজানা নয়। পার্থ হয়তো জানতও না, ও তো আমার মতো এমন রাতচষা বাউন্ডুলে নয়, রাতের পথের ও কী জানে, বলল 'আরে এতো রাতে নিশ্চয় খুব বিপদে পড়েছে বেচারিরা, ...তুমি...' শেষ হয়নি কথা, বাঁকটা ঘুরছি, একটা মারুতি ভ্যানে জনাকতক ছেলে দাঁড়িয়ে আছে, রাস্তায় ভাঙা মদের বোতল, ওদের গাড়ি থেকে ধূমায়িত নেশার বিষ ছড়াচ্ছে চারদিকে। নিচু স্বরে পার্থর গলায় 'সাবাস ড্রাইভার', একটা কঠিন বাধা পেরনোর মগ্নতা।

...কাকাবাবুও বলল, চলো আর থেকে লাভ নেই। সটকে পড়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে। সয়ে যাওয়া নীরবতা ভেঙে খান খান করে দিল ২২০০ সিসির গোঙানি। খেয়াল করিনি ওদের, আলো জ্বালাতেই দেখি একপাল শেয়াল মুহূর্তেই এপার থেকে দৌড়ে ওপারের ঝোপঝাড়ের মাঝে সেঁধিয়ে গেল। পার্থর বিশ্বাস আলোর জন্য নয়, লেপার্ডের উপস্থিতি টের পেয়েই ওরা দৌড়চ্ছিল, আলোটা আমি তখনই জ্বালিয়েছি মাত্র। হতে পারে। বিশ্বাস করতেই বা ক্ষতি কি! ফলে আবারও চলা শুরু। আরও বিস্তর টায়ার পুড়িয়ে ভোরের আলো ফোটার আগে, এক পাম্পে তেল ভরছি আর একটু রিফ্রেশমেন্ট! তেল দিতে দিতে পাম্পের ভদ্রলোক বললেন, গতকালই একটি ট্রাকে হাতির হামলা হয়েছে। কিন্তু অভিজ্ঞ ড্রাইভার ছিল, তাই ট্রাক নিয়ে বেঁচে ফিরেছে। আমরা আজ ওই জায়গাতেই দাঁড়িয়েছিলাম। অপরিণামদর্শীরাই সাহসী হয় হয়তো! নাকি এও এক ধরনের নেশা!

নেশা তো বটেই। গতকাল সকাল ১০টায় কাঁচরাপাড়া স্টেশন। কাকাবাবু মিঃ সেনগুপ্ত, তাঁর ছোটো ছেলে গুগুল, আমার এক পুরনো ছাত্র ভোম্বল, গুগুলের বয়সী, আমার কাছের বন্ধু পার্থ, আমি আর আমার মহিন্দ্রা স্করপিও... যাত্রা শুরু; ড্রাইভার একমাত্র আমি; রাত ১০টা নাগাদ শিলিগুড়ির উপকণ্ঠে একটি হোটেলে থামার আগে একবার মাত্র ঠিকঠাক রেস্ট ছিল বহরমপুরে মধ্যাহ্নভোজনের সময়। তাছাড়া রাস্তায় চা-টিফিন খাওয়া আর হঠাৎ হঠাৎ কাকাবাবুর বিষম বায়নাক্কায় চোখে পড়ে যাওয়া পাখির ছবি তোলার জন্য যেখানে সেখানে দাঁড়ানো। আর এই কানা রাতে জঙ্গলে আসা। ঘুম গেছে ঘুমের পাশে, ডিনার নেওয়ার পর একমাত্র পার্থ আর আমি বাদে সকলেই স্বপ্ন রাজ্যে।

শিলিগুড়ির পর থেকে বেশ কিছুটা পাহাড়ি রাস্তার ড্রাইভিং, একটা আলাদা ভালোলাগা। ভোর সাড়ে চারটে নাগাদ আলিপুরদুয়ার জংশনে পৌঁছে তবে থেমেছি। নেশা ছাড়া আর কী? ড্রাইভিংও এক বড়ো নেশা। চাকরি সূত্রে শিলিগুড়ি বড়ো জাগুলিয়া করি, বাসেই যেতাম আসতাম, আর ভাবতাম একদিন ৩৪ নং জাতীয় সড়কে আমার নিজের গাড়ির চাকা ঘষাব। কৃষ্ণনগর ছাড়িয়ে নিজের গাড়িতে এই প্রথম এতদূর আসা। একমাত্র গাজলের কাছে প্রচণ্ড ভারি বৃষ্টি ছাড়া তেমন আর বিশেষ কিছু ঘটেনি। ডালখোলায় যেমন দুটো রাজ্য মাখামাখি তেমনই ৩৪'ও খানা খন্দ ডোবা আর রাস্তা একাকার। নৌকার মতো ভাসতে ভাসতে পেরোলাম। প্রবল ট্রাফিকের চাপ। অফ রোড ড্রাইভিং-এর পরীক্ষা যেন! 'ছোটো ঘটনা' তাই গায়ে মাখিনি। কিন্তু কিষাণগঞ্জ থেকে যে চওড়া মখমলের রাস্তা পেলাম, উফঃ! মাখন। ১৬৫ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায় স্পিডমিটারের কাঁটা, তবু মালুম হয় না... হুস হুস করে একেকটি গাড়িকে পাশ করছি। অ্যাড্রিনালিন হাই। পথে কত পরিকল্পনা হল; শীতের লং ড্রাইভে বেথুয়া হয়ে কুলিক। কাকাবাবুকে সঙ্গে আনতে হবে। বদলে আমি পাখি চিনব। পরের গোটা কতক শীতের মরশুম কেটে গেল, কাকা আমায় ছেড়ে ধাঁ।

ওদিকে আধঘণ্টাখানেক এদিক ওদিক ঘুরে তারপর শিবুন ভৌমিক, স্থানীয় গাইড এলেন। এবার জয়ন্তীর দিকে একটা অস্থায়ী স্পট, কিছুদিন হল এক জোড়া হর্নবিল বাসা বেঁধেছে। চললাম কিন্তু ধীরে ধীরে। বেশ খানিক গিয়ে, একটা বড়ো গাছ তলায় থামা। ও বাবা, অফ করার আগেই, সব্বাই নেমে, গাড়ির সব দরজা হাট খোলা রেখে, যে যার মতো গায়েব। আমিই ড্রাইভার অতএব সব দায় আমার। বোঝো! অগত্যা সেই দায় মিটিয়ে, ওদের পিছু নিলাম। 'এই মাত্র ছিল, পালাল' শিবুনের গলা, কে ছিল, কি ছিল, কোথায়? বোঝার আগেই শেষ! একটা চিতল হরিণের বাচ্চা। ওরা করল ক্লিক, আর আমি ড্রাইভার বেচারা দেখতেই পারলাম না ঠিক। ভীষণ রাগে আমি তখন ফুটছি। ফট ফট, ক্রুম ক্রুম... রাস্তাটার বাঁদিকের পাতলা গাছপালা ভেদ করে পরিত্যক্ত রেল লাইনের ওপর গিয়ে বসে রইলাম।

এখানে বসতি ছিল না, কিন্তু বসছে আস্তে আস্তে। লাইনের পাশে মানুষের প্রাতঃক্রিয়ার নমুনা তারই প্রমাণ। এটা ঠিক জঙ্গল নয়, বরং কিছু বুড়ো গাছের সাথে হালকা বন এটা; গাছ কেটে ফাঁকা হয়ে গড়ের মাঠ হয়েছে সামনে, জনবসতি হওয়ার আগের ধাপ।

কাকাবাবুরা দেখছে তাই আমিও গাছে গাছে পাখি খুঁজতে লাগলাম, 'ওই দেখ,...!' আরে কী দেখব, কিছুই তো চোখে পড়ে না। আসলে পাখি দেখার চোখ থাকাটা জরুরী। আমি এত ট্রাই করে সবে দেখতে শিখেছি বিগত বছর দুই হল, তখন পারিনি। পার্থই আমায় দেখিয়েছে। তবে ওই বটের ডালে বসা হলুদ রঙের বড়ো বড়ো দুটো পাখি যে হর্নবিল, সেটা সহজ দ্রষ্টব্য। এখানেও ময়ূরের ডাক, সমান বিকট যা শুনেছিলাম আজ রাতের অন্ধকারে, আর ভুল হয়! বেশ কিছুক্ষণ কাটিয়ে, এদিক ওদিক ঘুরে আমি আপন মনে গাড়ি নিয়ে অনেকটা পথ এগিয়ে গিয়ে থামি। সবকটাকে ফেলে এসেছি ইচ্ছা করে, আসুক ব্যাটারা হেঁটে হেঁটে... এটা বক্সা টাইগার রিজার্ভ, বনের যা ছিরি বাঘ কেন 'বাগ'ও থাকেব না। শুনলাম সত্যিই বিগত অনেক বছর কোনও আধখানা টাইগার/টাইগ্রেস-এর পটির গন্ধও পায়নি এই রিজার্ভের বুভুক্ষু ঘাস-জমিন! ব্যাটার ছেলেরা সবান্ধবে ভুটানে পালিয়েছে বোধহয়।

আলিপুরদুয়ার জংশনের দমনপুর ফরেস্ট রেস্টহাউসে থাকার ব্যবস্থা ছিল। শিবুনই ঠিক করেছে, বিল ভরবে কাকাবাবু। অনেকটা

হোম-স্টে টাইপ; স্থানীয়রা মিলেমিশে দেখভাল করে, রাঁধে-বাড়ে। রাতে সুর পানও চলে গেস্ট না থাকলে। মন্দের ভালো। তবে খুব ভালো কিছু আশা না করাই ভালো। স্নান সেরে দু'ঘণ্টার 'দীর্ঘ' বিশ্রাম নিলাম। কাকাবাবু আর পার্থ চলল শিবুনের বাড়ি। আমরাও গেলাম সব্বাই। তার আগে ঘুরে গেলাম দমনপুরের পুরনো পরিত্যক্ত রেলস্টেশন। ফটোজনিক ভিউ কিন্তু কেমন যেন 'স্যাড সং' টাইপ পরিবেশ। অতঃপর বিখ্যাত লেখক ও ভ্রমণপিপাসু গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যকে পেলাম আমাদের যাত্রা সঙ্গী হিসেবে। 'বইওয়ালা'র প্রকাশনায় 'বেড়াতে চলুন ডুয়ার্স' খুব তথ্যমূলক বইটি তাঁরই লেখা।

আমরা চললাম চিলাপাতা। আলিপুরদুয়ার জংশন থেকে মোটামুটি ২৫ কিলোমিটার দূরে চিলাপাতা রেঞ্জ অফিস। পারমিশন ও গাইড সাথে নিয়ে এক অভিনব যাত্রার শুরু। হস্তিকুলের যাতায়াতের পথ এই চিলাপাতা রেঞ্জ। একদিকে জলদাপাড়া আর অন্যদিকে বক্সা। তখনও তেমন ট্যুরিস্ট যেত না ওখানে। ডাকাতির ভয় ছিল। এখন তো ঢল নেমেছে শুনেছি। সবচেয়ে বড়ো কথা, নিজের গাড়ি নিয়ে গভীর অরণ্যে ঢোকার স্বাদ এখানেই মিলত, এখন আর হবে না। রেঞ্জ অফিস থেকে বেড়িয়ে গাইডের কথা মেনে ডানে বেঁকলাম। জঙ্গলের রাস্তা। রাস্তা নয়, গাড়ি যেতে আসতে শুধু যেটুকু পথরেখা জন্মায়, শুধু তাই। কখনও দুলছি, বাঁয়ে ডানে, উপর নীচে করছে গাড়ি, কখনও গাছের নুঁয়ে পড়া পাতার মধ্য দিয়ে। দুদিকের অরণ্য বেশ আঁটাসাটা। থামাও যাচ্ছে না, থামলেও নামার উপায় নেই, গাড়ির দরজাই খুলবে না তো। তার উপর আবার জানলা দিয়ে গাছের সরু সরু ডাল পালা সপল্লব ভেতরে আসতে চাইছে! একবার তো কাঁটা ঝোপে লেগে আমার হাত ছুলে গেল। তবে, অবর্ণনীয় আনন্দ পেয়েছি ড্রাইভ করে। হাতি, লেপার্ড, রাইনো চলা পথে আমি চলেছি। মাঝে মধ্যে তো ভুলেই যাচ্ছি গাড়িতে আরও সঙ্গী আছে। এতটাই মশগুল ছিলাম স্টিয়ারিং-এ। হঠাৎ এক জায়গায় এসে দেখি দুপাশে জঙ্গলের অভেদ্য প্রাচীরের কন্টিনিউটি কে যেন ভেঙে দিয়ে গেছে, ডাল পালা ভাঙা, রাস্তায় ছড়িয়ে... তাণ্ডবের চিহ্ন চারদিকে। থামতে হল। ধান পাকার সময়ে বাঁকুড়ার সোনামুখী অঞ্চলে এমনটা দেখেছি। হাতির কাজ। ওরা এখান দিয়ে রাস্তা ক্রস করেছে। আমি আর গাইড নামলাম, রাস্তায় পড়ে থাকা গাছের ডাল সরাতে। পরে হাতির বিষ্ঠা দেখে গাইডের ভয় কাটল, খুশি হয়ে বলল আজ নয় এক-দু'দিন আগের। আসলে এই পথে সচারচর কেউ আসে না তো! চার দিকে চালতা, শিমুল, শিরিষ, ওদলা, খয়ের, শালের এমন সম্মিলিত গণঅবস্থান, ঝোপ বলতে শুধু ল্যান্টেনাকেই চিনতে পারলাম। কত টাইপের ক্লাইম্বার, এপিফাইটিক, টেরিস্টরিয়াল অর্কিড, ফার্নের অনেক প্রজাতি... মুগ্ধ করার মতো। ভেন্ডাসিয়াস গ্রুপের কিছু বেসিক অর্কিড চোখে পড়ল। একটু ফাঁকা হয়ে এসেছে জঙ্গল, গাছ গাছালির মাথা দিয়ে সূর্যের আলোও দিব্যি ভেতরে হামলে পড়ছে। এসে পড়লাম নল রাজার গড়ে। গুপ্ত যুগের না জানা ইতিহাসের সামনে।

এই নল রাজার গড় নিয়ে নানা মুনির নানা মত। তবে, সব্বাই একমত হবেন এটার বর্তমান অবহেলিত দশা দেখে, যে এটিকে অনতিবিলম্বে সংরক্ষণ করা হোক। কোনও সরকারই ইতিহাসকে মর্যাদা দেয় না, ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয় না। কেবল ইতিহাস প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের ফটোতে মালা চড়ানোর ছবি ফেসবুক টুইটারে ছড়িয়ে পড়ে লাখো লাইক টানার জন্য। অনেকটা জুড়ে ঐতিহাসিক ধ্বংসাবশেষ, লতায় পাতায় মুড়ে, বনের গভীরে চলে গেছে। শ্রদ্ধেয় লেখক শোনালেন এখানে তার প্রথম আসার স্মৃতি।

প্রচুর পাখির ডাক শুনছি। উড়ে যাবার শব্দ বা ছায়াও দেখছি, কিন্তু তাদের দেখছি না। বিভিন্ন প্রজাতির হরিণ আছে এই অঞ্চলে। তবে খুশি করার মতো প্রজাপতির সম্ভার। অজস্র আর অসম্ভব সুন্দর সুন্দর রঙের। এখান থেকে বেড়িয়ে এসে, আবারও এক জংলি পথ ধরে বিস্তর ঘোরাঘুরি করে শেষে এলাম 'রাইনো পয়েন্টে'। বিট অফিস থেকে কথা বলে গাড়িতে উঠব, হাতির ডাক। এ ওর মুখ চাইছি, গাইড বলল এটা পোষা হাতি। পায়ে শিকল নিয়ে মানুষের সেবা করে চলেছে... ওয়াচ টাওয়ারে পৌঁছবার আগেই আগের এক জিপসি চালক বলল 'তাড়াতাড়ি করুন, গাউর সামনে'... বাইসনের একটা পাল চড়ছে, আগের দুটো আর আমাদেরটা নিয়ে তিনটে গাড়ি বোঝাই আমরা দেখছি। ওরা খাচ্ছে। গুগুল আমার ক্যামে খচা খচ ফটো তুলছে। দ্বিতীয় জিপসির ড্রাইভারটা একটু পিছতে গিয়েই বোধহয়, গাই-ই করে আওয়াজ করে বসল, আর গাউরও ঝটা পট উঁচু এলিফ্যান্ট ঘাসের আড়ালে চম্পট। এখন খালি ঝোপের মধ্যে নড়াচড়া দেখা যাচ্ছে কিন্তু ওদেরকে নয়। এই জায়গাটা ভারি সুন্দর ভিউ পয়েন্ট, ও পাশে জলদাপাড়ার জঙ্গল, মাঝে এলিফ্যান্ট গ্রাসের বিস্তীর্ণ সমতল আর জলা...। 'আরে জলার ধারে ওটা কি, গণ্ডার!' ভোম্বল ফিসফিস করে। 'ধ্যাত! ওটা একটা মরা গাছের গুঁড়ি...' কাকাবাবুর ধমকানি।

আমাদের আজ লাঞ্চ হয়নি। সময় কোথায়— সময় নষ্ট করবার! সঙ্গে থাকা কেক, বিস্কুট খেয়েই দিন গেল। দমনপুরে ফিরে জোড়তোড় খাওয়া দাওয়া; সন্ধ্যেটা এদিক ওদিক উঁকি দিতে দিতেই ফুস করে কেটে গেল। পরদিন সক্কাল সক্কাল আমার গাড়ি ছুটল কুমারগ্রামের দিকে। একে ওকে জিজ্ঞাসা করতে করতে 'গাছের মহাশ্মশানের' মধ্যে, মানে অসংখ্য কাঠ-চেরাই কলের মধ্যে খুঁজে পেলাম কুমারগ্রাম ফরেস্ট গেস্টহাউস। দেখতে খুবই ভালো, কাঠের তৈরি, সুন্দর উডেন ইন্টেরিয়র। চারদিকের প্রাচীর ঘেরা, কিছু বড়ো বড়ো গাছ, তাতে নানান পাখির কলতান। এর বাইরে? জঙ্গল তো দূরস্ত, ঝোপ কোথায় খুঁজতে চোখ ব্যথা হবে।

ঘরে বসে চা খাওয়া আর গুলতানি আমাদের স্বভাব নয়, বেড়িয়ে পড়লাম। যাব কালীখোলা, সীমান্ত পেরিয়ে ভুটানের প্রান্তিক গ্রামে। যেখানে ভারত, ভুটান যে কোনও কারেন্সিতেই চলে আদান-প্রদান। নিউল্যান্ড টি-গার্ডেন ঘুরে, কুমারগ্রাম চা-বাগানের মধ্যের সুন্দর ছায়াময় পথ বেয়ে ভারতের শেষ ভুটানের শুরু। এপথে হাতির বড়ো উপদ্রব। ক্যাম্প বা বস্তিগুলোয় তাই ইলেক্ট্রিক তারের বেড়া। ভারতীয় সীমান্তরক্ষীর প্রহরা পেরিয়ে, এক বিস্তৃত বালুকাময়

নদীবক্ষের উপর দিয়ে গিয়ে ভুটান সীমান্ত। পরিচয়পত্র দেখানো হল, গাড়ির তল্লাশি হল, আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স ভুটানি পুলিশের জিম্মায় রেখে অনুমতি মিলল যাওয়ার। প্রচুর ভারতীয়রা এভাবে সীমানা পেরিয়ে প্রতিদিন কাজে আসে যায় ভুটানে। প্রথম জনপদে এসেই থেমে গেলাম, কালীখোলা মন্দিরে আর যাওয়া হয়নি।

ফেরার পথে, সীমান্তের সেই চওড়া বুকের শুকনো নদীর উপর যখন উঠলাম, দুপুর শেষ লগ্নে। কিন্তু গাড়ি যাওয়ার চাকার দাগ তো দেখছি না, যাব কোথায়, কোন দিকে? আমরা দিশাহীন ঘুরতে ঘুরতে, বি এস এফের এক জওয়ানের সাহায্যে শেষে ফেরার পথ পেলাম। এপাশের এদিকটায় মেঠো পথ সবই কোনও না কোনও চা-বাগিচার ভুলভুলাইয়াতে হারিয়েছে। কিছুদূর আসার পর, পথের অন্তর্জালে পথ গেল আবার হারিয়ে। জানি একদিন না একদিন ঠিক রাস্তা মিলবে। চিন্তা করে লাভ নেই। বরং লেপার্ড খুঁজি, পাখি দেখি, যাদের খুঁজলেও মেলে না। একটুকরো আকাশ দেখা দিল দূরে। বড়ো গাছগুলোর ফাঁক দিয়ে। ওই দিকে যেতে গিয়ে, এলাম এক শীতল স্রোতস্বিনীর বালুময় তটে। অনেক জেলে মাছ ধরছে, ভেজা ছেঁড়া জাল। দূরে ভুটান পাহাড়। তার থেকে জন্ম নেওয়া নদী এই সংকোশ। অসাধারণ ফটোজেনিক দৃশ্য। প্রকৃতির আপন সৌন্দর্যের উদারতায় উচ্ছল সময়ও এখানে বয়ে চলে নীরবে। 'যেতে চাই না আর ফিরে ও সংসারে'! এক অনাস্বাদিত আত্ম বিহ্বলতায় আমরা সবাই। আকাশ রাঙিয়ে শেষে সন্ধ্যে এলো টুপ করে। বলল 'ফিরে যাও এবার'। ফরেস্ট বাংলোয় আসতে আসতেই মিশমিশে অন্ধকার চারধারে। ভালো ভুঁড়িভোজের পর সারা রাত ধরে চলল গল্প, আমি, পার্থ শ্রোতা; গুগুলের দুঃখ থেকে উচ্চাশা আমাদের শোনার বিষয়। প্রাণ খুলে ও বলে চলে, ভোরের আলো ফোটার শেষে গল্প শেষ হয়। একটু বিশ্রাম। পরিতাপের বিষয়, এই বাংলোটি সর্ট সার্কিট হয়ে টোটাল বার্ন আউট। আবার বানানো হয়েছে কিনা জানা নেই। পার্থ আজ চলে যাবে এখান থেকে, ভুটানের ফুন্টশিলিংয়ে, ওর কাজ আছে। 'অকাজে'র আমরা কজন যাব হাতিপোতা।

সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি পার্থ আর ভোম্বল মিলে স্করপিওটা ধুয়ে মুছে সাফ করে দিয়েছে। আহ! চারদিক পাখির কলকাকলিতে মুখর। ভেতরে চা-বাগানের মধ্য দিয়ে রাস্তা ছিল। কিন্তু যাওয়া হল না। পার্থকে জাতীয় সড়কের এক নাম না জানা বাস স্টপে নামিয়ে হাতিপোতায় পৌঁছলাম সকাল নটায়। দারুণ জায়গা। দেখা মাত্রই প্রেমে পড়া যায়। সুন্দর বাংলো। পোষা হাতিরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাংলোর বারান্দায় বসে চা খেতে খেতে পাখি দেখেও সময় চলে যাবে। কুমারগ্রামের দুঃখ এখানে ভুলিয়ে দিল। বাংলো থেকে বেড়িয়ে ডান দিকে কাঁচা রাস্তার দাগ ঘন জঙ্গলের মধ্যে চলে গেছে। হতচ্ছাড়া মন সে পথেই যাবে আজ। আমি আর কাকাবাবু প্রজাপতি, পাখির ফটো তুলতে তুলতে সে পথেই চলেছি। মাথায় কাঠের বোঝা নিয়ে একদল গ্রাম্য রমণী। মলিন শাড়ির পাড়, কোঁচড়ে গোঁজা, হাতে কুঠার... 'ইললিগ্যালি' কাঠ নিয়ে ফিরছে।

বাংলো সংলগ্ন ফরেস্ট গার্ডের অফিস ও ব্যারাক। একজন অল্প বয়সী গার্ডকে সাথে নিয়ে আমরা এই পথেই দিলাম গাড়ি ছুটিয়ে। গন্তব্য নারারথলি বিল। এটা দক্ষিণ ছিপড়া বনাঞ্চলের মধ্যে। অবর্ণনীয় সুন্দর এই যাত্রা পথ। ময়ূরের লম্বা পেখমের আড়ালে ময়ূরীর হারেম। প্রাচীন গাছগুলো সব বিশালাকৃতি, আকাশ ছুঁয়েছে, যেন প্রাগৈতিহাসিক ইপক। কিছু বসতিও আছে তবে নিতান্তই দেহাতিদের বাস। কাঠের লজঝড়ে লম্বা এক সেতু পেরিয়ে বিলের ওয়াচ টাওয়ারে আসা গেল। এমন সুন্দর পরিবেশের একি হতশ্রী রূপ! পলিব্যাগ, পলি-গ্লাস আর ভাঙা মদের বোতলের জঞ্জাল। ওয়াচ টাওয়ারে ওঠা গেল না, সিঁড়ি ভেঙে ধ্বসে গেছে। বিলের অবস্থাও তথৈবচ। কচুরিপানার ঘন বিন্যাসে জল না স্থল বোঝা মুশকিল। শীতে নাকি পরিযায়ী পাখিরা আসে! সন্দেহ হয়। এখানে লেপার্ডও জল খেতে এলে ভয় পায়, পাছে পায়ে বোতল ভাঙা কাচ ঢোকে বা ছেড়ে যাওয়া হাফ পেগে নেশা হয় যদি! ফেরার পথে খুব সুন্দর একটি ঝুলন্ত সেতু দেখলাম। গ্রামটাও ভারি সুন্দর।

...গতকাল ঘুম ভালো হয়নি, একটু ঝিমুনি এসেছে, ব্যালকনিতে চেয়ারে বসেই ঝিমচ্ছি। হাতির চিৎকার। পোষ্য হাতির ডাক হবে। দিনের আলো এই নেভে সেই নেভে। গ্রাম থেকে হট্টগোল শোনা যাচ্ছে, শব্দ বাজি ফুটছে ফট ফট। কেউ বলল হাতি এসেছে। ব্যাস! খালি গায়েই দিলাম দৌড়। ছটা হাতির একটা পাল। রাস্তার পাশেই জঙ্গলে। আলো একদম কম। ফটো উঠছে না কিন্তু দেখা যাচ্ছে। ফ্ল্যাশ করা যাবে না। দূরত্ব দুশো ফুটেরও কম, হাওয়া উল্টো বইছে, বুনো হাতির ভোঁটকা গন্ধ আসছে নাকে। গাছের আড়ালে ওরা, ডাল পালা ভাঙছে, খাচ্ছে; যেন সন্ধ্যের জলখাবার। এক একবার একটু করে এগিয়ে এসে শুঁড় তুলছে, আর আমরা কাছা টেনে পালাচ্ছি। দেখতে দেখতে রেঞ্জার সাহেবের দলবল এসে গেল, হাতি তাড়ানোর আগে আমাদের তাড়িয়ে দিল। অগত্যা ফিরে এলাম। রাতে শোবার পর জানতে পারলাম, মশারির মধ্যে আমি একা নই। এত মশা কামড়াচ্ছে, বুঝতেই হবে তুমি জঙ্গলে, মশা থেকে হাতি কেউ রেয়াত করে না ভায়া। পরদিন বেড়ানো সমাপ্ত। অতএব ফেরো। এক পারফেক্ট লং লং ড্রাইভে সোজা বাড়ি; একটু লেট ইভিনিংয়ে।

পরিচিতি

রোমাঞ্চকর ভ্রমণ অভিযানে মন ব্যাকুল।
সে অভিজ্ঞতা রূপ পায় তাঁর লেখায়।
ফোটোগ্রাফিতেও হাতযশ আছে।

হংস বুগিয়ালে ফতে সিং-এর সংসার

সুকুমার চক্রবর্তী

সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহ। এই সময় হিমেল হাওয়া শুরু হবার কথা। অথচ আকাশের মুখ ভার, প্রায় প্রতিদিনই বৃষ্টি হচ্ছে। হিমালয়ের প্রকৃতি দ্রুত তার চরিত্র বদলাচ্ছে। কয়েকবছর আগেও এমন খামখেয়ালি ছিল না। গতকাল সন্ধ্যেবেলা ঝোড়ো হাওয়া আর মুষলধারে বৃষ্টি মাথায় করে ম্যাটাডোরের মধ্যে মালপত্তরের সঙ্গে গাদাগাদি করে চোপতা থেকে মণ্ডল এসে পৌঁছেছি। আজ হাঁটাপথে অনসূয়া এসে অনসূয়া লজের বারান্দায় বসে আছি। যাব রুদ্রনাথ। লজ গ্রামের শেষ সীমানায়। সামনে ঘন জঙ্গল, বয়োবৃদ্ধ বেশ কিছু মহীরুহের গায়ে শ্যাওলার আস্তরণ। এই জঙ্গলে প্রচুর রডোডেনড্রনের গাছ। এখন ফুল ফোটার সময় নয়। এখানে 'গ্রাম সভা'র সভ্যরা জঙ্গল রক্ষার দায়িত্ব নিয়েছে, গাছ কাটা নিষেধ। সামনেই কিরমূড়ের ঝোপ। এর শেকড় ভেজানো জল ব্লাড সুগারের ওষুধ।

সামনের উঁচু পাহাড়ের ঢালে কুণ্ডির একটা ঘর দেখা যাচ্ছে। এখান থেকে কুণ্ডি তিন কিলোমিটার সেখান থেকে হংস বুগিয়াল সাড়ে তিন কিলোমিটার। হংস বুগিয়াল থেকে নওলা পাস অতিক্রম করে রুদ্রনাথ— সাড়ে ছয় কিলোমিটার পথ হবে। হাতে গরম চায়ের মগে চুমুক দিতে দিতে কুণ্ডির চড়াই পথটা দেখছিলাম। আমার পথচলার সঙ্গী জগমোহনের গানের গলাটি ভারি মিষ্টি। সারাক্ষণ আপন মনে গান করে কিন্তু কথা খুবই কম বলে। সে এখন রান্না ঘরে লজের মালকিনকে রান্নার কাজে সাহায্য করছে। রান্না ঘর থেকে তার গান ভেসে আসছে। গাওয়া ঘিয়ে আলু পরোটা ভাজার গন্ধ পাচ্ছি। খিদের মুখে আচার এবং কাঁচা লংকা সহযোগে আলু পরোটা ভারি উপাদেয় লাগল। খাওয়া শেষে বারান্দায় বসে আছি। ঝকঝকে আকাশে সদ্যোস্নাত গাছের পাতায় রোদ পিছলে পড়ছে। কুণ্ডির খোলা ময়দান রোদ্দুরে স্নান করছে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি বেলা দেড়টা বাজে। বসে থাকতে থাকতে আমার কি যে হোল, জগমোহনকে বললাম, জগমোহন তৈরি হয়ে নাও আজই হংসবুগিয়াল যাব। এত বেলায় সাড়ে ছয় কিলোমিটার চড়াই ভাঙা হয়তো যুক্তিযুক্ত নয়, তবু নিজের প্রতি আমার আস্থা আছে। তাছাড়া এপথে জগমোহন বহুবার যাতায়াত করেছে সেটাও একটা ভরসা।

লজ থেকে নেমেই জঙ্গল শুরু হয়েছে। ঘন জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে কৃপণ সূর্যের আলো শেওলা ধরা পথের পাথরে পড়েছে। পা পিছলাবার ভয়। আমরা অমৃতগঙ্গার দিকে নামছি। কোথাও কোনও শব্দ নেই। সকালের পাখিরা এখন অদৃশ্য। শুধু ঝিঁঝিদের পা দিয়ে ডানা ঘষার কর্কশ শব্দ। কিছুক্ষণ হাঁটার পর একটা রাস্তা নিচে অমৃতগঙ্গার দিকে নেমেছে। নদীর অপর পারে অত্রিমুনির তপস্যাস্থল। নদী এখান থেকে দেখা যাচ্ছে না, তার বয়ে যাওয়ার হরহর শব্দ কানে আসছে। আমরা সামনের চড়াই পথে উঠতে থাকি। গভীর জঙ্গলে চড়াই ক্রমশ তীব্র হচ্ছে, জগমোহনের গান থেমে গেছে। স্তব্ধ অরণ্যপথে শুধু দুজনের ঘন শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ। আমাদের চলার পথে চকিতে এসে পড়ে একটি বার্কিং ডিয়ার। সে বেচারা পথের মাঝে খামোখা আমাদের দেখে কেমন থতমত খেয়ে যায়। কী করবে ভেবে না পেয়ে একটু থেমে তীরবেগে জঙ্গলে উধাও হয়ে যায়। পিছন থেকে জগমোহন বলে হিরণ। আমরা একটু দ্রুত হাঁটছি। বেশ গরম করছে, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছে। ছায়া ঘেরা গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পথ এই যা রক্ষে। জঙ্গলের মাঝে যে ফাঁকা জমিটা অনসূয়া থেকে দেখা যাচ্ছিল সেখানে পৌঁছলাম। তাহলে কুণ্ডি পৌঁছলাম। ফাঁকা জমিতে স্থানে স্থানে ঘাসের ছোঁয়া, বেশিটাই পিচ্ছিল এঁটেল মাটি। একটু অন্যমনস্ক হলেই পা পিছলে পড়ে ঢাল বেয়ে গড়িয়ে যেতে হবে। পতন রোধ করার জন্যে কোনও অবলম্বন নেই। ঘাসের জমি খুঁজে খুঁজে সতর্ক পায়ে চড়াই ভাঙছি। বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎই উপর থেকে একটা লোমশ কুকুর ডাকতে ডাকতে আমাদের দিকে নেমে আসছে। আমি একপাশে সরে দাঁড়িয়ে প্রমাদ গুনছি। সে বেটা জগমোহনকে পাশ কাটিয়ে আমার দিকেই আসছে। আচ্ছা উনপাঁজুরে বুদ্ধি বেটার! আমি চোখ বন্ধ করি। আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে। ল্যাজ নাড়ার বহর দেখে বুঝি আমায় দেখে খুশি হয়েছে। আচ্ছা, তাহলে এটাই ওর অভ্যর্থনা করার স্টাইল। এবার আমার সামনে সামনে পথ দেখিয়ে চলতে থাকে। এসে পৌঁছই গাছের গুঁড়ির খুঁটি, ডালপালার বেড়া দিয়ে বানানো এক মজবুত কুটিরের সামনে। কাঠের তক্তা চিড়ে তৈরি একটা বেঞ্চও রয়েছে। বেঞ্চিতে উজ্জ্বল গৌরবর্ণের এক স্বাস্থ্যবান যুবক বসে আছে। পরণে ধুতি, পায়ে কেডস, ফতুয়ার উপর জড়ানো গায়ের চাদর। উন্নত ললাটে তিলক কাটা, ছোটো করে ছাঁটা চুল প্রশান্ত হাস্যে স্বাগত জানায়। যুবক রুদ্রনাথ মন্দিরের সেবাইত। নিচে গিয়েছিল প্রয়োজনীয় কাজে, আজই রুদ্রনাথ ফিরে যাবে। আমরা আজ হংস বুগিয়ালে রাত কাটাব শুনে বলে, একটু পা চালিয়ে যাবেন। আবহাওয়া ভালো নয়। আমি বুগিয়ালে ফতে সিংকে আপনাদের আসার কথা বলে যাব। বলে সেবাইত নমস্কার করে গাত্রোত্থান করেন।

আমিও হাস্যমুখে প্রতি নমস্কার জানাই। ততক্ষণে কুটির থেকে বেরিয়ে আসেন এক প্রৌঢ়। শক্ত মজবুত গড়ন। মিলিটারি থেকে অবসর নিয়ে এখানে যাত্রীদের জন্যে কুটির বানিয়েছেন। থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেন সামান্য অর্থের বিনিময়ে। তবে দু-তিনজনের বেশি এখানে থাকা সম্ভব নয়। সঙ্গে তাঁবু থাকলে সামনের জমিতে খাটানো যেতে পারে। কিছু কথা, ক্ষণিক বিশ্রাম এবং চা-পানের বিরতি। তিনিও আমাদের পা চালিয়ে যাবার পরামর্শ দেন। তাঁর পোষ্য সারমেয়-পুঙ্গব জঙ্গলের কিনারা পর্যন্ত আমাদের এগিয়ে দিয়ে ফিরে যায়।

কুণ্ডি থেকে শুরু হয় গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে সরু পথ। আমরা চড়াই ভেঙে উঠতে থাকি। সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে, মেঘ জমছে আকাশে। আমরা বিরামহীন হাঁটছি। জগমোহনের গান বন্ধ হয়ে গেছে। দু-এক ফোঁটা বৃষ্টির জল গায়ে লাগছে। আকাশ মেঘে ঢাকা। চলার বিরতি দিয়ে পথের মাঝে পিঠের রুকস্যাক নামিয়ে মোটা উইন্ড চিটার পড়ে নিই। ফোল্ডিং ছাতাটা জগমোহনকে এগিয়ে দিই। টর্চটা বের করে পকেটে ঢোকাই। এখনও দিনের আলো আছে, আশা করছি সন্ধ্যের মধ্যে পৌঁছে যাব। আবার দ্রুত হাঁটতে থাকি। ফোঁটায় ফোঁটায় বৃষ্টির তেজ বাড়তে থাকে। আকাশ ঘন মেঘে ঢেকে গেছে, আলো কমে আসছে। এবার হাওয়া বইতে শুরু করেছে সঙ্গে বিদ্যুতের চমক। উইন্ডচিটারে সামলানো যাচ্ছে না। ক্রমশ শরীরের ভেতরে জল প্রবেশ করছে। কতক্ষণ পরে জামা প্যান্ট সমেত বৃষ্টির জলে চান করে গেলাম। জুতোর মধ্যে জল ঢুকে জুতো ভারি হয়ে উঠেছে। এখন থামলে চলবে না, থামলে কাঁপুনি শুরু হবে। ঘন অন্ধকারে চারিদিক ঢেকে যায়। ঘন ঘন বাজ পড়ার আওয়াজ সঙ্গে বৃষ্টির দাপট। টর্চ বের করে লাভ নেই, জ্বলবে না। সামনে জগমোহনের সঙ্গে পা মিলিয়ে চড়াই ভাঙছি। জগমোহনকে জিজ্ঞেস করি, আর কতদূর? তার উত্তরে ভয়ঙ্কর শব্দ করে বাজ পড়ল কাছেই। চড়াই শেষ হয় জঙ্গলের সীমানায়। এখন ফাঁকা এক ঘাসের ময়দান। এমন সময় দেখি নিকটেই এক আলোর উৎস মৃদু মৃদু দুলছে। সম্ভবত আমাদেরই সংকেত দিচ্ছে। আলোর উৎসে পৌঁছে মানুষের গলার আওয়াজ পাই। কণ্ঠস্বর ভরসা জোগায়, আর চিন্তা নেই। তোমরা পৌঁছে গেছ। আমি অনেকক্ষণ ধরে তোমাদের আশায় দাঁড়িয়ে আছি। –ইনি নিশ্চয়ই ফতে সিং, বলি ফতেজী, তাড়াতাড়ি আমাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করুন। ফতে সিং গাছের ডালপালা দিয়ে ছাওয়া ঘরের আগল ঠেলে আমাকে ঘরে ঢুকিয়ে দেন। ঘরটা বেশ বড়ো। চালা থেকে একটা লণ্ঠন ঝুলছে, পায়ের নীচে শুকনো ঘাসের পুরু আস্তরণ। –তুমি পোষাক বদলাও আমি তোমার খাবার ব্যবস্থা করি। বলে ফতে সিং বেরিয়ে যায়। দ্রুত হাতে জামাকাপড় খুলতে থাকি। পায়ের জুতো কোথায় পড়ে রইলো। স্যাকের ভিতরে প্লাস্টিকের জ্যাকেটের মধ্যে থেকে শুকনো জামা প্যান্ট বের করতে থাকি দ্রুত হাতে। এবার কাঁপুনি শুরু হয়েছে। সে কাঁপুনি থামতে চায় না। কয়েকটা মোটা কম্বল পাট করা ছিল মেঝেতে। কোনও মতে তার একটাকে পেতে আর একটা গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়ি। কতক্ষণ এমন পড়েছিলাম মনে নেই। খুব শীত করছে, মাথা ভার চোখ জ্বালা করছে। বুঝতে পারি জ্বর আসছে। খাবার নিয়ে ফতে সিং ঘরে আসে। তখনও বাইরে অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে। জিজ্ঞেস করি জগমোহন কোথায়?

–আমার ঘরে, রান্না করছে। আপনি খেয়ে নিন। বলে থালায় গাওয়া ঘি মাখানো খানকয়েক গরম রুটি, লঙ্কার আচার আর বাটিতে অড়হর ডাল আমার সামনে রাখেন। গায়ে কম্বল জড়িয়ে বসে খিদের মুখে আমি পরমতৃপ্তিতে খেয়ে যাচ্ছি আর ফতে সিং সামনে বসে গল্প করছেন। –পণ্ডিতজীর কাছে খবর পাওয়া ইস্তক তাঁর খুবই চিন্তা হচ্ছিল। কারণ আকাশের যা অবস্থা তাতে বৃষ্টিতে ভিজতে হবে আমাদের আর পৌঁছতেও সন্ধ্যে হয়ে যাবে। তবে তাঁর একটাই ভরসা সঙ্গে জগমোহন আছে। তীর্থযাত্রার সময় এ পথে যাত্রীদের নিয়ে সে অনেকবার ওঠা নামা করে। তিনি বলে চলেন, এখানে তিনি একাই থাকেন। নীচে সিরোলী গ্রামে তাঁর বৌ, একমাত্র ছেলে নন্দন, ছেলের বৌ ফুলবতি, দুই নাতি প্রকাশ আর প্রভাতকে নিয়ে সুখেই আছে। এখানকার জমি পাটোয়ারীর কাছে পাট্টা নেওয়া আছে। কুটীর বানাবার অনুমতি আর গরু মোষ চড়াবার শর্তও আছে সে পাট্টায়। বুগিয়ালের আশপাশের গভীর জঙ্গলে জংলী জানোয়ারের ভয় আছে। তবে তারা এখনও পর্যন্ত তার বা তার পোষ্যদের কোনও ক্ষতি করেনি। পোষ্য বলতে তার কয়েকটি গরু আর মোষ। তাঁর বয়েস হচ্ছে বৌ-ছেলে এখানকার পাট চুকিয়ে গ্রামে ফিরে যাবার তাড়া দিচ্ছে। –ফতে সিং বলে চলেছেন আর খেতে খেতে আমি মাঝে মধ্যে কথা বলছি। বুঝতে পারছি একা থাকেন তাই লোকজন পেলে মনের কথা বলার সুযোগ পান।

রাতে কাঁপুনি দিয়ে ধুম জ্বর এলো। সারারাত আচ্ছন্নের মতো পড়ে থাকলাম। ভোর রাতে মাথা তুলতে গিয়ে পারলাম না। মাথা ভার হয়ে আছে, সারা শরীরে ব্যথা। একবার উঠতে হবে। প্রকৃতির ডাকে কোনওরকমে উঠে বাইরে এসে বুঝতে পারি শরীর বেশ দুর্বল। রাত এখন কত কে জানে। আকাশের গায়ে ঘন মেঘের আস্তরণ। ফিরে এসে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ি। বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আধো জাগরণে শুনতে পাই পাশের কুটীর থেকে ফতে সিং চড়া গলায় কথা বলছেন। জগমোহন রাতে কখন এসে আমার পাশে শুয়েছে। এখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। রাতে তাঁর পরিচিত কেউ এসেছে সম্ভবত। ফতেজী নাগারে বকে যাচ্ছেন, –আরে ভাই ওঠ, জলদি কর। আমাকে তো ঘর দোয়ার পরিষ্কার করতে হবে। রোজদিন তোমাদের সঙ্গে এই ঝগড়া ঝাঁটি একদম ভালো লাগে না। যেভাবে তিনি কথা বলছেন তাতে মনে হচ্ছে বেশ কয়েকজনই এসেছে এবং তারা এখানেই থাকে। ফতেজী বকে যাচ্ছেন অথচ অপর পক্ষ নিরুত্তর। তার মানে এমন বকাবাকি এদের গা সওয়া হয়ে গেছে। আবার তাঁর বকাঝকা শুরু হোল! বলে চলেন, মৌসুম

খারাপ ঠান্ডাও আছে, একথা মানছি। তাবলে কি পেট মানবে? মানুষজনের লাজলজ্জা বলেও তো একটা ব্যাপার থাকে নাকি।

—বটেই তো। একজন মুখবুজে খেটে যাবে আর অন্যরা আয়েস করবে। এ কেমন কথা? আমি মনে মনে তাঁকেই সমর্থন করি। অপর পক্ষ এততেও নিশ্চুপ। মনে হচ্ছে সত্যি সত্যি এদের কোনও লজ্জা সরমের বালাই নেই।

বেড়ার ফাঁক দিয়ে দিনের আলো এসে পড়েছে। কোনওরকমে উঠে গায়ে কম্বল জড়িয়ে চায়ের সন্ধানে বাইরে আসি। পাশেই বেশ বড়োসড়ো একটা কুটীর। আগল ঠেলে ভিতরে প্রবেশ করি। আগলের ডানদিকে উঁচু বেদী। কাঠের র‍্যাকে রান্নার বাসনপত্র, কৌটোতে মশলাপাতি, আচারের শিশি। কোণায় কাঠের উনুন। পাতলা দোহারা গরণ, টিকালো নাক, কয়েকদিনের না কামানো কাঁচাপাকা দাড়ি, মাথায় ভেড়ার লোমের টুপি, চোখের চাহনিতে শান্ত মিষ্টি অভ্যর্থনা। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে ইনিই ফতে সিং। —ঘুম ভাঙলো বাবুজি। এখন তবিয়েত কেমন লাগছে বলে মোটা করে পাতা কম্বলের এক পাশে বসতে অনুরোধ করেন। বসতে গিয়ে লক্ষ্য করি ফতেজীর গা ঘেঁষে এক লোমশ কুকুর চোখ বুজে শুয়ে আছে। একবার চোখ খুলে আমাকে দেখে আবার চোখ বোজে।

—শরীর বেশ দুর্বল। এখনও জ্বর রয়েছে। বলে কাঠের উনুনের সামনে পাতা কম্বলে বসি।

—আপনি কোনও চিন্তা করবেন না। দরকার হলে দু-একদিন এখানে থেকে সুস্থ হয়ে নিন। বলে আমার জন্যে চা তৈরিতে মন দেন। ঘরটি অনেকখানি লম্বাটে। অপরপ্রান্তে তিনটে গরু এবং দুটো মোষ পাশাপাশি বসে নিশ্চিন্তে জাবর কাটছে। আমি কৌতুহলী হয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছি। ফতেজী কাদের সঙ্গে এতক্ষণ বকবক করছিলেন। ঘরের মধ্যে দ্বিতীয় কোনও মানুষ চোখে পড়ে না।

—কাদের সঙ্গে কথা বলছিলেন ফতেজী? কাউকে তো দেখছি না।

—কেন? ওই যে রাজ নন্দিনীরা সব শুয়ে বসে আয়েস করছে, দেখতে পাচ্ছেন না। বলে বিশ্রামরত প্রাণীগুলিকে ইঙ্গিত করেন।

তাহলে এরাই আপনার অশান্তির কারণ। বলে আমি হেসে ফেলি।

আপনি হাসছেন বাবুজী? ভাবছেন ওরা কোনও কথা বুঝতে পারে না? সব পারে শুধু মানুষের ভাষা জানে না। আমি ওদের মনের কথা সব বুঝতে পারি। এই যে দেখছেন ভালোমানুষের মতো চোখ বুজে আয়েস করছে, একবার আমি এই ঠেঙাটা নিয়ে উঠে দাঁড়াই দেখবেন সব কটা তড়িঘড়ি উঠে পড়বে। বিরক্তিভরা চোখে ওদের দিকে তাকিয়ে আমার হাতে চায়ের গেলাস ধরিয়ে দেন।

ফতেজী বলতে থাকেন, ওরা বুঝে গেছে এই বুড়ো ওদের ছেড়ে এক পাও কোথাও যেতে পারবে না। এমন সব আহ্লাদিদের নিয়ে ঘর করা আর সহ্য হচ্ছে না। গরম চায়ে চুমুক দিয়ে বলি, তাহলে এদের নিয়েই আপনার ভরপুর সংসার, কি বলেন? হঠাৎ করে তাঁর গলার স্বর কোমল হয়ে আসে। শান্ত গলায় বলেন, এদের উপর আমার বড়ো মায়া পড়ে গেছে বাবুজী। একথা সত্যি যে ওদের ছেড়ে কোথাও গিয়ে আমি দুদণ্ড থাকতে পারি না। আজ কত বছর হয়ে গেল এই মনুষ্যহীন জঙ্গলে একা একা ওদের নিয়ে আছি। সে সময় ওদের দুধ মাখন বেচে সংসার প্রতিপালন করেছি। এখন ছেলে সংসারের সব দায়িত্ব নিয়েছে। ঘরওয়ালি বলে অনেক তো হল এবার নিচে গ্রামে চলে এসো। শেষ জীবনটা আরাম কর। আমার বয়স হয়েছে শীতে কষ্ট পাই। সারাদিন ওদের পিছনে খুব খাটতে হয়। মাঝে মাঝে ভাবি ওদের নিয়ে গ্রামেই চলে যাব। কিন্তু কি জানেন, নিচের গরমে ওদের খুব কষ্ট হবে। তবিয়ত খারাপ হবে। কথা বলতে পারে না, অন্য কেউ ওদের কষ্ট বুঝবে না কিন্তু আমি ওদের কষ্ট সইতে পারব না। —বলে করুণাভরা চোখে গরু মোষগুলোর দিকে তাকায়। তারা তখনও নিশ্চিন্তে জাবর কাটছে।

সে যাত্রা আমার রুদ্রনাথ যাওয়া হয়নি। দুর্বল শরীরে জ্বর গায়ে ফতে সিং-এর কাছে বিদায় নিই। আসার সময় আমার দুটি হাত ধরে বলেন, আবার আসবেন বাবুজী। তাঁকে বৃথা কথা দিতে মন চায়নি। বলেছিলাম, আবার আসতে পারব কিনা বলতে পারব না ফতেজী। কিন্তু আপনার কথা আমার সারাজীবন মনে থাকবে। মনে থাকবে আহ্লাদী এই অবলা প্রাণীগুলিকে নিয়ে আপনার স্নেহাতুর পিতৃহৃদয়ের কথা।

পরিচিতি

চন্দননগর মাউন্টেনিয়ারিং অ্যাসোসিয়েশনের প্রাণ পুরুষ। কলমে সিদ্ধহস্ত। অনেক সফল অভিযানের নেতা। প্রতিবন্ধীদের নিয়ে ক্যাম্প করেন নিয়মিত।

-এর আগামী সংখ্যা বৈশাখ-১৪২৪

ভ্রূ-পল্লবে ডাক দিলে পলাশের বনে

সুস্মিতা চক্রবর্তী

"তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে গিলে মোর প্রাণে/সে আগুন ছড়িয়ে গেল সবখানে..." বসন্ত প্রকৃতির সুর পলাশের ডালে ডালে আগুন হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে বাঁকুড়ার পথে-ঘাটে। অহল্যাবাঈ হোলকার রোড ধরে চলেছি শুশুনিয়া পাহাড়। হুগলী জেলার আলুক্ষেতময় ভুবন পেরোতেই দিগন্তে, পথের কিনারায়, জনপদের ফাঁকে শুধুই রাঙা পলাশের উঁকিঝুঁকি। আকাশমণি আর শালগাছের সাথে রক্তপলাশের সখ্য দেখতে দেখতে জয়পুর জঙ্গল, বিষ্ণুপুর আর বাঁকুড়া শহরকে পিছনে ফেলে, লোকজনকে শুধোতে শুধোতে এক অলৌকিক বসন্তে পৌঁছে যাই 'আরণ্যকে', এখানকার পঞ্চায়েতের গেস্টহাউসে।

বেলা প্রায় আড়াইটে। মধ্যাহ্নভোজন পর্ব পথেই মিটিয়ে এসেছি। মার্চের সাত তারিখে রোদ্দুর অসহ্য না হলেও যথেষ্ট চড়া। এখন তাই পড়ন্ত বেলার অপেক্ষা। একটু বিশ্রামের জন্য গা এলাতেই দেখি, জানলার ওপাশে পলাশের হাতছানি। লবুটলিয়া, নাড়াবইহারের মোহিনী রূপ দেখিনি। মনকে নাকি তা নিয়ে যেতে পারে চিরছন্নছাড়া নিরুদ্দেশের ঠিকানায়। এই লালমাটির ঢেউ খেলানো ধূ ধূ প্রান্তরে, আগুন রঙা পলাশের রূপ উড়িয়ে নিল সব শ্রান্তি। কোথায় বা গেল ঘুম। কোথায়বা বিশ্রাম। সোয়া চারটে পর্যন্ত ছটফট করে বেড়িয়ে পড়লাম, পলাশের পথ বেয়ে ইচ্ছেখুশীর ভ্রমণে। হঠাৎ দেখা কয়েকটি ফ্রক পরা ইসকুল বালিকার সঙ্গে। সরল ভাসা চোখে কৌতূহল। ঠোঁটে টেপা হাসি। মুখে সহজ প্রশ্ন, 'কাদের বাড়ি যাচ্ছ তোমরা?' বলি, 'তোমাদের বাড়ি। নিয়ে যাবে?' 'হ্যাঁ আ আ...' সম্মিলিত উদার নিমন্ত্রণ আসে তক্ষুণি। নিঃসংকোচ, দ্বিধাহীন। কয়েকটি পলাশমুহূর্ত ফ্রেমেবন্দী করে এগিয়ে যাই নতুন বন্ধুদের পিছু পিছু।

'গোধূলি আঙুল রাখে আলগোছে পথের নুড়িতে'। দিগন্তের জলছবি ফিকে হয়ে আসছে দ্রুত। গ্রাম কাছেই। পিচ রাস্তা ছেড়ে লালমাটির পথ ধরি। এটা মণ্ডল পাড়া। ঢুকে পড়ি পৌলমীর বাড়ি। মাটির দেওয়াল ঘেরা বাড়ির উঠোনে খাটিয়া পেতে বসে গল্প করছিলেন মা-মাসিরা। আচমকা অনুপ্রবেশকারীদের দেখে সচকিত হয়ে ওঠেন সবাই। কিন্তু নিজেদের অনাহূত মনে হয় না একবারও। সাদরে সবাই ডেকে নেন– একটু বসতে, চা খেয়ে যেতে। বলি, 'আরেক সময় হবে। আজ বাচ্চাদের সাথে বেড়িয়ে পড়েছি গ্রাম দেখতে।' মায়েরা বলেন জলের কষ্টের কথা। স্নানের তো বটেই, খাবার জলটুকুও মিলতে চায় না কখনও কখনও। বছরে চাষ একবারই, তাও বৃষ্টি হলে। এ বছর বৃষ্টি হয়নি, তাই হয়নি চাষও। শুনতে শুনতে ভুলে যাই এ গ্রাম ছাতনা শহর থেকে মাত্র ১৩ কিলোমিটার দূরে। আর আমার ঘর থেকে মোটে ২০০ কিলোমিটার। সত্যি ভারতবর্ষটা আমাদের কত কাছেই তবু কত সহস্র আলোকবর্ষ দূরে!

আট তারিখ ভোর সাড়ে সাতটায়, আমাদের গাইড রাজেশের পিছু পিছু বেড়িয়ে পড়ি শুশুনিয়া অভিযানে। প্রায় ১,০০০ ফুট উঠতে হবে রোদের তেজ বাড়ার আগেই। সুভাষমোড়ের কাছে জলযোগ সেরে, বাঁহাত ঘুরে, পিচরাস্তা দিয়ে আর একটু এগিয়ে নেমে আসি মূল সড়ক ছেড়ে। শাল, কুল, জংলী বেল, একধরনের জংলী কাঞ্চন আর সাদা ধবধবে শাখা-প্রশাখা মেলে দাঁড়িয়ে থাকা নাম-না-জানা গাছের পায়ে পায়ে জড়ানো সুঁড়িপথ বেয়ে এগিয়ে চলি অরণ্যের অন্দরমহলে। চড়াই পথের দু-ধারে কোটি কোটি বছরের প্রাচীন পাথুরে শরীরে বাতাস ও জলের ক্ষয়কার্য রচনা করেছে এক আশ্চর্য ভাস্কর্যের সমাহার। নুড়ি-পাথরের সমুদ্রে শিরা, উপশিরা হয়ে ছড়িয়ে রয়েছে বিভিন্ন গাছের শিকড়। পাথরের বুকে জলের সন্ধানে এই প্রবল সংগ্রাম দেখতে দেখতে মনে পড়ে যায় পৌলমীর মায়ের মুখ। পিছনে ফিরে দেখি ধূ ধূ রুখামাটির পটচিত্র ফুটে উঠছে। এককণা শস্যের চিহ্ন নেই কোথাও।

শুশুনিয়া পাহাড়ের তিনটি চূড়া। আমরা চলেছি সবচেয়ে উঁচু চূড়াটির দিকেই। পথের মাঝে মাঝে চোখে পড়ছে রক ক্লাইম্বিং-এর আয়োজনের চিহ্ন। বুনো শুয়োর ও হরিণ আছে, জানাল রাজেশ। মাঝে মাঝে হানা দেন 'গণেশবাবার' দলও। আপাতত চোখে পড়ল না কাউকেই। নিভৃত অরণ্যের নিরালায়, ঝরাপাতায়, ডালের তন্ত্রীতে সুর তুলেছে শুধু এক অদৃশ্য Solitary reaper। প্রাচীন এই অরণ্যে নাকি পাওয়া গেছে বিভিন্ন প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর জীবাশ্ম। জিরাফ, এশিয়াটিক লায়ন, হায়েনার পদচারণার সেই সুদূরের সাক্ষর চোখে না পড়লেও, অরণ্যের নির্জনতা প্রতিমুহূর্তে যেন ফিসফিসিয়ে ওঠে– stop here or gently pass. এখানে পলাশের রক্তিম উচ্ছ্বাস নেই। পাহাড় চূড়ায় দাঁড়িয়ে অনুভব করার চেষ্টা করি সেই মহাকালের গতিছন্দকে। অনেককালের সাক্ষী, প্রাচীন এই অরণ্যদেবতাকে উৎসর্গ করি মুগ্ধ হৃদয়ের অঞ্জলি। দশটা প্রায় বাজে। এবার উৎরাই পথে এগিয়ে চলি রাজেশের সাথে। এ পথেই পড়ল চতুর্থ শতকে চন্দ্রবর্মা নামে এক রাজার তৈরি একটি শিলালিপি। সভ্য মানুষের অসভ্য আঁচড়ে কলঙ্কিত হওয়ার পরে সুপ্রাচীন এই শিলালিপিটি এখন ASI রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে। তবে ধারেকাছে খুঁজেও ইতিহাসটি পেলাম না কোথাও। কাঠের ফ্রেমের জালের আড়ালে শিলালিপিটি স্পষ্টভাবে ঠিকমতো দেখতেও পাওয়া যাচ্ছে না। দর্শকদের কাছে এমন প্রাচীন এক ইতিহাসের সাক্ষর সঠিকভাবে তুলে ধরার কোনও চেষ্টাই নেই। ফিরতিপথে কুড়িয়ে নিলাম কটি নুড়ি-পাথর আর বিচিত্র দর্শন অচিন এক গাছের বীজ। প্রাচীন অরণ্যের সাক্ষর।

বিকেলে, রাজেশ জানালো আমরা যাব ঝরনা দেখতে। শুশুনিয়া পাহাড়ের নীচে ঝরনা যাওয়ার রাস্তায় গড়ে উঠেছে ইকো পার্ক। ট্যুরিস্টদের থাকার ও বিনোদনের ব্যবস্থা। পথের দুধারে গ্রামের মানুষজন বসেছেন, মাকড়া ও বেলে পাথরে তৈরি শিল্পসামগ্রীর পশরা সাজিয়ে। একটি ক্ষীণ জলধারাকে ঘিরে এই পড়ন্ত বেলাতেও প্রচুর নারী-পুরুষের ভিড়। এই জল নাকি অতি পবিত্র ও স্বাস্থ্যকর। পাশেই কালী ও দুর্গা মন্দির। ঝরনা দেখে হতাশ হলেও, বাংলাদেশের এই লালপাহাড়ি গ্রামের উৎসবমুখর, পলাশরঙা সন্ধ্যার ছবিটি মনে থেকে যাবে চিরকাল।

পরেরদিন ভোর সাড়ে ছটায় বেরিয়ে পড়ি বিষ্ণুপুরের উদ্দেশে। কলকাতা ফেরার পথে দেখে যাব এখানকার বিখ্যাত টেরাকোটা মন্দিরগুলি। শুশুনিয়াকে পিছনে ফেলে পলাশময় প্রান্তর পেরিয়ে বিষ্ণুপুর পৌঁছই প্রায় ৯টা নাগাদ। মল্লভূমে, রাসমঞ্চ দিয়ে শুরু করি আরেক আশ্চর্য ভ্রমণ। বিষ্ণুপুরের বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত রাজা মল্লরাজ বীর হাম্বির ১৫৮৭ খ্রিস্টাব্দে নির্মাণ করিয়েছিলেন এই অনিন্দ্যসুন্দর স্থাপত্যটি। এর চূড়াটির গঠনশৈলীতে মিলন ঘটেছে ইসলামিক গম্বুজ, হিন্দু আটচালা ও রথাকৃতি চূড়ার বৈশিষ্ট্য। সমগ্র ছাদটি দাঁড়িয়ে রয়েছে মন্দিরের খিলানগুলির উপর। গাইডদাদা জানালেন, ইটের গাঁথনিতে ব্যবহার করা হয়েছে গেঁড়ি, গুগলি, শামুক চূর্ণ, ডিমের খোলার গুঁড়ো। সে যুগে সিমেন্ট আবিষ্কার হয়নি। মন্দির গাত্রের প্রতি ইঞ্চিতে রয়েছে পোড়ামাটির কাজ। মল্লরাজাদের আমলে বার্ষিক রাস উৎসবের সময়ে বিষ্ণুপুরের সমস্ত রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ নাকি জনসাধারণের দর্শনের জন্য এখানে আনা হত। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চলেছে এই রাস উৎসব। সামনের প্রাঙ্গণে প্রজাদের সঙ্গেই ছিল রাজার আসনও। ইতিহাসের আশ্চর্য অলিন্দের পথ বেয়ে চলি। দেখি বাঙালির গৌরবময় শিল্পোৎকর্ষের জলছবি ফুটে রয়েছে মন্দির গাত্রের পোড়ামাটির নকশায়, যার উপজীব্য রামায়ণ, মহাভারতের কাহিনি, রাধাকৃষ্ণ লীলা, সে যুগের সামাজিক জীবনচিত্র এমনকি চাইনিজ ড্রাগনও।

রাসমঞ্চ দেখে চলি পঞ্চরত্নমন্দিরের উদ্দেশে। রাসমঞ্চের ৪ কিলোমিটারের মধ্যেই অবস্থান এইসব মন্দিরগুলির এবং প্রবেশের জন্য সর্বত্র একই টিকিট, যা রাসমঞ্চ থেকেই সংগ্রহ করতে হয়। ১৬৪৩ খ্রিস্টাব্দে মল্লরাজা রঘুনাথ সিং নির্মিত এই মন্দিরটি সুপ্রসিদ্ধ এর অনবদ্য টেরাকোটা কাজের জন্য। পাঁচটি চূড়ার মধ্যমণিটি অষ্টকোণ বিশিষ্ট ও বাকিগুলি বর্গাকৃতি। শ্যামরায় মন্দির নামেও এই মন্দিরটি প্রসিদ্ধ।

পরবর্তী গন্তব্য জোড়বাংলা বা কেষ্টরাই মন্দির। এটিও নির্মাণ করিয়েছিলেন রঘুনাথ সিংহ ১৬৫৫ খ্রিস্টাব্দে। পরস্পর সংলগ্ন দুটি দোচালা কুটির যুক্ত হয়েছে একটি চারচালা শিখর দ্বারা। তাই জোড়বাংলা। আগের মন্দিরগুলির মতো এখানেও মন্দিরগাত্রে পোড়ামাটির নকশায় শিল্পীর ছোঁয়ায় প্রাণ পেয়েছে রামায়ণের কাহিনি, সমাজকথা, শিকার দৃশ্য।

জোড়বাংলা মন্দির থেকেই কয়েক পা দূরত্বে বিষ্ণুপুরের অতীত গৌরবের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ল্যাটেরাইট পাথর নির্মিত বড়ো দরওয়াজা। সতেরশো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মল্লরাজ বীরসিংহের আমলে তৈরি এই দুয়ারটি ছিল বিষ্ণুপুরের দুর্গের উত্তর দরজা। বড়ো দরওয়াজা পেরিয়ে উন্মুক্ত প্রান্তরে আরেকটু এগোলেই ছোটো দরওয়াজা। এটিও বীরসিংহের আমলেই তৈরি। বাংলার এক সমৃদ্ধ, গৌরবময় অতীতের সাক্ষীদুটিকে পিছনে ফেলে গাইডের পিছু পিছু এবার চলি রাধেশ্যাম মন্দিরের দিকে। ১৭৫৮ খ্রিস্টাব্দে চৈতন্য সিং এটি নির্মাণ করিয়েছিলেন। বর্গাকৃতি, দক্ষিণমুখী এই দেবালয়টি এক প্রাচীর বেষ্টিত প্রাঙ্গণের মধ্যে অবস্থিত। এই মন্দিরের শিখরটি গম্বুজাকৃতি এবং বিষ্ণুপুরের অন্যান্য একরত্ন মন্দির অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ভিন্ন। মন্দিরের গায়ে এখানেও ফুলকারি ও জ্যামিতিক ভাস্কর্য, মহাভারত ও পুরাণের কাহিনির সাবলীল উপস্থাপনা রয়েছে। এই মন্দিরে এখনও পূজার্চনা হয় এবং পার্শ্ববর্তী বিষ্ণু মন্দিরের বিগ্রহ এই মন্দিরটিতে রাখা রয়েছে।

বিষ্ণুপুর ভ্রমণ শেষ করি দলমাদল কামান দিয়ে। বর্গী আক্রমণের হাত থেকে মল্লরাজ গোপাল সিংহের আমলে এই কামান রক্ষা করেছিল বিষ্ণুপুরকে। কথিত আছে, পরমভক্ত গোপাল সিংহ এবং তাঁর প্রজাদের রক্ষা করবার জন্য স্বয়ং মদনমোহন নাকি চালিয়েছিলেন এই কামান। ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছিল মারাঠা সর্দার ভাস্কর পণ্ডিতের বর্গী বাহিনী। লালমাটির ধূলায় ওড়ে এমন সব আশ্চর্য কাহিনিরেণু। দলমাদল আসার পথেই গাইড দেখিয়েছিলেন লালবাঁধ। দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহের প্রেমিকা নতর্কী লালবাঈ ও তার ছেলেকে নাকি নৌকো সহ রানি ও প্রজারা ষড়যন্ত্র করে ডুবিয়ে মেরেছিল। বিষ্ণুপুরে আছে এমন সাতটি বাঁধ– কৃষ্ণবাঁধ, শ্যামবাঁধ, লালবাঁধ, পোকাবাঁধ, গাঁতাতবাঁধ, কালিন্দী বাঁধ ও যমুনাবাঁধ।

ইংরেজি ৬৯৪ খ্রিস্টাব্দে আদিমল্লের কালে পথচলা শুরু করে বাংলার এই প্রাচীন রাজবংশ দীর্ঘ এগারোশো বছর রাজত্বকালে গড়ে তুলেছে, একের পর এক অনিন্দ্যসুন্দর স্থাপত্য। তার প্রায় প্রতিটির সঙ্গেই জড়িয়ে আছে এমন সব কাহিনি যেখানে ইতিহাস এসে মিশেছে লোককথা ও কল্পনার সাথে। শহরটার ভাঙাচোরা পথঘাট, চরম ঔদাসীন্যে নষ্ট হতে বসা বহু মন্দিরের কারুকার্য দেখে ভাবি, উত্তরসূরিদের জন্য আমরা কী ইতিহাস লিখে চলেছি! এগারোশো বছরের ইতিহাস মাত্র ঘণ্টা তিনেকে স্পর্শ করাও সম্ভব নয়। তাই ফিরে চলি অনেক অজানা আর অদেখাকে সঙ্গে নিয়েই। পর্যটকের ভবিতব্যই তাই। তবু বাঙালির এই গর্বের ইতিহাসের ছোঁয়ায় এক অপূর্ব ভালোলাগায় জারিত হতে থাকে মন। হতেই থাকে।

জরুরী হদিশ

শুশুনিয়ায় থাকার ঠিকানা– আরণ্যক ফোন-০৩২৪২-২৩৪২০১, ইউথ হোস্টেল ফোন-২২৪৮-০৬২৬/২২৬৫-৩২৩১, রেড রক রিসর্ট ফোন-৮৩৮৯০৩৩৮৩১। গাইড রাজেশ, ফোন-৯৬৪১৩-২৭৬৭৭।

পরিচিতি

শিক্ষিকা। নেশা ভ্রমণ। রূপরসিক মনের কথা তার লেখায়।

পবিতোরার জঙ্গলে

কঙ্কণা মুখাৰ্জ্জী

ছবি- সৌজন্য- www.dailymail.co.uk

পবিতোরার জঙ্গল একশৃঙ্গ গণ্ডারের জন্যই বিখ্যাত। গণ্ডারের ঘণত্ব পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি এখানেই। অসমের গৌহাটি থেকে প্রায় ৫০ কিলোমিটার দূরে মারিগাঁও জেলায় ব্রহ্মপুত্রের প্লাবন সমভূমিতে এর অবস্থান। জঙ্গলের সংরক্ষিত এলাকা প্রায় ৩৮.৮১ বর্গকিলোমিটার। যদিও গণ্ডারের বাসস্থান মাত্র ১৬ বর্গকিলোমিটারের মধ্যে সীমাবদ্ধ। পবিতোরাকে ১৯৭১ সালে ভারত সরকার সংরক্ষিত বন হিসেবে ঘোষণা করে। পরে ১৯৮৭ সালে বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য হিসাবে স্বীকৃতি পায়। একশৃঙ্গ গণ্ডারের জন্য বিখ্যাত হলেও অন্যান্য প্রাণীদের মধ্যে চিতা, বন্য শুয়োর, বার্কিং ডিয়ার, বুনো মোষ– এদের বাসস্থানও উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও প্রায় ৩৭৫ প্রজাতির স্থায়ী বসবাসকারী এবং পরিযায়ী পক্ষীকুলের বাসস্থান এটা। একশৃঙ্গ গণ্ডারের সংখ্যাধিক্য হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানে অভয়ারণ্যের বাইরেও এদের চলাচল বৃদ্ধি পাচ্ছে, স্বাভাবিকভাবেই মানুষের সাথে আত্মরক্ষার তাগিদে এদের সংঘাত লেগেই আছে। গণ্ডারের প্রজননের গুরুত্ব বিবেচনায় ভারত সরকার "Indian Rhino Vision 2020" নামে এক বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করেছে। পবিতোরা অভয়ারণ্যের অবস্থান দক্ষিণে গরাঙ্গা বিল, উত্তরে ব্রহ্মপুত্র, বাকি পরিধি কৃত্রিমভাবে তৈরি এবং চারিদিকে ২৭টি গ্রাম দিয়ে ঘেরা।

প্রতিবছর নভেম্বর মাসে এই জঙ্গলটি ভ্রমণার্থীদের জন্য খোলা থাকে। ২০১২ সালের নভেম্বর মাসে আমরা সপরিবারে রওনা দিয়েছিলাম শিলং ও গৌহাটির উদ্দেশে। সেই সঙ্গেই ঘুরে এলাম পবিতোরা। এই যাত্রায় আমাদের প্রধান আকর্ষণ ছিল রোমাঞ্চকর পবিতোরা। এমনিতেই মারিগাঁও জেলাটি Black Magic বা

কালাজাদুর জন্য খ্যাত। স্বাভাবিক ভাবেই ভয়কে সঙ্গে নিয়েই ব্রহ্মপুত্রের পাশ দিয়ে পাহাড়ি আঁকাবাঁকা পথে আমরা এগিয়ে চললাম জঙ্গলের উদ্দেশে। বনবাংলোতে স্থান সংকুলান না হওয়ায় আমাদের থাকতে হল জঙ্গলে প্রবেশের মুখেই সদ্য নির্মিত একটা হোটেলে। সাত তাড়াতাড়ি খাবার খেয়ে দুপুরেই আমরা চললাম জঙ্গলে। জঙ্গল সাফারির সময় বিকেল ৪টে। মাথা পিছু খরচ ৫০০ টাকা। যদিও এখানে জিপ সাফারির ব্যবস্থাও আছে। তবে আমাদের সফর ছিল হাতির পিঠে চড়ে। পবিতোরা জঙ্গলের নিয়ম অনুযায়ী ৪-৫ টি হাতি একসাথে জঙ্গল সাফারিতে যায়। তাই আমাদের বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হল। এরপর লাইন দিয়ে হাতি এসে দাঁড়াল। হাতিগুলোর উপরে বসে ধরার জন্য কিছুই নেই। শুধুমাত্র মাহুত বসে আছে সামনে। যাইহোক ভয়ে ভয়ে আমার ছোট্ট ছেলেকে মাঝে বসিয়ে আমরা তিনজন হাতির পিঠে বসি। ঈশ্বর বিশ্বাসী হলেও সেই মুহূর্তে ভয়ে কোনও দেবতার নাম আমার মনেই আসেনি। যদিও হাতির পিঠে চড়ার সুবিধার জন্য বিশেষভাবে তৈরি একটা উঁচু জায়গা রয়েছে (Elephant riding point)। শুধু ভাবছিলাম অত উঁচু হাতির পিঠ থেকে যদি পড়ি তাহলে কী হবে! আমার কর্তার অবস্থান প্রায় হাতির লেজের উপর– সত্যিই করুণ! সেই হাতি যাত্রায় আমার বাবা হাতির পিঠে উঠতে পারলেও মা পারেননি। মাকে ওয়াচ টাওয়ারে দাঁড় করিয়ে আমরা এগোলাম।

শুরু হল হাতির পিঠে চড়ে জঙ্গল সাফারি। প্রথম কিছুক্ষণ ভয়েই সেরকম রোমাঞ্চ বা আনন্দের অনুভূতি ছিল না। তারই মধ্যে কয়েকটা বুনো মোষ আর বন্যশূকর ছাড়া কিছুই চোখে পড়ল না। তবে ১৫-২০ মিনিট চলার পর যখন ঘাসের জঙ্গলে প্রবেশ করলাম, তখন দেখি প্রায় শ'খানেক একশৃঙ্গ গণ্ডার যত্রতত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। এ এক বিরল দৃশ্য– এখানে যেমন মাঠে গরু চড়ে বেড়ায়। সার্থক আমাদের জঙ্গল সাফারি। এই আশাতেই তো করেছিলাম ভয়কে জয়। তবে এক মজার ব্যাপার– চারটি হাতিকে একসাথে দেখে গণ্ডারগুলো ভয়ে পিছু হটতে শুরু করল। দূরে ছিল একটা পুকুর বা বিল বলা চলে। এই জলাশয়ে অনেক ডাহুকের দেখা মেলে। জেনেছিলাম বিভিন্নপ্রকার মাছেদের গুরুত্বপূর্ণ প্রজনন ক্ষেত্রও এটা। এছাড়া বিভিন্ন প্রজাতির উভচর এবং সরীসৃপের বাসস্থানও এটা। এত সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে এত রকম জীববৈচিত্র্য পর্যটকদের মনকে ভরে তোলে। দূরের ওই বিলে চোখ পড়তেই দেখি একসাথে অনেক গণ্ডার গা চুবিয়ে বসে আছে। প্রাণ ভরে দেখি সে দৃশ্য। এতকাছ থেকে এদের দেখা আমার দেহমনে সত্যিই রোমাঞ্চ হচ্ছিল। তখন বারংবার মাহুতের নির্দেশ আসছিল No sound, no sound! তেমন হলে গণ্ডারেরা রেগে গিয়ে একসাথে আক্রমণ করতে পারে। শুধু ক্যামেরার শাটারের শব্দকে আমরা আটকাতে পারিনি। ওই বিরল দৃশ্য ক্যামেরা বন্দী করার লোভ কি সামলানো যায়?

তখন সময়টা ছিল পড়ন্ত বিকেল। পাহাড়ের কোলে সূর্য অস্তগামী। সূর্যের নরম আলো এসে পড়েছে ঘাসের জঙ্গলে। এক অবিস্মরণীয় মায়াবী শোভা আমাদের চোখের সামনে। মন চাইছিল না ফিরে আসতে। ইচ্ছে হচ্ছিল সূর্যদেবের কাছে প্রার্থনা করি আমাদের আর একটু সময় দেবার জন্য। কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম– তা তো হবার নয়। তাছাড়া অভয়ারণ্যের নিয়মও কঠোর। অগত্যা সেই রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতাকে সঙ্গী করে ফিরে এলাম আমাদের হোটেলে।

প্রসঙ্গত আরেকটি অভিজ্ঞতার কথা না বললে এ লেখা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সেটা হল পবিতোরার রাতের অভিজ্ঞতা– মাত্র তেরো ঘর লোকের বাস ওই জঙ্গল সংলগ্ন অঞ্চলে। রাত যে এত সূচিভেদ্য ও নিস্তব্ধ হতে পারে তা ওখানে না থাকলে হয়তো জানাই হত না। শুনেছিলাম মাঝেমধ্যেই রাতে এ অঞ্চলে বন্যপ্রাণীর আনাগোনা শুরু হয় খাদ্যের অন্বেষণে। গভীর রাত– সবে চোখের পাতা এক করার চেষ্টা করছি, বাইরে থেকে ভীষণ চিৎকারে মনে হল কোনও দুর্ঘটনাই বোধহয় ঘটতে চলেছে। ঘুমের দফারফা, সে সময় বাইরে আসতে সাহস হয়নি, প্রায় বিনিদ্র রজনী কাটিয়ে পরের দিন ভোরে জানতে পারি ফসল খেতে আসা বুনো শূকরদের তাড়াতেই স্থানীয় মানুষেরা ওইরকম চিৎকার করে থাকে– যেন ধড়ে প্রাণ এল।

পরদিন রৌদ্রোজ্জ্বল সকালবেলায় সমস্ত ভয়-ভীতিকে বিসর্জন দিয়ে রওনা হলাম গৌহাটির উদ্দেশে। এই প্রসঙ্গে বলতেই হয় পবিতোরা এখনও পর্যন্ত পর্যটকদের কাছে খুব জনপ্রিয় হয়নি বলে প্রকৃতি তার সৌন্দর্যকে অটুট রাখতে পেরেছে। কদিনের জন্য ঘুরে আসুন এখানে। আপনার ভ্রমণ রোমাঞ্চে ভরে উঠবে– কথা দিচ্ছি।

যোগাযোগ:
পবিতোরা, নৃপেন্দ্রনাথ, মোবাইল-০৯৮৫৪৬১২১৯৬।

পরিচিতি
শিক্ষিকা, ভ্রমণ পিয়াসী।

গণ্ডুছ

প্রসঙ্গ ভ্রমণ

অতীন্দ্র শঙ্কর রায়ের Indian Tourist
ষাটের দশকের শেষদিকের পত্রিকা,
অনেকের মতে এটাই নাকি পশ্চিমবঙ্গের
প্রথম পর্যটন পত্রিকা।
পরে তাঁর সম্পাদনায় ১৯৭৯ সাল নাগাদ
প্রকাশিত হয় Travel World

শূলনী-সাপের লেখা

সত্যব্রত মুখোপাধ্যায়

রূপনারায়ণের বুকে চর পড়েছে। আশ্বিনের শেষ, কার্তিকের শুরু। আজ পয়লা। নদীর চরে আধমরা কাশ, দলবেঁধে দাঁড়িয়ে শরতের বিজ্ঞাপন হয়ে। কেউ কেউ ন্যুব্জ খোলা হাওয়ার দরাজ ঝাপটায়। একটা-দুটো ছাগল ছানা সেঁধিয়ে গেছে কাশ-গোড়ার ঘাসের টানে। মেছো বকগুলো সন্তর্পণে পা ফেলছে চরের কাদায়, খঞ্জনা ন্যাজ নাচিয়ে ওদের যেন ভেংচি কাটছে। পেঁজা-পেঁজা তুলো মেঘ নীল আকাশে, বর্ষা এখনও যায়নি। আবহাওয়া আপিসের নিম্নচাপ হামেশাই চোখ রাঙাচ্ছে, তাই ভয়ে ভয়ে মেঘের ছানা মায়ের কোলে বসে জলের আয়নায় মুখ দেখছে।

কোলাঘাটের কথাশিল্পী সেতু পার হচ্ছি। নামটা শুনলেই কেমন ইলিশ-ইলিশ গন্ধ ভাসে। নিচে ছোটো ছোটো পাল তোলা ডিঙি নৌকাগুলো বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মওকায় পেলে মা-ধন, বাপ-ধন, যেই হোক না কেন বুকে বরফ চাপিয়ে সোজা চালান দেবে সদরে। শ্বশুর খাবে, জামাই খাবে। মাথায় ওদের শুধুই ইলিশ ধরার ফন্দি-ফিকির।

সেই সকালে বেরিয়েছি, ছুঁচো ডন দিতে দিতে প্রায় অচৈতন্য। ছোটকা অবস্থা বুঝে এক ধাবায় ধপ করে নেমে পড়ল। সাত সকালে লক্ষ্মী আগমন। ধাবাপতির সাঙ্গ-পাঙ্গরা ছুটে এলো। আমাদের অভ্যর্থনায়। তেলচিটে তক্তোপোষের আদত বাসিন্দারা একটু উড়ে পাশে সরে বসল। অন্দরমহলে যারা থাকে তাদের এ, বি, ও-এত হিসেব বোঝা হয় না, মগজ ওদের নির্দেশ দেয় শুষতে থাকো—আপনি বাঁচলে বাপের নাম।

গরম গরম আটার রুটি, মটরের ঝোল (এরা বলে ঘুঘনি) কাঁচা পিয়াঁজ আর পাঁচ মিশেলি আচার সঙ্গে মালাই-চা। গাড়িটা আবার ডানদিকে গড়িয়ে ছুটতে শুরু করল।

এখান থেকে কয়েক কিলোমিটার গেলেই দেউলিয়া বাজার। বাজারের বুক ফেড়ে সোজা উত্তরমুখো কিলোমিটার পাঁচেক গেলে শূলনী যাবার রাস্তা বাতলে দেবার লোকের অভাব নেই। এ পথে ১৫-২০ মিটার অন্তর ধনদাত্রী পতির অনন্তশয্যায় বসে পদসেবার বদলে গা-ঝাড়া দিয়ে দিন কয়েকের ভ্রমণ পথে উড়ে বেড়ানোর ইচ্ছেয় গৃহস্থ ছেড়ে বারো ইয়ারিদের সাথে ভিড়ে অকাল-কুষ্মাণ্ডদের ঘাড়ে ভর করেছেন। কোজাগরী এখানে সার্বজনীন। গৃহস্থের বাড়িতে তিনি যতই চঞ্চলা হন এখানে বিল বইয়ে দাপুটে নেত্রী। ২ টাকায়, ৫ টাকায় রিক্সাভ্যানে, মারুতি ভ্যানে দেদার তোলা তুলছেন নিজের এবং সাগরেদদের খোরাকির জন্য।

গ্রামের পথটি পাকা। দুধারে বড়ো বড়ো পুকুর, বাগান, ক্ষেত, বাঁশঝাড়। সরকারি বিজ্ঞাপনের জৌলুষ আর স্থানীয় পঞ্চায়েতের ঢেঁড়ার বোলে ঘরে ঘরে শৌচাগার, বাঁশবাগানে ছেঁড়া শাড়ির আব্রুতে। দু চোখ ভরে দেখার এখানে বিভিন্ন মানের, মাপের, রূপের তুলসী মঞ্চ। মেদিনীপুর জেলার এক ঐতিহ্যমণ্ডিত স্মারককীর্তি, শ্রীচৈতন্য-গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর প্রেমাশ্বাস যেন প্রতিটি বাড়ির ভিত থেকে উৎসারিত।

কিছুটা পথ গিয়ে ডান দিকে মোড় নিল গাড়িটা। গিয়ে পড়ল শূলনী বাজারের ভেতরে। মার্কেট নয়, বাজার। ডাঁই করা শশা, পটল, কপি। কোথাও খুচরো, কোথাও পাইকারি। পাশেই শূলনী হাইস্কুলের মস্ত মাঠ। দেওয়াল ঘেঁসে আমাদের চতুর্দোলা দাঁড়াতেই আমাদের ঘিরে বেশ একটা ভিড় জমল। সামনেই পাকা দুর্গা দালান, আজ একাদশী। বিসর্জন দুদিন বাদে হবে তাই সেখানেই শরণাগত, দীনার্ত আমরা ঠাঁই নিলাম। আমাদের ঘিরে জুটল-বসল ছেলে-বড়ো-বুড়োর দল।

সুবোধবাবু এ এলাকার বেশ এলেমদার, তালেবর মানুষ, গুণিনও বটে। দুর্গাদালানে মা যা হবেন উল্টোদিকে মা যা হয়েছেন, পশ্চিমমুখো বেঁটেখাটো চেহারার খিলান ধরানো সেকেলে ঘরে সারিসারি ঘট। শীতলা, মনসা, ষষ্ঠী, মা কালী কে নেই। সুবোধবাবুর ভাই-ভাইপো, চ্যালা-চামুন্ডে আমাদের আশপাশটা ঘিরে ধরেছে, এনারাই এ মেলার বর্তমান উদ্যোক্তা।

ছবিবাবুদের দয়ায় শূলনী বিখ্যাত হয়েছে ঠিকই তবে এই মৌজার মোট পাঁচটি গ্রাম, তাদের মানুষদের আবেগ, ধর্মবিশ্বাস, পূজার্চনা সবই চক্কর খায় এই বিষহরির মেলা ঘিরে। গ্রামের অধিকাংশ মানুষই মাহিষ্য শ্রেণীভুক্ত, মূলত চাষবাসই প্রধান জীবিকা। এছাড়া মুসলিম, বর্গক্ষত্রিয় (বাগদী) বামুন, নাপিত, কায়েত তারাও আছেন— উৎসবে, ব্যসনে শ্মশানে চ রাজদ্বারে।

খুব চুপিসাড়ে আছে দলীয় বিভাজন। একসময় সুবোধবাবুর পিতৃদেব ও নিমাই সামন্তের পিতৃদেব একসাথে মেলা পরিচালনা করতেন। তাঁরা দুজনেই এখন ধর্মলোকে। ইহলোকে তাদের পুত্রেরা এখন উত্তর-দক্ষিণ, বিপরীত মেরু নিবাসী, ব্যক্তিগত ভাঙন মেলায় কিছুটা হলেও প্রভাব ফেলেছে।

এরা কেউ মালো নয়। সাপ ধরা এদের পেশাও নয়। তবে এরা সদাভীতু এবং সবলা এই জীবটাকে বাগে আনতে পারে। অন্নদাদিদির সেই গেঁজেল বরটার মতো, সাপ ধরার কায়দাটাই আসল।

বর্ষার সময়ে, শীতের সময়ে গ্রামীণ গৃহস্থের বাড়িঘরে, মরাইয়ে সাপ আস্তানা

গাড়ে। পুকুরে চুবিয়ে রাখা পালুইয়ে, হাঁস-মুরগির খোপে সাপ আটকা পড়লে সুবোধবাবুদের ডাক আসে। মেলার সময়কাল না হলে ওনারা ওদের দূরে ছেড়ে দিয়ে আসেন। (সাপের বিষ নাকি ভারতে বিক্রি করে ভালো দাম পাওয়া যায়। তাই গল্পটা এতটা নিরামিষ হলে ঢোঁক গিলতে গলায় লাগে।)

আশ্বিন সংক্রান্তির দিন স্কুল মাঠের মস্ত মেলায় লোক জমেছিল বিস্তর। কাগজে ফোটোক ছেপে ছিল মস্ত ফণাউলীর ন্যাজ চিপে ধরেছে একটা ছেলে। হিসহিসিয়ে ছাতাখুলে তার সে কি ফোঁস ফোঁসানি। কপালের কি গেরো। আজই কি না তেড়ে এসেছে বনবিভাগের হোমরা-চোমরা উর্দিধারী। থামাও, থামাও। একি ঘোর কলি, সাপ নিয়ে ছেলেখেলা। আমাদের দেখার আশায় ছাই দিয়ে ফতোয়া জারি হল সাপ ধরা চলবে না। বিষদাঁত ভাঙা গুরুতর অপরাধ।

তাহলে বিষয়টা দাঁড়ালো এই– শিয়র চাঁদা বা কালাচ যদি দেখ তোমার মাথায় ছাতা মেলেছে তাহলে তাগা ওপরে গিয়ে বাঁধবে। পায়ে ঠোক্কর মারলে গুণিন ডাকবে, বোলচালে যদি বিষ না নামে সদরের মড়াকাটা ঘরে দুদিন কাটিয়ে আসবে সেও ভালো, মনসার বাহন, সাক্ষাৎ বিষহরি, গায়ে হাত দেবে না।

চারদিন চলত এ খেলা-মেলা। বাবুদের লালচোখ সাপের চোখের চেয়েও কঠিন, নির্মম। সুবোধবাবুরা ভাবলেন এ নিশ্চয় পাশের গ্রামের বিরোধী দলের উস্কানি। থাক বাবা, কাজ নেই আর চারদিনে। মানে মানে একদিন টিঁকিয়ে রাখতে পারলেই মানও বাঁচে ধর্মও বাঁচে।

সাপেরা যদি মানুষ হত ওদের দুঃখটা কি কম হতো গো। বাবুরা ফোকলা সাপের দুঃখুটা বোঝেন বটে তবে তা দিয়ে তো পরান বাঁচে না। মাঠে বিষ মাখা চ্যাং-ব্যাং খেলেই অক্কা। পুকুরে পালুই পাতা, ঢুকে চুনো খাওয়ার সখ, কিন্তু ঢুকলেই একেবারে অভিমন্যু। বাঁশের কঞ্চি তখন ঘিরে ধরে যেন সপ্তরথী। আর ঘরের ভেতর একবার পেলে! হাড়ের শেকল খুলে মুয়ে আগুন ধরায়ে দেবে। হাড়, মাংস, খোলস, বিষদাঁত সবই তখন পঞ্চভূত।

তা বাবুরা আপনাদের জোরাজুরি তো আমাদের পরিচয় ভুলিয়ে দেবে। এখনকার খোকাখুকুরা বোতাম টিপেই সাপ দেখবে না কি? আমাদের কেমন রোখ, কেমন ফোঁসফোঁসানি, হিস-হিসানি রঙের কেমন বাহার, কোনটা কাজের কোনটা অ-কাজের, কেমন চোখে দেখে না শিখলে মালুম হবে নাকি। ওই গেঁয়োগুলান তবু আমাদের কয়েকজনকে ধরে বেঁধে পরিচয় তো করায়। দাঁত ভাঙে ঠিকই, না ভাঙলে উপায় তো নেই কখন দেবো ওদের উদাস করে সে তো মহাকালই জানে।

ছাড়ান দাও হে। এই আমরা বেশ আছি ঝাঁপিতে, ঝুলিতে, পুরাণে, ঝাঁপানে কথকতা আর দুলুনি গানে। আমাদের হাঁচি বেদেরা চেনে। আগে কাঠপুতলী খ্যাঁদাখেঁদি নাচত আমাদের সঙ্গে, এখন তোমাদের মেয়ে-বিটি গাঁয়ে গঞ্জে পর্দার ঘেরাটোপে বুগি-বুগি নাচে। টিকিট কাটার লম্বা লাইন। আমরা করি হিসহিস, তোমরা কর ফিসফিস।

আর তোমাদের সবেতেই 'নাই'। কলে জল নাই, রাস্তায় পিচ-পাথর নাই, বাতিতে বিজলি নাই, হাসপাতালে ওষুধ নাই, মেয়ে মানুষের সম্ভ্রম নাই, পুরুষ মানুষের বিচার নাই, খাতায় কলমে কিছুই নাই, বিষহরির ভয় নাই, আমাদের মান নাই। তার চেয়ে বরং এমন করো যাতে বিষদাঁত নিয়ে জন্মাতেই নাই। না থাকবে দাঁত, না থাকবে কাটন, না থাকবে শাসন।

বড়ো কষ্ট দিলে গো...

পরিচিতি

শিক্ষক, মননশীল ভ্রমণকারী।

'ভ্রমণ আড্ডা'র সংগঠক।

প্রসঙ্গ ভ্রমণ

অবসর সময় কাটানোর জন্য ভ্রমণ করার প্রথম ঘটনা ঘটেছিল ব্যাবিলনীয় ও মিশরীয় সম্রাটের আমলে। খ্রিস্টজন্মের ২০০০ বছর আগে ব্যাবিলনিয়ার শাসক ছিলেন শুলগি। শুলগি ভ্রমণকারীদের জন্য রাস্তার দেখভাল করতেন। রাস্তার পাশে বিশ্রামের ঘরও বানিয়ে দিয়েছিলেন।

আমার প্রথম ট্রেক

অমৃতা দে অধিকারী

পিন্ডারির পথে আইসফিল্ডে হুটোপুটি

আমি তখন স্কুলের ছাত্রী। কুমায়ুন হিমালয়ের পিন্ডারি গ্লেসিয়ার আমার প্রথম ট্রেক। কুমায়ুন হিমালয়ের নন্দাদেবী ও নন্দাকোট পর্বতের দক্ষিণ-পূর্বে স্বমহিমায় বিরাজ করছে পিন্ডারি গ্লেসিয়ার। ০.২৫ কিলোমিটার চওড়া গ্লেসিয়ারটি প্রায় তিন কিলোমিটার দক্ষিণে প্রবাহিত হয়েই উৎপন্ন করেছে পিন্ডার নদ। এই নদই অবশেষে গাড়োয়াল জেলার কর্ণপ্রয়াগে মিলিত হয়েছে বদরী থেকে বয়ে আসা অলকানন্দার সাথে।

হাওড়া থেকে লক্ষ্ণৌ হয়ে লালকুঁয়া। নেমেই টের পেলাম উত্তরে ফিন্‌ফিনে ঠান্ডা হাওয়া— ভুলিয়ে দিল মে মাস। হাল্কা কুয়াশার চাদরে ঢাকা অলস ভোরের মিঠে আলো তখনও একটু থমকে দাঁড়িয়ে। এরপর মোটরপথেই ভীমতাল-হলদোয়ানী পেরিয়ে ভারারি পৌঁছলাম। সেখানেই সঙ্গী হল মালবাহক ও পথপ্রদর্শক বন্ধু কুশলরাম ও হুকুমচাঁদ। কুল গোত্রহীন একটা ছোটোখাটো লজে গিয়ে উঠলাম। 'হিম পিন্ডারি লজ'। স্নানাহার, বিশ্রাম নিতেই বেলা গড়িয়ে এল সন্ধ্যে। চীর-পাইনের লম্বা শরীর দিনশেষের আলোটুকু আলগোছে আড়াল করে দিল। গরম চা আর মুড়ি চানাচুড়ে সন্ধ্যে কেটে পাহাড়ের কোলে প্রথম রাত।

পরদিন সকালেই ঘন নীল আকাশ মাথায় নিয়ে ভারারি থেকে পাথর ছড়ানো ধূলোওড়া পথে জিপে যাত্রা শুরু হল। পাহাড়ি পথের স্বাদ পেতে শুরু করলাম। পথের ধারে পাইন-দেবদারু গাছের গগনস্পর্শী নিবিড় অরণ্য, রংবেরঙের ফুল, পাখি। হালকা চড়াই-উৎরাই-এ সাজানো পথ ধরে সরযূকে বাঁদিকে রেখে পৌঁছে গেলাম লোয়ার লোহারখেত। গাড়ি থেকে নেমেই সুদৃশ পি ডব্লু ডি বাংলো। নীচে স্কুল বাড়ি, রঙিন স্কুলড্রেসে ছাত্রদের সারিবদ্ধ প্রার্থনা— এই পরিবেশে বেশ লাগছিল। সামান্য বিশ্রাম-চা-জলখাবার সাঙ্গ করেই শুরু হল আমাদের ট্রেকিং। কতদিনের স্বপ্ন-কত উন্মাদনা। শুরুতেই বেশ লাফিয়ে লাফিয়ে পথ চলা। গল্প কথায় পৌঁছে গেলাম আপার লোহারখেত। এখন অবশ্য এই পর্যন্ত গাড়ি উঠে আসে বলেই শুনেছি। সামনেই বাংলো। ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লাম। ওপর থেকে দেখা যাচ্ছে প্রশস্ত সবুজ বুগিয়াল। মন উদাস করা পাখির ডাকেই সন্ধ্যা নামল ধীর পায়ে— হাল্কা কুয়াশার চাদর মুড়ে। দেখতে দেখতেই নিকষ কালো অন্ধকার। হারিয়ে যাচ্ছে চারপাশের পাহাড়-অরণ্য। পূর্ণিমার চাঁদ দেখা দিল— হাত বাড়ানো দূরত্ব। গরম চায়ের কাপ হাতে কম্বলমুড়ি দিয়ে বারান্দায় এসে সকলে বসলাম। কি অপূর্ব! তবে কনকনে ঠান্ডা হাওয়ার অসহযোগিতায় চন্দ্রালোক তেমন উপভোগ করা গেল না— ঘরে ঢুকে পড়তে হল।

রাত পোহাতেই পাখি-ডাকা ভোর। ভেজা গাছের মাথার উপর দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে নেমে আসছে মিঠে রোদ। ফুরফুরে ঠান্ডা হাওয়ার দোলায় ঘুম ভাঙছে অরণ্যের। খানিক পরেই ঘন নীল আকাশ মাথায় নিয়ে শুরু হল এ পথের সবচেয়ে কঠিন চড়াই পথ— গন্তব্য ঢাকুরিপাস। ১১ কিলোমিটার রাস্তা। উচ্চতা ১০,০০০ ফুট। বড়ো বড়ো বোল্ডার ছড়ানো পথ। নিবিড় গাছ-গাছালিতে ঢাকা সোনালি রোদের লুকোচুরি খেলা। বিচিত্র সব ফুল-লতা-পাতা। রঙিন ছত্রাকের সমারোহ। ছত্রাক যে এত সুন্দর হতে পারে— এখানে না এলে অজানাই রয়ে যেত। অসম্ভব চড়াই পথ। সরযূ উপত্যকা প্রায় শেষ। সামনেই চোখে পড়ল একটা সমাধিস্থল— এক হিমালয়প্রেমী বিদেশি পর্যটক দুঃসহ চড়াই ভাঙতে গিয়েই হিমালয়ের কোলে খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁর স্বর্গের প্রশান্তি। মন বিষণ্ণতায় ভরে উঠল। পায়ে পায়ে পৌঁছে গেলাম ঢাকুরিটপের মন্দির চত্বরে। এখানে ত্রিশূল দিয়ে পুজো দেওয়ার রীতি। লাল কাপড়ে অসংখ্য পিতলের ঘণ্টা বাঁধা রয়েছে— ভক্তদের মনোবাঞ্ছা পূরণের সাক্ষ্য। মন্দির চত্বরে এক শুদ্ধ, অনাবিল, অনাড়ম্বর পরিবেশ— অবশ করে পথিকের ক্লান্তি ও কষ্টের অনুভূতি। ওখানে দাঁড়িয়েই চোখে পড়ল সর্পিল ভঙ্গিতে এগিয়ে চলা

পথ, বাংলো পর্যন্ত গিয়ে থেমেছে। এ পর্যন্ত পথ শুধুই উৎরাই। ভাবলাম নামাটা বোধহয় সহজই হবে, কিন্তু বুঝেছি একটু অসতর্ক হলেই হাঁটু ও গোড়ালিতে প্রবল চোট। সবার সাথে পা মিলিয়ে পৌঁছে গেলাম বাংলোয়। কচিঘাসের সবুজ পুরু কার্পেটে মোড়া চারদিক। দূরে ছোটো ছোটো সার দেওয়া সুরাট থেকে আসা স্কাউট-এর নীল রঙা ক্যাম্প। সবুজ পাহাড়ের ফাঁকে বরফাবৃত চূড়ার উঁকি– অপূর্ব! চোখের মুগ্ধতা আর বুকের আবেগে আমরা আপ্লুত। সূর্য অস্ত যেতেই শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা, তবে কুশলরামের পাহাড়ি জড়িবুটি আর তেলমর্দনের কুশলতা যেন ধন্বন্তরী– রাত পোহাতেই ব্যথা উধাও।

পরদিন ঘুম ভাঙতেই নজরে পড়ল বাংলোর পিছনে আগুন পোহানোর ব্যবস্থা। গোল হয়ে বসে ওখানেই সারা হল প্রাতরাশ। আজ যাত্রা শুরু হল দোয়েলির পথে। এখান থেকে দূরত্ব প্রায় ১৯ কিলোমিটার। নামটা বেশ– দোয়েলি– অর্থ সঙ্গমস্থল। এখানেই মিলিত হয়েছে কাফনি নদীর সঙ্গে পিন্ডার নদ। চড়াই-উৎরাই মেশানো দুষ্টু-মিষ্টি পথ। ডানদিকে বরফঢাকা পাহাড় নিয়েই পথ এগিয়েছে। পথের দুধারে অজস্র বুনো গোলাপ আর ম ম করা তার মিষ্টি গন্ধে নেশা ধরেছে প্রজাপতির। এত বড়ো প্রজাপতি! ছোটো পাখি বলে ভুল হবেই হবে। চারপাশের প্রকৃতির রূপে আমাদেরও দুচোখে আনন্দের বন্যা। এপথে হাঁটার কষ্ট কম। দূরে পাহাড়কোলে চোখে পড়ল বড়ো একটা গ্রাম– খাতি। ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছোটো ছোটো পাথরের বাড়ি। ধাপকাটা রামদানার খেত। চাষ হয়েছে সতরঞ্জির মতো খোপ কেটে। রক্তরাঙা রামদানা, সোনালি-হলুদ রঙা গমের শীষ, সবজে রঙের আলুগাছ দিয়েই তার নকশা। প্রাকৃতিক বৈচিত্র এর পরতে পরতে। এই গ্রামেই আমরা দ্বি-প্রাহরিক আহার সেরে নিলাম। এখান থেকে দোয়েলির পথ। বেশ ঢাল, একেবারে পিন্ডারের পিঠের উপর দিয়ে চলা। প্রায় ৫ কিলোমিটার পথ হাঁটার পর মল্লাধার। পবিত্র নৃত্যরতা– নদীর জলে মসৃণ হয়ে যাওয়া রাশি রাশি উপলখণ্ড বিছানো। তারই উপর একপাশে এক দোকানির অধীর আগ্রহে বসে থাকা। সেই দোকানেই চা খেলাম। সামনের কাঠের সেতু পেরোতে গিয়ে চোখে পড়ল একটা দোমড়ানো-মোচড়ানো লোহার পুল। প্রবল বর্ষণ আর স্রোতস্বিনীর উত্তাল খামখেয়ালিপনায় এই দুরবস্থা। এখন তাই কাঠের ব্রিজই ভরসা। এবার সূর্য ডোবার পালা। ঘন অরণ্য ক্রমশ গভীর কালো হয়ে এলো। গাইডের তাড়া– পা চালাতে হবে। সন্ধ্যায় বন্য-জন্তুরা নদীর জলপান করতে নেমে আসে। শুনে রক্ত হিম হয়ে আসে– শেষে কি...! ভিজে স্যাঁতসেঁতে পথ। থার্মোমিটারে পারদ নামছে দ্রুত। এখানেই আবার জোঁকের প্রিয় বাসভূমি। উপর থেকে টুপটাপ খসে পড়ছে। অবশেষে টর্চের আলোয় ভরসা করে দোয়েলির কে এম ভি এন ডাক বাংলোয় পৌঁছালাম।

সোহাগি রোদের মিষ্টি হাসি নিয়ে হাড়কাঁপানো রাত কেটে ভোর হল। হৈ হৈ করে বেড়িয়ে পড়লাম। হাতে আজ অনেকটা সময়। দুপুরের পর পথে নামা। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে হাল্কা চড়াই পথ। দুপাশে সরু সরু পাহাড়ি বাঁশের ঝাড়। সুন্দর চিমুল ফুলের সঙ্গে এখানেই প্রথম আলাপ। রডোডেনড্রন ভেবে ভুল করেছিলাম– সেই ভুল ভাঙালো গাইড ভাই। আরও চিনিয়ে দিল 'সাঁপ কি মামা'– বিষধর সাপের মতো ফণা তোলা। কী অদ্ভুত গাছ।

হঠাৎ অশনি সংকেত। আকাশ জুড়ে কালো মেঘ। বোরখার মুখ ঢেকে ফেলল সূর্য– সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া। পা চালালাম– কিন্তু বাঁচা গেল না। প্রবল বৃষ্টি– জল নয় যেন তীক্ষ্ণ বর্শাফলা। কোনওক্রমে একটা রক শেল্টারে আশ্রয়। বিকেল চারটে, কিন্তু অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে, চারিদিক নিঃস্তব্ধ– শুধু মন অবশ করা ঝমঝম শব্দ। অন্ধকার পিছল রাস্তায় এগিয়ে ফুরকিয়া পি ডব্লু ডি বাংলোয় পৌঁছলাম। ভিড় ঠাসা বাংলো। কোনওক্রমে আমাদের স্থান হল।

পরদিন ভোরে লিলির গন্ধমাখা শীতল বাতাসের ঝিরঝিরে শব্দে ঘুম ভাঙলো। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ন্যাপস্যাকে নিয়ে বেড়িয়ে পড়লাম। অন্তিম লক্ষ্য পিন্ডারি 'জিরো' পয়েন্ট। হাঁটতে হাঁটতেই এসে পড়লাম বিস্তীর্ণ আইস ফিল্ডের উপর। সূর্যের প্রথম কিরণ পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে– বালজৌরি, পানওয়ালি, দোয়া, নন্দাখাত, ছাঙ্গু, নন্দাকোট। আইস ফিল্ডগুলি পেরোতেও বেশ মজা– লাঠি ঠুকে ঠুকে সঠিক জায়গায় পা ফেলে হাঁটা। পৌঁছে গেলাম স্বামী ধর্মানন্দের আশ্রমচত্বরে। শক্ত পাথরে তৈরি প্রাঙ্গণ। যেতেই উষ্ণ অভ্যর্থনা। তৎপরতার সঙ্গে স্বামীজি ও তার সঙ্গীরা গরম চা নিয়ে হাজির। ফেরার পথে দ্বি-প্রাহরিক আহারের আমন্ত্রণ জানিয়ে দিল।

জিরো পয়েন্ট আর এক কিলোমিটার। পথটুকু বড়োই কঠিন, প্রাণান্তকর। হাঁপাতে হাঁপাতে উঠছি– হৃৎপিন্ডের গতি বাড়ছে। ধীরে এগিয়ে চলি। পৌঁছে যাই পথের শেষ প্রান্তে। সত্যিই জিরো পয়েন্ট। মুহূর্তে জীবনের সমস্ত কিছুই শূন্য মনে হল। জীবন পথে ইঁদুর দৌড়, খরগোশের সঙ্গে রেশারেশি, ক্রোড়পতি হওয়ার স্বপ্ন, সুইজারল্যান্ডের পরশ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা কর্পূরের মতো উবে গেল। বহু নিচে চোখে পড়ল পিন্ডার নদের উৎসমুখ। চারিদিক বিস্ময়কর। রুপোর মুকুটে সেজে উঠেছে পর্বতচূড়াগুলো। সকলের চোখে জল– যাত্রা শেষের দুঃখে নয়, বোধহয় অসীমের মাঝে হারিয়ে যাওয়ার সুগভীর আনন্দে। করজোড়ে প্রণাম জানাই নন্দাদেবীকে। স্মৃতির মণিকোঠায় আজও জ্বল জ্বল করে সে দৃশ্য। এখানে নতুন কাপড়ের টুকরো উঁচু ঢিবির উপর রেখে শ্রদ্ধা জানানোর রীতি। হুকুম চাঁদের অনুরোধে আমরাও ওভাবে শ্রদ্ধা নিবেদন করলাম। অপার শান্তিস্থল– স্নিগ্ধ হয়ে যাওয়া মন। কিছুটা সময় কাটিয়ে আবার নামার পালা। উৎরাৎ পথ– নামায় তেমন কষ্ট নেই। স্বামী ধর্মানন্দের প্রাঙ্গণে পৌঁছতেই খিচুড়ি প্রস্তুত। প্রকৃত অর্থেই তা খিচুড়ি– কি নেই তাতে চাল, ডাল, চাউ, ম্যাকরনি, সোয়াবিন, আলু আরও কত কি! তবে দিনান্তে এই খিচুড়িই আমাদের কাছে পরমান্ন মনে হল।

এবার ফিরে আসা। স্বামীজিকে প্রণাম করে বিদায়। স্বামীজি হাত তুলে আশীর্বাদের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইলেন। চারদিক কেমন ঝাপসা হয়ে আসে। হু হু করা বাতাস তার হিমেল স্পর্শে মনকে সান্ত্বনা দেয়। চোখের পাতা ভারি হয়ে আসে। কোনও এক অমোঘ টানে একদিন মন ছুটেছিল। আজ তার সমাপ্তি– মন যেতে নাহি চায়...।

লেখক পরিচিতি

গবেষণাছাত্রী। ভ্রমণপাগল। লেখালেখি ভালোলাগা।

ছবির পাতা
(২)

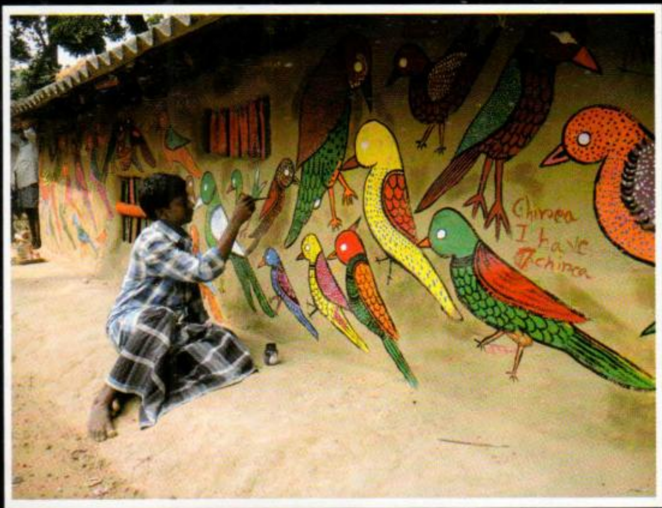

পটের গ্রাম নয়া — ছবি- শক্তিপদ ভট্টাচার্য

সতোপন্থ তাল — ছবি- শর্মালী দাস

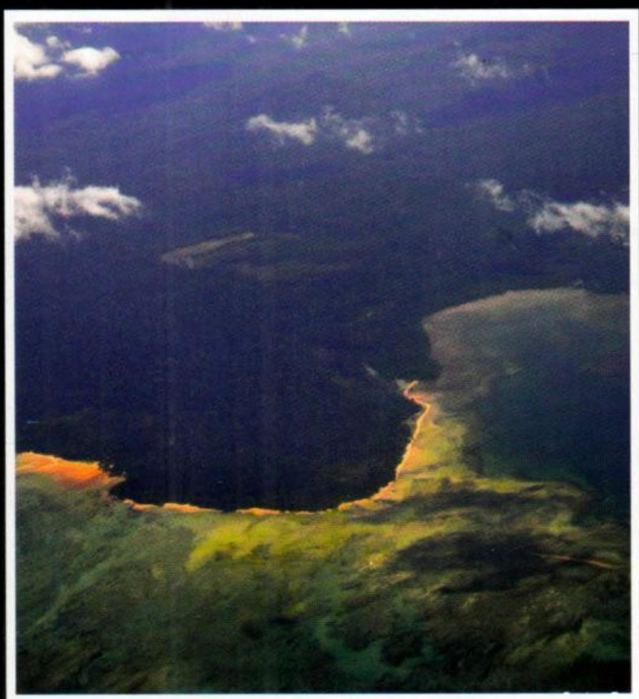

উচ্চতা থেকে আন্দামান — ছবি- গৌতম দাস

অঞ্জুনা বিচ, গোয়া — ছবি- অরিন্দম দত্ত

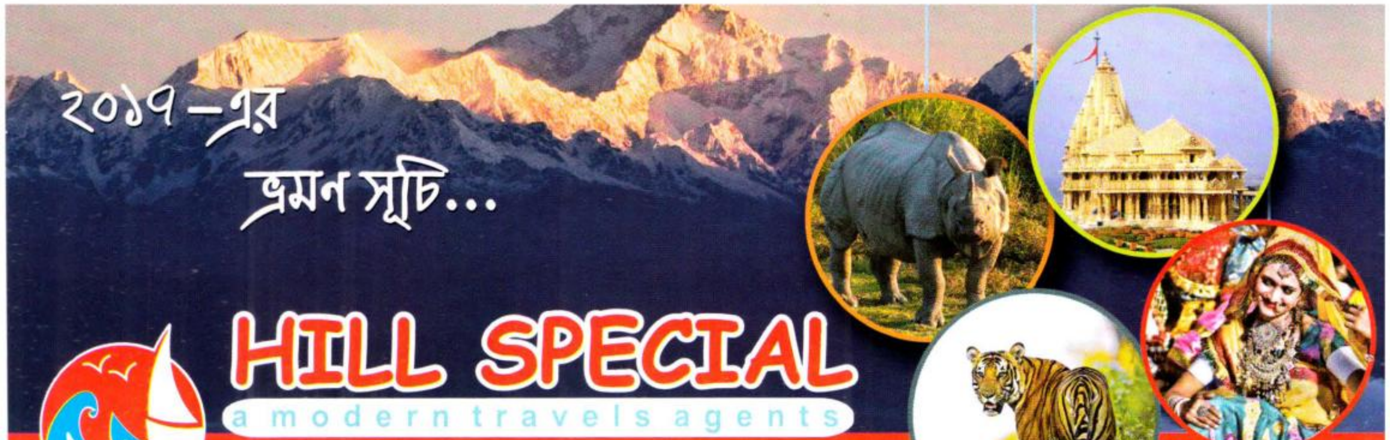

Office:B 18, Kalyani Simanta Bazar, Kalyani,
Nadia - 741235, W.B.
M : +91 8584 03 01 79/9674 00 13 92/8697 80 20 67

উড়িষ্যা (পুরী) ৫ রাত্রি/৬ দিন

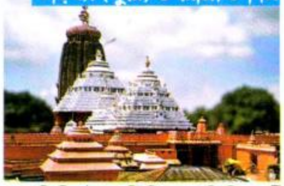

ধবলগিরি, উদয়গিরি, খণ্ডগিরি, পুরী
কোনারক, নন্দনকানন, ভুবনেশ্বর

কাশ্মীর সহ অমৃতসর ১৩ রাত্রি/১৪ দিন

অমৃতসর, স্বর্ণমন্দির, ওয়াঘা বর্ডার, বৈষ্ণদেবী,
শ্রীনগর, পহেলগাঁও, গুলমার্গ, সোনমার্গ

হিমাচল ১০ রাত্রি/১১ দিন

সিমলা, কুলু, মানালি
রোটাং পাস, মণিকরন

কিন্নর-কল্পা ১১ রাত্রি/১২ দিন

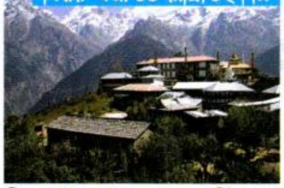

সিমলা, সারাহান, সাংলা, ছিটকুল,
কল্পা, ভিমাকালি মন্দির, রামপুর

দক্ষিণ ভারত ৫ রাত্রি/৬ দিন

চেন্নাই, পণ্ডিচেরী, তিরুপতি,
কন্যাকুমারী, মাদুরাই, রামেশ্বরম,
কোদাইকানাল

রাজস্থান ১৪ রাত্রি/১৫ দিন

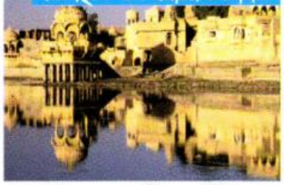

যোধপুর, জয়সলমীর, মাউন্টআবু,
পুষ্কর, উদয়পুর, বিকানীর,
আজমীর, জয়পুর, চিতোরগড়

কেরালা ১২ রাত্রি/১৩ দিন

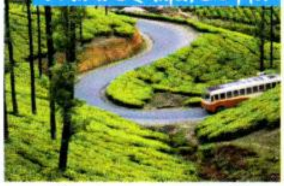

এর্নাকুলাম, মুন্নার, আলেপ্পি,
কুইলন, থেক্কাডি, পেরিয়ার,
ত্রিবান্দ্রাম, কোভালম, কন্যাকুমারী

কুমায়ুন

১০ রাত্রি/১১দিন
১৩ রাত্রি/১৪ দিন

লক্ষ্ণৌ, আলমোড়া, বিনসর, কৌশানী,
বাগেশ্বর, বৈজনাথ, রানিক্ষেত,
নৈনিতাল, মুনসিয়ারী

উত্তর ভারত ১২ রাত্রি/১৩ দিন

আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবন,
ফতেপুরসিক্রি, দিল্লি, হরিদ্বার,
দেরাদুন, মুসৌরী

আন্দামান ৬রাত্রি/৭ দিন

পোর্টব্লেয়ার, কোরাল আইল্যান্ড, হ্যাভলক,
জলিবয়, বারটাং, রঙ্গীত, মায়াবন্দর,
ভিজলিপুর (প্লেন ভাড়া আলাদা)

অন্ধ্রপ্রদেশ

৮ রাত্রি/৯ দিন
৬ রাত্রি/৭ দিন

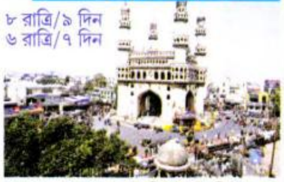

(হায়দ্রাবাদ, রামোজী, লুম্বিনী পার্ক),
ভাইজ্যাক, সীমাচলম, কৈলাসগিরি,
ঋষিকোণ্ডা, আরাকুভ্যালি, বোরাকেভ

ডুয়ার্স ৬ রাত্রি/৭ দিন

জলদাপাড়া, গরুমারা ফরেস্ট,
লাটাগুড়ি, চালসা, মূর্তি,
ঝালং, বিন্দু, সামসিং

নেপাল ৯ রাত্রি/১০ দিন

রক্সৌল, চিতওয়ান, পোখরা, মনোকামনা,
কাঠমান্ডু, পশুপতিনাথ, ক্যাসিনো

দার্জিলিং ও গ্যাংটক ৭ রাত্রি/৮ দিন

দার্জিলিং, গ্যাংটক, ছাঙ্গুলেক,
বাবামন্দির, রুমটেক মনাস্ট্রি

আমাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান :-
রামকৃষ্ণ
ক্যাটারার
যেকোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে
রুচিসম্মত খাদ্য
পরিবেশন করা হয়
যোগাযোগ :- 9674001392- 8697802067
কল্যাণী, নদীয়া

গাজন বনাম দুর্গোৎসব

শক্তিপদ ভট্টাচার্য

ছবি- লেখক

নীল আকাশ, তার মাঝে উড়ে বেড়াচ্ছে সাদা মেঘের দল। নদীর ধার আর ফাঁকা জায়গায় শরতের হাওয়ায় দুলে দুলে মাথা নাড়াচ্ছে কাশের বন। আকাশে বাতাসে ঢাকের আওয়াজ। বাজলো তোমার আলোর বেণু...। মা আসছেন। মা দুর্গা-মা মহিষমর্দিনী-মা চণ্ডী আসছেন সদলবলে। বাঙালির বর্তমান প্রধান উৎসব দুর্গোৎসব। তাই প্রকৃতি থেকে মানুষ সবখানে সাজো-সাজো রব।

ইতিহাসের পাতা ওল্টালে দেখা যায় গাজন ছিল বাঙালিদের প্রধান উৎসব। দু-একটি জমিদারবাড়ি বা বনেদী বাড়িতে দুর্গাপূজা হলেও তা কখনই সার্বজনীন ছিল না। শোভাবাজার রাজবাড়ির রাজা নবকৃষ্ণদেব লর্ড ক্লাইভকে খুশি করতে তাঁর রাজবাড়িতে দুর্গাপূজার প্রচলন করেন। সময়টা পলাশীর যুদ্ধের পর। ক্লাইভ সাহেব বিফ, পর্ক সহযোগে ব্র্যান্ডি খেয়ে দুর্গাপূজায় এলেন, শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ দেবেরে মর্যাদা বাড়ল। দুর্গাপূজা ক্রমশ খ্যাতি পেতে শুরু করল। বারো ইয়ারি দুর্গাপূজা চালু হয়ে গেল কলকাতায়। আর আস্তে আস্তে জৌলুস কমতে থাকল বাংলার লোক উৎসব গাজনের।

এমনিতেই তখন গাজনকে পছন্দ করছিল না ইংরেজরা। গাজনের বিভিন্ন রীতিনীতি ও বিভিন্নভাবে শরীরে বাণফোঁড়কে তাঁরা অশ্লীল বলতে শুরু করেছিল। শাসক ইংরেজরা চাইছিল অশ্লীল গাজনের পরিবর্তে বাঙালির একটা সভ্য ভদ্র উৎসব চালু হোক। তাই অসভ্য গাজনের হাত থেকে বাঁচাতে রাজা নবকৃষ্ণদেবের দুর্গাপূজার প্রচলন এক নতুন মাত্রা পেল। দুর্গাপূজা মজার ছলে বাঙালির মনে নতুন উৎসব হিসেবে ঠাঁই পেয়ে গেল। তাই তো গ্রাম বাংলায় অনুসন্ধান চালিয়ে একশো বছরের বেশি বারোয়ারী দুর্গাপূজার খোঁজ পাওয়া যায় না। যেখানে কয়েকশো বছরের প্রাচীন গাজন গ্রাম বাংলায় বহু রয়েছে।

কীভাবে মেতে থাকত গ্রামগুলো গাজন উৎসবকে কেন্দ্র করে তার একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। মুকুন্দপুরের বুড়ো শিব কামারপুকুরে রামকৃষ্ণর জন্মস্থান থেকে হেঁটে পাঁচ সাত মিনিট। বুড়ো শিব খুব জাগ্রত। রামকৃষ্ণদেব ছোটোবেলায় যখন খুব অসুস্থ হয়েছিলেন, তাঁর মা হত্যে দিয়েছিলেন বাবার কাছে। আর চিনু শাঁখারি যিনি রামকৃষ্ণদেবের মধ্যে প্রথম ভগবান দেখেছিলেন, তাঁর সমাধি মন্দিরও এখানে বুড়ো শিবের গাজন দেখার মতন।

বাংলার মানুষের বিশ্বাস শিবঠাকুর শ্রাবণ মাসে জন্মেছিলেন ও চৈত্র মাসে বিয়ে করেছিলেন। বিয়ে হয়েছিল নীল চণ্ডিকার সাথে, তিনি অবশ্য নীলাবতী বা নীল নামে বেশি পরিচিত। মহিলারা এই দিনটি উপবাস করেন। যেখানেই শিব সেখানেই নীলের পূজা।

চৈত্র মাসের শেষ চারদিন ধরে মূল গাজনের উৎসব চলে। শেষ চারদিন হলেও সারা চৈত্র মাস ধরেই সন্ন্যাস পালন করেন বহু পুরুষ ও মহিলা উভয়েই। উঁচু থেকে নীচু জাত কেউ বাদ যায় না এই সন্ন্যাস গ্রহণে। সারাদিন উপবাস থেকে সন্ধ্যার সময় খাওয়া। গেরুয়া কাপড় ছাপিয়ে এক মাস ধরে সন্ন্যাস পালন। সারা মাস ধরে গ্রামে গ্রামে ধ্বনিত হয় 'জয় বাবা তারকেশ্বরের চরণের সেবা লাগে— মহাদেব'।

গাজনের সবাই যে একমাস ধরে সন্ন্যাস পালন করেন এমন সব জায়গায় দেখা যায় না, চারদিনের জন্যও করেন অনেকে। প্রথম দিন থাকে মহাহবিষ্য, দ্বিতীয় দিন ফল উৎসব, তৃতীয়দিন নীল উৎসব আর চতুর্থ দিনে গাজন উৎসব। স্থান বিশেষে শিক্ষা, অর্থ, জাতি সামাজিক মানদণ্ডে বর্তমান কালের গাজন আলাদা আলাদা ধরনের। জাতিগত বা এলাকাগতভাবে গাজনের আদব-কায়দা সম্পূর্ণ আলাদা। কোথাও কাঁটার উপর ঝাঁপ, বা তার উপর গড়াগড়ি, কোথাও কাঁটা বেঁধানো পাটাতনের উপর শুয়ে থাকা, কোথাও জিভ, কপাল বা শরীরের অন্য অংশ বাণ দিয়ে ফোঁড়া, কোথাও আগুনে ঝাঁপ— এমন নানা শারীরিক নির্যাতন। আবার কোথাও এই নির্যাতনকে সরিয়ে শুধু উপবাস, স্নান, পুজো, বাজি পোড়ানো, ধূনা পোড়ানো বা হিন্দোল। সেখানে দেবতাকে খুশি করা ভক্তি দিয়ে, শারীরিক নির্যাতন দিয়ে নয়।

মুকুন্দপুরের গাজনের হবিষ্যির দিন আলম কাঁটা অর্থাৎ বিরাট একটি বাঁশের পুজো। ফলের দিন গামার কাঁটা অর্থাৎ ছোটো একটি কাঠের মধ্যে কয়েকটি কাঁটা পোতা থাকে, সেটি হাতে নিয়ে ঘুরলেই হবে। নিজেদের সুবিধার্থে বড়ো কাঁটার শয্যায় শোওয়ার ছোটো নমুনা। নীলের দিন সকাল থেকেই উৎসব, বাবা বুড়ো শিবের নির্দেশে সকাল থেকে কবিগান ও পুজো, মহিলাদের জল দেওয়া। এদিন রাতে তিনটি ব্যান্ড পার্টি, ঢাক-ঢোল সহযোগেসন্ন্যাসীরা গাজন পুকুরে যাবেন। সেখানে স্নান, চালুনি বাঁধা, পুজো, বাজি পোড়ানো, ধুনো পোড়ানো, তারপর ফিরে আসা মন্দিরে। বাজি পোড়ানো দেখার জন্য বহু মানুষের জমায়েত হয়। মানত থাকে বাজির বিভিন্ন গাছ দেওয়ার। তবে সব বাজিই শিব ঠাকুরের বিয়েকে উৎসর্গ করে।

মন্দিরে ফিরে এসে চলে পুজো, ধুনো পোড়ানো, একসাথে বাতিদান, হিন্দোল— মানে নীচে আগুন জ্বলবে, চড়কগাছে পা দুটো উপর থেকে বাঁধা অবস্থায় মাথা নীচের দিকে দিয়ে দোল দেওয়া চলবে সারারাত। বাবা বুড়ো শিব বিয়ের দিন সন্ধ্যা থেকে নানান বেশে সাজবেন। সন্ধ্যার ফুলসাজ, একটু রাতে রাজবেশ অর্থাৎ নানা ধরনের গহনা সমেত টোপর পরে বসবেন, এইভাবে রাত গাজন সমাপ্ত হবে।

পরেরদিন হবে দিনগাজন। দণ্ডিখাটা, চালুনি তোলা, বিভিন্ন ঝাঁপের মধ্য দিয়ে গাজন চলবে। পরদিন সকালে সন্ন্যাস পর্যায় শেষ হবে এবং রাতে সবাই মিলে হবে আঁশপালন। এই সন্ন্যাসগ্রহণ একটি সামাজিক রীতি ও সকল শ্রেণীর মানুষকে গুরুত্ব দেওয়ার ভাবনা। এখানে মন্দিরের ভিতর পরিষ্কার রাখেন ও বাবাকে পরিষ্কার করেন যিনি সেই নাপিত এখানকার সন্ন্যাসীরা যে চাল দেবেন তার অর্দ্ধেক পাবেন, বাকি অর্দ্ধেক পাবেন পাটকুড়ানি মানে যিনি মন্দিরের বাইরের দিকে ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার রাখেন।

আলম কাঁটায় যে বাঁশ পোতা হয় গাজন পুকুরে সেটি তুলে আনবেন ডোমজাতির মানুষ। তাঁরা এই বাঁশ দিয়ে বাবার সাজি, চুবড়ি, ঝুড়ি তৈরি করবেন যেটি পূজায় কাজে লাগবে। এখনও কাজের গুরুত্বকে স্বীকার করে পূজার ভাগ বন্টন সত্যিই চাক্ষুষ করার মতো। তাছাড়া এই গাজন উৎসবের মধ্য দিয়ে গ্রামের শিবকে কেন্দ্র করে যে টিমওয়ার্ক হয় তাতে গ্রামের ঐক্য ও একসঙ্গে কাজ করার প্রেরণা আসে। সকলের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে চারদিনের এই গাজন উৎসবে গ্রামবাংলার এক মিলিত প্রচেষ্টার রূপ ফুটে ওঠে যা মুকুন্দপুরের মতো অনেক গ্রামে রাতের অন্ধকারে হয়ে যায়। সারারাত কাটাতে গিয়ে এত মানুষের মাঝে বার বার মনে হয়েছে সমস্ত পশ্চিমী সভ্যতার ঝোড়ো হাওয়া উপেক্ষা করে রাতের অন্ধকারে নিজের মতো করে গ্রামবাংলার উৎসবের মধ্য দিয়ে যে স্রোত বইছে সে স্রোত শহরে বয় না বলেই শহরের মানুষের এত ভেসে যাওয়ার ভাবনা। গ্রামবাংলায় সংস্কৃতির যে ধারা হাজার হাজার বছর ধরে চলে আসছে তা চলবে আরও অনেক বছর ধরে।

যেখানে বাবার গাজন সেখানেই মেলা। কোথাও বড়ো, কোথাও ছোটো। মুকুন্দপুর গ্রামেও তাই মেলা বসে, আসে দোকানদার ফেরিওয়ালা। গাজন বা চড়ক নিয়ে অনেক চর্চা হয়েছে। ড. অতুল শূরের 'বাংলার গাজন উৎসব' প্রবন্ধ থেকে অনেকটা পরিষ্কার হবে— 'অভিধান অনুযায়ী গাজন শব্দটা উদ্ভূত হয়েছে গর্জন শব্দ থেকে। কিন্তু মনে হয় সেটা ঠিক নয়। তার চেয়ে বেশি যুক্তিযুক্ত মনে হয় গ্রাম+জন=গা+জন, তার মানে যে উৎসবে গ্রামের জনগণ সকলে অংশগ্রহণ করে। আর চড়ক শব্দটার ব্যুৎপত্তি হচ্ছে চক্র=চক্কর=বর্ণ বিপর্যয়ে চড়ক।'

পরিচিতি

শিক্ষকতার পাশাপাশি
বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি নিয়ে নিরন্তর গবেষণা।
জেলা ভ্রমণের উপর একাধিক পুস্তক প্রণেতা।
সার্থক ভ্রামণিক। 'ভ্রমণ আড্ডা'র সংগঠক।

ভ্রমণে ছবি— ছবিতে ভ্রমণ

অরূপ ঘোষ

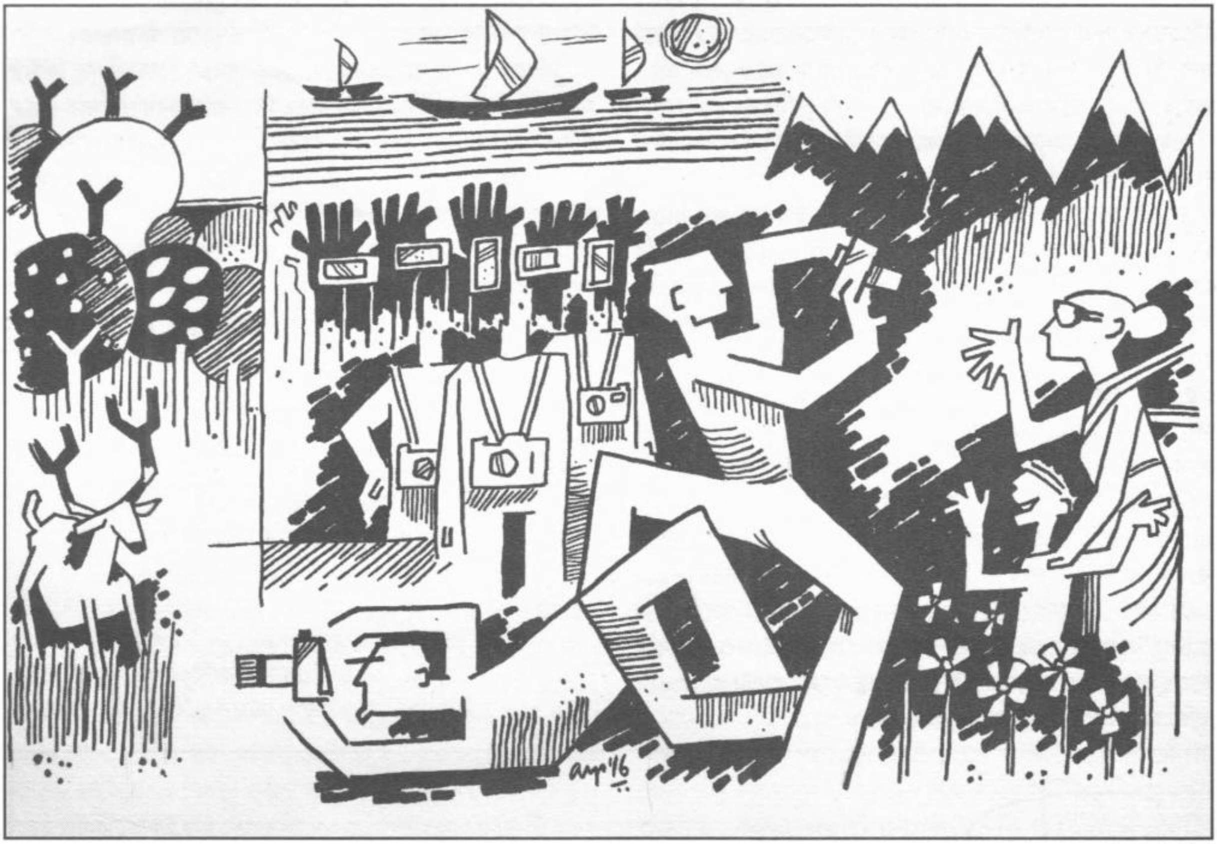

স্কেচ- লেখক

এই শুনছো, দেখো কাঞ্চনজঙ্ঘাটা যেন থাকে... দাঁড়াও দাঁড়াও সানগ্লাসটা পড়ে নিই... বাবু বাবাইয়ের দিকে তাকাও... স্মাইল করো, স্মাইল করো... হয়েছে? ...হ্যাঁ গো কাঞ্চনজঙ্ঘাটা এসেছে তো?... তুমি চলে এসো এবার আমি একটা তুলি।

ফটোগ্রাফি ছাড়া ভ্রমণ অনেকটা ডিম ছাড়া ওমলেট। যার যেমন রেস্ত, তার লাগেজে তেমন একটা ক্যামেরা মাস্ট। ক্যামেরাবিহীন ট্যুরিস্ট আজ ভাবাই যায় না। নিদেনপক্ষে মোবাইলের ক্যামেরাটাও সময় সময় ইজ্জত বাঁচায়। ফটোগ্রাফি যেমন ভ্রমণের সাক্ষ্য বহন করে আবার 'সেই যে ২০০০-এ নৈনিতাল গিয়েছিলাম...' তার সুমধুর স্মৃতি কর্মব্যস্ত বিষাদময় একঘেয়ে ধূসর সময়ে কিছুটা রঙিন স্বপ্ন দেখায়। মাঝে মাঝে ছবির অ্যালবাম খুলে ভ্রমণের দিনগুলি ফিরিয়ে আনতে কার না ভালো লাগে।

কিছুকাল আগেও নিছক দ্রষ্টব্য দর্শনে ভ্রমণ, ভ্রমণের নেশায় ভ্রমণ... এমনটা ছিল খুবই বিরল কিছু বাউন্ডুলে মানুষের অদিখ্যেতা। তৎকালীন যুগে তীর্থের খাতিরে তীর্থস্থানে বা স্বাস্থ্য উদ্ধারে পশ্চিমে যাওয়াটাকে যদি ভ্রমণ বলে ধরে নিই তাহলে সেই ভ্রমণের সাথে আজকের ভ্রমণকে মেলানো কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে হুড়োহুড়ি দৌড়াদৌড়ি... কর্মব্যস্ত জীবনের অবসাদ মুছে ফেলে কিছুটা মুক্ত জীবনের স্বাদ আস্বাদনের উদ্দেশ্যে আজকের ভ্রমণ। self-oriental একঘেয়ে জীবনের কিছুটা সময় দলবেঁধে একসাথে আনন্দ লুটে নেবার প্রচেষ্টায় লোটা কম্বল হোল্ডল-এ মুড়ে পুরো সংসার কাঁধে করে ছয় মাসের জন্য পশ্চিমে যাওয়ার অবকাশ আজ আর নেই। বছরে দশ কি বারো দিন কোনরকমে একটু ম্যানেজ করে হাওয়া বদল।

দৈনন্দিন জীবনে থোর বড়ি খাড়া– খাড়া বড়ি থোর মার্কা দিনগুলোর মাঝে অন্য স্বাদের ওই দিনগুলো মানুষ চিরকাল আঁকড়ে ধরে রাখার চেষ্টা করেছে। কারোর রয়ে গেছে মনের লকারে সযত্নে লালিত, কেউ বা লেখনীর জালে আষ্টেপৃষ্টে ধরে রাখার চেষ্টা চালিয়েছে। কারও বা তুলির সুরবদ্ধ সঞ্চালনায় জীবন্ত হয়েছে স্মৃতির জলছবি। ক্যামেরার মাধ্যমে ভ্রমণের স্মৃতি ধরে রাখার আইডিয়াটা প্রথম কার মাথা থেকে, কবে কোন কালে এসেছে সেটা বোধহয় ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ নেই। গোল গোল ফিল্মের যুগ পেরিয়ে এখন ডিজিটাল যুগ। মানুষের হাতে হাতে এখন এই আশ্চর্য যন্ত্র... চোখে দেখো... বোতাম টেপো... ব্যাস... দুনিয়া মুঠঠি মে।

ভ্রমণ পিপাসু মানুষের ভ্রমণ দশদিনের সিকিম ভ্রমণে আবদ্ধ থাকে না। ট্রেনের টিকিট কাটার সাথে সাথে ভ্রমণ শুরু... কিন্তু সেই ভ্রমণের অন্ত নেই। ভ্রমণে তোলা ছবিগুলো সেই ভ্রমণকে অমর করে রাখে। স্মৃতির অতল থেকে আবার ফিরিয়ে আনতে পারে ফটোগ্রাফি। বৃষ্টি বাদলার দিনে মুড়ি-তেলেভাজা, চা আর রাজস্থান ভ্রমণের ছবির অ্যালবাম... কম্বিনেশনটা একবার ভাবুন। ভ্রমণ পিপাসু মানুষের কাছে এর থেকে মধুর আর কী হতে পারে? পুরীর সমুদ্রে নোনা জলে হাবুডুবু খাওয়ার যে ছবিটা লোকাল ফটোগ্রাফার তুলে দিয়েছিল সেটা দেখলেই নিজেকে কেমন বোকা বোকা মনে হয় না? আজকাল তো আবার সমুদ্রতটে মোবাইল স্টুডিওর আবির্ভাব ঘটেছে। ছবি তুলুন... ইনস্ট্যান্ট প্রিন্ট নিয়ে ঘরে যান। টেকনোলজির জালে আমরা আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে গেছি... এড়িয়ে যাবার জো নেই... তাই একে নিয়েই জীবন উপভোগ করি না কেন। একবার পারিবারিক ভ্রমণে মেসোমশাইয়ের ধুতি টেনে একটা বাঁদর যে কাণ্ড ঘটিয়েছিল... হেসে লুটোপুটি আমরা সবাই। হাতে থাকা মোবাইলে সেই দৃশ্য ফ্রেমবন্দি করেছিলাম। আজ মেসোমশাই নেই কিন্তু যখনই ছবিটা অ্যালবামে দেখি মেসোমশাই ফিরে আসেন আমাদের মাঝে।

পত্র-পত্রিকায় আজকাল বিস্তর লেখালেখি। সঙ্গে ফটোগ্রাফ না থাকলে লেখা জমে না। ছবির প্রিন্টগুলো নিয়ে যখন গল্পের আড্ডা জমে ওঠে তখন একজনের ভ্রমণ হয়ে ওঠে সার্বজনীন। ক্যামেরা আর কম্পিউটারের যুগলবন্দী বেশ জমে উঠেছে... মাল্টিমিডিয়া স্লাইড শো-এর জমজমাট অনুষ্ঠানে যখন কেরালা বা আন্দামান ভ্রমণের ছবিগুলো পরপর প্রতিবিম্বিত হয়, মনে হয় সেই ভ্রমণে আমরাও ছিলাম সহযাত্রী। ১০ বা ১৫ মিনিটে আমরা ঘুরে আসতি পারি লাদাখ, চিন বা আলাস্কা... মানসভ্রমণে ফটোগ্রাফির তুলনা মেলা ভার।

ট্যুরিজম এখন অন্যতম বাণিজ্যিক বিষয়। বিজ্ঞাপনের বিভিন্ন মাধ্যমে দেশ-বিদেশ বেড়াবার হাতছানি... আকর্ষণীয় দ্রষ্টব্যের রঙিন ছবিগুলি বেড়ানোর নেশায় বিশেষ ইন্ধন জোগায়। নায়াগ্রা ফলস-এর রঙিন আলোর বাহার থেকে এম পি ট্যুরিজমের জঙ্গলে বাঘের ছবি... মন তো হু হু করবেই। টাইগার হিলে সূর্যোদয়ের ছবি তোলার জন্য আমরা এক 'ওয়ান পাইস ফাদার-মাদার' বন্ধুকে DSLR কিনতে দেখে অবাক হয়েছিলাম। রাম নাম স্মরণ নিয়ে বুকে বল এনে ব্যাপারটা জানতে চাইলাম... বলল, 'ফেন ভাত নুন দিয়ে খাবো কিন্তু... বেড়াতে গিয়ে ছবি তুলব না? ই-ম-প-সি-বে-ল!!!'

সত্যিই তো!

বিশেষ দ্রষ্টব্য: ভ্রমণে সব আবেগের মুহূর্তগুলো যন্ত্রে ধরে রাখা সম্ভব নয়... তার জন্য সর্বক্ষণ মন ক্যামেরা অবশ্যই খোলা রাখবেন। যন্ত্র আছে যন্ত্রতেই সীমিত।

পরিচিতি

পেশায় চিকিৎসক।
লেন্সের কারিকুরিতে দুরন্ত নেশা।
বহু পুরস্কারে ভূষিত। অনবদ্য স্কেচ।

প্রসঙ্গ ভ্রমণ

অতীতে মানুষের বিকাশের প্রথম পর্যায়ে প্রকৃতির বুকে কেবল টিকে থাকতেই, মানুষ অসচেতনভাবে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়িয়েছে। মানুষের ঘরমুখো হওয়ার ইতিহাস ঘাঁটলে দুটি শব্দ গুরুত্ব পায়। একটি হল 'ঘুরে বেড়ানো' *(travel)* অন্যটি আজকের দিনে 'ভ্রমণ' *(tourism)* ইতিহাসে ভ্রমণ শব্দটি পাওয়া যাচ্ছে উনিশ শতকের গোড়ার দিকে।

মনের ছবি

অমিত সাহা

বাড়ির বারান্দা পেরিয়ে চৌকো ওই উঠোন। ঠিক মাঝখানটায় লাল রঙের তুলসী মঞ্চ। ঝাড় হয়ে যায় তুলসী গাছ বর্ষাকালে। দাদু ওটাকে মাঝেমধ্যেই ছেঁটে কেটে দিতেন। সকালে স্কুল যাবার তাড়া থাকলেও আমার নজর থাকত ওই তুলসীমঞ্চের দিকে। দিদা কখন এসে সকালের নমস্কার করবেন। মাথার কাপড়টা টেনে দুহাত কপালে ঠেকিয়ে মনে মনে বা বিড়বিড় করে কি বলতেন, আমি কখনও ওনাকে জিজ্ঞেস করিনি। সারাটা বছর সকাল বেলায় আমার দোতলার ঘর থেকে দেখতাম– সে এক মায়াবী দৃশ্য, যা আমাকে শিশুকাল থেকে দশম শ্রেণী উত্তীর্ণ হওয়া পর্যন্ত প্রতিনিয়ত মুগ্ধ করত। লক্ষ্য করতাম বছরের বিভিন্ন সময় এবং কালবিশেষে পূবের আলো দিদার মুখটা বর্ণময় করছে, কিন্তু সে আলোটা এক নয়– তার উষ্ণতা ও বর্ণময়তার বদল হত। দিদার মুখটা আমি প্রতিনিয়তই যেন নতুন করে দেখতে পেতাম। এছবি ধরে রাখার অস্ত্র আমার হাতে সেদিন ছিল না, মনের ছবিটা কিন্তু আজও রয়ে গেছে।

আজ যখন ছবির খোঁজে ছুটি, সেই দৃশ্যের উপলব্ধির পুনরাবৃত্তি এক দশকেও হয়নি। ফোটোগ্রাফিতে এই একটা চ্যালেঞ্জকে জয় করাই আসল চ্যালেঞ্জ। অর্থাৎ যা দেখলাম তার প্রতিচ্ছবিকে ক্যামেরাবন্দী করা। অধ্যাবসায়, পরিশ্রম ও ধৈর্য্য-ই এর মূল মন্ত্র। ছবিটা মনের মতো হল বা হল না– সেখানে আজকের এই digital যুগে হল না-টাই বেশী। যখন ফিল্ম দিয়ে ছবি তোলা হত, তখন Analog ক্যামেরার যুগ। অনেক বেশী উত্তেজক হতো বিষয়টা। ৩৫ বা ৩৬ এই ম্যাজিক ফিগার গুলো সর্বক্ষণ তাড়া করে বেড়াতো। ভুল করে বার বার একই ছবি তোলা মানে–বাতুলতা। তার ফলে কী হত? –আমরা অতি সতর্ক থাকতাম। ছবির দৃশ্যপট নির্বাচন, কম্পোজিশন এবং কারিগরী বিষয়গুলো মাথায় রাখতে হত প্রতিটি ছবি তোলার ক্ষেত্রে। সেই আমরাই কিন্তু এখন অনেক অসতর্ক হয়ে পড়েছি। কারণ digital যুগে শিল্প ও বিজ্ঞানের ভারসাম্য অনেকটাই ওলোটপালট হয়ে গেছে। কিন্তু ছবি নিয়ে নানাপ্রকার Post Production-এর খেলা যতই উন্নতি করুক শিল্পীর চোখ এবং ভাবনা বিজ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হতে পারে না। কথায় আছে "Photography হল জীবনের শুধুই একটি মুহূর্ত, যা চলে যায়, দেখতে না পেলে আর পাওয়ার অবকাশ নেই।"

ছবি তোলার বিষয়টি মূলতঃ দুটি approach নিয়ে এগিয়ে যায়, বদলে যায়। professional এবং Amateur একজন ছবি তুলছেন পেশাগত দাবি থেকে আর একজন ছবির খোঁজে হাঁটেন, ভালোলাগার টানে। তথাপি এই দুই সম্প্রদায় কিন্তু একই ভাবনা থেকে এগিয়ে চলেছে। তা হল– এই মাধ্যমের প্রতি প্রেম। এক ব্যক্তির শিল্পসত্ত্বাই তাকে তাড়িয়ে নিয়ে গেছে ছবি তোলাকে জীবনের অবলম্বন করে নিতে। আর এই কাজে বিজ্ঞান তাকে প্রভূত সাহায্য করছে তার ধরে রাখা মুহূর্তগুলোকে বিক্রয়যোগ্য করে তুলতে। পেশাগতভাবে Photo Journalism বা চিত্র-সাংবাদিকতা কিন্তু Amateur- দের কাছে অভিজ্ঞতা বাড়ার সাথে সাথে স্বপ্ন হয়ে ওঠে।

"An image can speak thousand words"– এই উক্তিটি সকলেরই জানা। প্রবাদ প্রতিম Henry Cartier Braso থেকে Sebestian Salgado বা Robert Kapa থেকে Steve McCurry এবং আরও বহু চিত্র সাংবাদিক ফোটোগ্রাফির মাধ্যমে মানবজীবন ও তার অস্থির পৃথিবীর বুকে ঘটে যাওয়া নির্মম ঘটনার যে সব মর্মস্পর্শী চিত্রকাহিনির সৃষ্টি করেছেন তা উপরের উক্তিটিকে বারংবার মনে করিয়ে দেয়। মনে পড়ছে Salgado-র "Genesis" বা Documentary "SALT OF THE EARTH" বা রঘু রাইয়ের ভূপাল কাণ্ডের উপর চিত্রকাহিনী। বুঝিয়ে দেবে একজন পেশাদার চিত্র সাংবাদিক প্রাণপাত করে জীবজগৎ ও মানবজীবনের দুর্দশার কথা কীভাবে সারা পৃথিবীর কাছে নিজস্ব মননে ছবির দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। তেমন-ই ছোটো documentary National Geographic-এর দ্বারা তৈরি "In the heart of Himalayas" যেখানে এক পিতা দুই পুত্রকে নিয়ে জমে যাওয়া হিমশীতল চাদর নদীর উপর দিয়ে দিবারাত্রি হেঁটে প্রত্যন্ত জাস্কার ভ্যালির এক গ্রাম থেকে 'লে' শহরে পৌঁছে যাচ্ছেন শিক্ষার তাগিদে, এসবই হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়া তথ্যচিত্র। মাধ্যম হিসেবে ফোটোগ্রাফি আর passionate কিছু ফোটোগ্রাফার এই দুইয়ের মিলনে আমরা পরিচিত হই পৃথিবীর বুকে ঘটে যাওয়া বিরলতম কাহিনির সাথে।

মনে পড়ছে চর্চা শুরুর দিনগুলি। সেই Monochrome, Transperancy film আর এখন Digitally Memorised প্রযুক্তি। ছাত্রজীবনে শুধুই দেখা আর পরবর্তীকালে ক্যামেরা হাতে মাঠে নামা কাজটা বড়ই কঠিন মনে হয়েছে। কিন্তু দেখার অভ্যেস আর ভাবার অবকাশ এই দুইয়ের সমন্বয় যদি ঘটে– শিল্প সৃষ্টি হতে বাধ্য। ধরা যাক বেড়াতে যাওয়ার আগে যদি আমরা ভেবে নিই যে ভালো হোটেল, খাওয়া-দাওয়া, গাড়ি করে বিভিন্ন স্পট দর্শন এর বাইরে হাঁটার পরিকল্পনা যদি করা যায়, এক অন্য ছবি পাবেন। আগে থেকেই সেই জায়গা, সেখানের মানুষ ও তাদের জীবন ও জীবিকা সম্পর্কে তথ্যভিত্তিক বই পড়ে জায়গাটি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা তৈরী করা দরকার। ছবি তোলার কথা মাথায় রাখলে পূর্ব-পশ্চিমের আলোর

দিশা এবং ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় পৌঁছনোর পরিকল্পনা করার জন্য– e যুগে google ভাই তো আছেই।

এরপর আসবে আপনার কারিগরী ও প্রযুক্তিগত সরঞ্জাম নিয়ে নাড়াচাড়া। DSLR ক্যামেরা একটা কেনা তো হয়েছে– আর সঙ্গে জুটে গেছে একটি Short Z00m kit lense, কিন্তু তা নিয়ে একটু হাঁটাহাঁটি করলেই বোঝা যাবে দরকার ছিল একটি wide angle ও একটি tele lense। আর যারা Compact DSLR কিনছেন wide angle-টার উপর একটু বেশি নজর দিন। যেমন ধরুন 28mm wide আর aperture F2.8 যদি থাকে তাহলে Telescopic Focal length-টা সেই লেন্সে কম হলেও হতাশ হওয়ার কিছু নেই। Compact হালকা ক্যামেরাতে বেশি zoom, ধরুন 200mm-এর বেশী হাতে করে ছবি তোলা অসুবিধাজনক। তার চেয়ে tele focal length 100mm-এর আশেপাশে থাকলে ভালোই কাজ চলবে। যাই হোক সবরকম প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা সত্ত্বেও ট্যুরিস্ট হওয়ার বদলে যদি নিজেকে explorer ভাবেন, বাস্তব কিন্তু কল্পনাতীত বিষয়বস্তু হাজির করবেই আপনার সামনে। Quickly react করে একটি ভালো মুহূর্তকে অমর করে ফেলতে পারবেন ওই আগাম প্রস্তুতির জন্যই।

কাজিরাঙার জঙ্গলে হঠাৎ পাওয়া গাছের ডালে বসা সেই নীলকণ্ঠ পাখিটা, আবার বিশাল মাপের গোল্ডেন ব্রাউন ঈগল যখন জলাশয় থেকে একটি মাছকে ছোঁ মেরে অনেকটা উড়ে গিয়ে একটি গাছের ডালে বসল, আর তার তীক্ষ্ণ নখে ঝুলে আছে কিলোখানেক ওজনের মাছ, এই সবই High shutter speed-এর কাজ, তাই ক্যামেরাতে 1/1000 second আর 300mm কমপক্ষে tele lense আপনার জীবনের সেরা কিছু মুহূর্ত এনে দিতেও পারে।

পরিশেষে বলতে চাই ফোটোগ্রাফি চর্চায় সরঞ্জামের চেয়ে একটা সময়ের পর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে চোখ আর মনের সমন্বয়। "ভাবুন আর ভাবা অভ্যাস করুন"– বলতেন আমার একদা গুরুমশাই শ্রী শিবনাথ বসু। ভালো সিনেমা দেখা, article ও বই পড়া– এই সবই জগৎটাকে আরও খুঁটিয়ে দেখতে সাহায্য করবেই।

আনন্দে ছবি তুলবেন।

ছবি- 'The Explorers' ছবির পাতা-১

পরিচিতি

প্রাণবন্ত। আই টি সেক্টরে চাকরিজীবি।
ফোটোগ্রাফিতে মুন্সিয়ানা আছে।
ভ্রমণে ছবি তোলাটাই প্রাধান্য পায়।

Kalyani People's Awareness Centre

(KPAC)

B-12/54, Kalyani, Nadia, 741235, West Bengal, India.
Phone: +91 (033) 2580 8009 / +919836548233 / +919477027969
E – MAIL : kpac.in@gmail.com / kpac_in@hotmail.com

ABOUT KPAC

This voluntary non government organisation was established in the year 1994, for growing awareness among the people on primary health and community development.

Free Cardiac Camp organised by KPAC on 11.09.2016, conducted by NH Narayana Multispeciality Hospital, Barasat.

KPAC organises awareness and Training Programmes on:

General Health; Disaster Preparedness & Response; Pollution; Improper Sanitation; Superstitions that affect Nutrition and cause Diseases; Scarcity of Proper Drinking Water; Mother & Child Care; Adolescent Health; HIV/AIDS & STDs; T.B. & Malaria; Training Programmes on Post Harvest Technology & Food Processing.

যত্তসব গাঁজাখুরি গপ্প

প্রবীরকুমার বিশ্বাস

লোকেশন বিনুর চায়ের দোকান। ১৫ আগস্ট, সময় বিকেল ৫টা। আমরা, মানে আমি, ইন্দ্র, কানু আর পম্পা খুব চিন্তিত মুখে গলায় লাল চা ঢালছি, তবু পথ খুঁজে পাচ্ছি না। সোজা কথা, একটা চরিত্র চাই ব্যতিক্রমি, যাকে ক্যামেরায় ধরে তথ্যচিত্র বানিয়ে জমা দিলে তবেই আমরা ফিল্ম স্কুলের গণ্ডি পার হব। বিনুদাকে বলেছিলাম, চলো তোমায় নিয়ে ছবি বানাই, শুনেই হাত জোড় করে দিয়েছে।

–'ইন্দ্র, দেখ দেখ, উল্টোদিকে কেকের দোকানের পাশে রাখা আবর্জনা ঘাঁটছে একটা লোক। খেয়াল কর।' কানু বলল।

–'তাতে কি হলো?' অবাক না হয়েই ইন্দ্রের উত্তর।

–'খুব ইন্টারেস্টিং। আমি অনেকক্ষণ ধরে দেখছি, পাগলটা আপন মনে ভ্যাটের আবর্জনা ঘেঁটে সকালের ফেলে দেওয়া কাগজের জাতীয় পতাকা তুলে তুলে নিজের পকেটে রাখছে। অন্য কিছু কিন্তু নিচ্ছে না।'

এক লাফে বেঞ্চ থেকে উঠে পম্পা বলে উঠল, –'চলবে, চলবে, ডাক ওই পাগলটাকে। পেয়ে গেছি। কোথায় ছিলে বাবা এত দিন?'

–'কী হল?' চমকে উঠে আমি বললাম।

–'সাবজেক্ট আমাদের হাতের সামনে, আর আমরা কত কী ভাবছি।' শেষে বিনুদাই ডাক দিল, –'এই জগাই, জগাই, এদিকে আয়। কোথায় ছিলিস এত দিন?'

জগাই আমাদের সামনে। পম্পার চকচকে চোখ দেখে বুঝলাম, ক্যামেরার ফ্রেমে জগাইকে কীভাবে ধরবে সেই কথাই ভাবছে। কানু বলে, –'এই পাগলটাকে একটু বসতে দে।' আমরা বেঞ্চ এগিয়ে দিলাম।

জগা এমনিতে খুব রোগা। কল্পনায় দেখা পাগলের সাথে খুব একটা পার্থক্য নেই। বয়েস অবশ্যই চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বা তার থেকে বেশি। জামা-প্যান্ট খুব নোংরা। এই গরমে, গায়ে সোয়েটার। এক গ্লাস লাল চা বিনুদা ধরিয়ে দিল ওর হাতে।

আমাদের অবাক করে জগাই বলে ওঠে, –'দয়া করে আমাকে পাগল বলবেন না। আমি জগাই। ভবঘুরে জগা। জাতীয় পতাকা মাটিতে গড়াচ্ছে বলে তুলে রেখেছি, আমি পাগল?' আমাদের এতজোড়া চোখ এখন ওর দিকে। শুভময় থাকলে বলত, 'পুরো নায়কের মতো এন্ট্রি নিলো।'

জগা কানুর কাছে হাত পাতে, –'একটা বিড়ি হবে?'

বিনুদা বলল, –'সে না হয় বুঝলাম। কিন্তু এতকাল ছিলিস কোথায়? জেলে না পাগলা গারদে?'

বিড়ি ধরাতে ধরাতে জগার উত্তর, –'সাতবছর বাদে ফিরলাম। ভারত ভ্রমণ করছিলাম, হিউয়েন সাঙের মতো।'

পম্পা সবাইকে চুপ করতে বলে, জগাদার সামনে এসে বলল, –'শোনো জগাদা, আমরা ম্যুভি ক্যামেরাতে তোমার ছবি তুলব। তুমি শুধু ক্যামেরার সামনে তোমার ভবঘুরে জীবনে কোথায় কোথায়, কীভাবে ঘুরে বেড়িয়েছো, সেই সব গল্প বলবে। দু-তিন দিনের কাজ। ইন্দ্র যা যা প্রশ্ন করবে তার উত্তর দেবে। রাজি?'

জগাদার মুখে কোনও উত্তর নেই। আপন মনে পকেটের জাতীয় পতাকাগুলোকে সমান টান টান করে একটার উপর আরেকটা রাখছে। এই প্রজেক্টটা যে পম্পা লিড করবে, তা ওর কথা শুনেই বুঝতে পারছি।

–'বিনুদা, কাল দুপুরে মাংস-রুটি। লাল চা একবারেই করে রাখবে। কানু, জগাদার বিড়ি সাপ্লাই দিবি। এই দোকান ঘরের

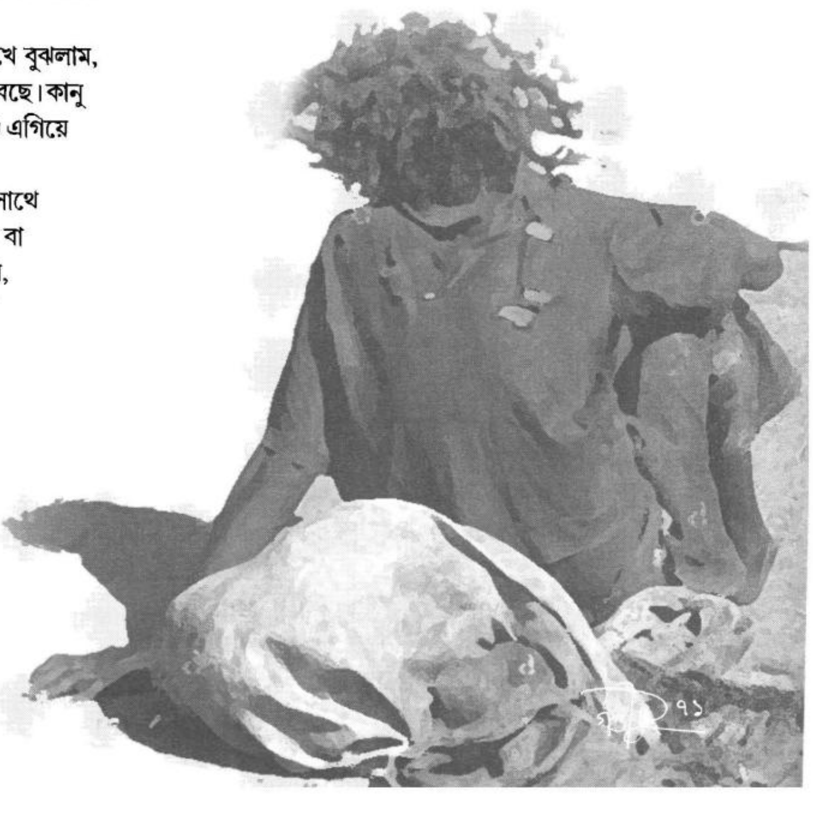

ভিতরেই স্যুট করব। ইন্দ্র, সাউন্ড তোর, বুম তোর হাতে। কানু ক্যামেরার পিছনে। লাইটটা আমি দেখে দেব। জগাদা তুমি কাল এই নোংরা জামা-কাপড় পরেই আসবে।'

—'হেঃ হেঃ, আমার তো আর কোনও জামা নাই।' জগার উত্তর। রাতে বাড়ি যাওয়ার আগে বিনুদার কাছে জানতে চাইলাম, —'কী গো, জগাটা কাল ঝুলাবে না তো? ফুল পাগল বলে তো মনে হল না। তা তুমি একে চেনো কতদিন?'

—'বছর কুড়ি আগে ওকে প্লাটফর্মে পাই। আমার কাছে থাকত, টুকটাক দোকানের কাজ করত। প্রথম থেকেই কথাবার্তা এলোমেলো বলত। লেখা পড়া জানা। খবরের কাগজ পড়ে নানা বিষয়ে আলোচনা করত। বাবা-মা, বাড়ি কারও কথাই বলত না। তারপর একদিন উধাও। তারপর এই দেখা। তবে জন্ম বাউন্ডুলে। আমার তো নিজেরই খুব ইচ্ছা করছে, ওর মুখে ভারত ভ্রমণের গল্প শুনতে, ভাবছি দুটোদিন দোকান বন্ধ রাখব।'

রাতে বসে আগামীকালের স্ক্রিপ্ট লিখছি। বারদুয়েক পম্পাকে ফোন করলাম। ফোন বন্ধ। পরদিন সকালে বিনুর দোকানে ঢুকেই দেখি জগাই এককোণে গুম মেরে বসে। অঝোর ধারায় বৃষ্টি হচ্ছে রাত থেকে।

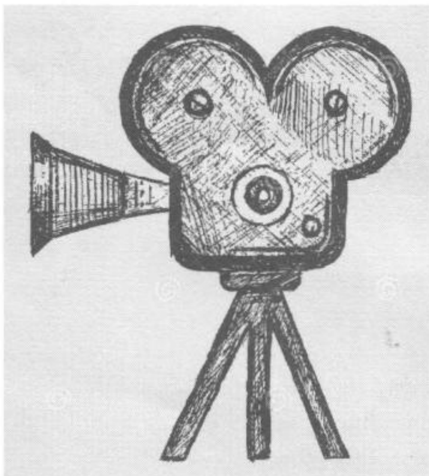

—'কী হল জগাদা?'

—'বুঝলি এইরকম বৃষ্টি দেখলেই মনটা দৌড় দেয় মৌসিনরাম গাঁও। ওখানেও শুধু বৃষ্টি আর বৃষ্টি।'

এই কথা শুনে আমি মনে মনে উত্তেজিত। দারুণ আবিষ্কার। পম্পা চিৎকার করছে, 'কানু ফোকাস দেখ। লাইটটা কাট কর। সাউন্ড চেক। শোন, কোনও রিটেকের ব্যাপার নেই। পাঁচ মিনিট পর পর শট কাট হবে। ইন্দ্র, জগাকে স্বাভাবিক কথা বলতে দিস। পরে এডিটিং টেবিলে বুঝে নেব।'

—'সাইলেন্স, রোলিং।' অর্ডার দেয় পম্পা।

কানুর চোখ ভিউ ফাইন্ডারে। ইন্দ্র প্রথমেই চলে গেল মৌসিনরাম গাঁও। জগার মুখে বিড়ি। —'বছর, তারিখ বলতে পারব না। কলকাতা থেকে আলুর ট্রাকে লুকিয়ে তিনদিন পর চলে এলাম শিলং। সাথে পয়সা নেই। ভিখারি না সেজে পাগল সাজলে খাবার পাওয়া সহজ হয়। বিলাসিতা বলতে মাঝে মাঝে লাল সুতোর বিড়ি। শিলং-এ বিনাপয়সায় কিছু মেলে না। না জেনেই এসে পড়লাম মৌসিনরাম গাঁওতে। প্রচণ্ড বৃষ্টি। বাস স্ট্যান্ডে আটকে রয়েছি ছয় দিন। প্রচণ্ড জোঁকের উৎপাত। রামকৃষ্ণ মিশনের খিচুড়ি খেয়ে প্রাণে বেঁচে ছিলাম সে যাত্রায়। এখানে ঘুরতে ঘুরতে দেখে ফেললাম, ভারতের উচ্চতম জলপ্রপাত মৌসমাই ফলস। মেঘে ঢাকা পাহাড়। ঘন জঙ্গল।'

কিপ রোলিং, পম্পার ইশারায় ক্যামেরা চলতে থাকে।

—'জগাদা, একদিন তোমারও তো বাড়ি ঘর ছিল, মা-বাবা ছিল, স্বপ্ন ছিল। সেসব কথা বলো না।' ইন্দ্র আবেগ মেশানো গলায় আব্দার করে। এই কাজটা ওকেই মানায়।

কথা বন্ধ করে, চোখ বুজে জগাদা দুলছে। দু-আঙুলের ফাঁকে বিড়িটা অনেক আগেই নিভে গেছে, খেয়াল নেই।

—'ভবঘুরের কোনও ঘর নেই। আত্মীয় বাবা-মা কেউ থাকে না। পৃথিবী জোড়া তার ঘর। প্রতিটি মানুষ তার আত্মীয়। ভবঘুরের স্বপ্ন আছে, তোমাদের সাথে তা মিলবে না। একবেলা খাবার আর রাতে শান্তিতে একটু ঘুমাতে পারলেই তারা আর কিছু চায় না।'

চা খেতে খেতে জগার কথা আমরা হাঁ করে গিলছি। ও চলেছে গারো পাহাড় থেকে তুরা পাহাড়ের মাথায়। পায়ে হেঁটে চলেছে নাপাক লেক, পতঙ্গভুক গাছ দেখতে। গা ছমছমে দোবাক্কল বা বাদুর গুহায় কীভাবে ভূতের সাথে রাত কাটাল, তাতে আমরাও মজে গেছি। মেঘালয় থেকে অরুণাচল প্রদেশ হয়ে কীভাবে ট্রাকে করে গৌহাটি আসল, সে এক সিনেমার মতো গল্প।

জগাদা এবার আমাদের প্রশ্ন করে বসল। —'জিয়াভরালি নদী দেখেছো কখনও?' চকচক করছে ওর চোখ দুটো। দেখব কী? নামটা শুনলাম এই প্রথম। জগার চোখ এবার বন্ধ। মনে হল বর্ষার ভরা জিয়াভরালি নদীতে ও একা নৌকায় ভেসে বেড়াচ্ছে। ইন্দ্র নতুন করে শুরু করে, 'আচ্ছা, বিনা পয়সায় ট্রেনে বাসে চাপতে গিয়ে বিপদে পড়নি কখনও?'

—'কখনও পাগল, কখনও মৃগীরোগী সেজে সারা ভারত ট্রেনে চড়ে বেড়াই। কখনও কখনও চেকার-পুলিশের লাথি চড় খেতে হবে এটা ভাবাই থাকে। পুনেতে একবার নাটক করে হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকেন স্টু খেয়ে গায়ে জোর করে পালালাম। একবার পাটনা স্টেশনে একটা ফাঁকা ট্রেন দেখে ঘুমাবার জন্য সিটের তলায় শুয়ে পড়লাম। গা পুড়ে যাচ্ছে জ্বরে। ঘুম ভাঙল দুদিন বাদে চেন্নাই স্টেশনে পুলিশের লাঠির গুঁতোতে। কখনও কখনও ট্রেন থেকে নামিয়ে দিয়েছে। আমার আর কী, যেখানে নামিয়ে দেবে সেখানে থেকে যাব।'

—'প্যাক আপ।' পম্পার গম্ভীর ঘোষণা। রুটি-মাংস খেয়ে জগাদা চলে গেল। আবার কাল আসবে।

—'কী রে পম্পা এত চিন্তিত কেন?' আমি জানতে চাই।

—'গতকাল এখান থেকে ফিরবার পর থেকেই মোবাইল ফোনটা পাচ্ছি না। কোথায় যে রাখলাম?'

পরদিন সকাল থেকেই গল্পের ঝুলি খুলে বসলো পাগলা জগা। —'বুঝলি নিউ দিল্লি স্টেশনে বড়ো করে রাজস্থানের দুর্গের ছবি দেখে খুব লোভ হল দেখবার। এমন কপাল, জগাই পেয়ে গেল মাধাইকে। সাহেব ভবঘুরে, নাম মাইক, দেশ আমেরিকা। আমার থেকেও আরও

বড়ো ভবঘুরে। গাঁজার গন্ধে দু-জনের আলাপ। কেউ কারও ভাষা বুঝি না। আসলে ভবঘুরেদের কোনও ভাষা নেই। খুব ভালো বাঁশি বাজায় আর মুকাভিনয় করে। টাকা পয়সার দরকার হলেই ও লোক জমিয়ে ফেলে আর আমি পয়সা কুড়াই। গাঁজায় দম দিয়ে উড়ে উড়ে বেড়ালাম বিকানির, জয়সলমির, যোধপুর, জয়পুর। জুনাগড় দুর্গের কথা এখনও মনে আছে। মাইকের সাথে ছাড়াছাড়ি হল দিল্লিতে, সে কি কান্না।'

—'কাট। লাঞ্চ ব্রেক।'

ডিম-ভাত খেয়ে নতুন করে ভজাদা বসল। কোনও বিরক্তি নেই। জলন্ত বিড়ি হাতে ভজাদার গল্প শুরু। —'এবার কুম্ভ মেলার অভিজ্ঞতার কথা বলি। পূর্ণ কুম্ভ সেবার এলাহাবাদে। সন্ধ্যারতির সময় আমার 'পেঙ্গুইন নাচ' দেখে নিকুম্ভবাবার আখড়ায় আশ্রয় জুটে গেল। বাবার সেবায় লেগে গেলাম, গেরুয়া পাবার লোভে। মেলা শেষে বাবার সাথে যোশীমঠ হয়ে হাঁটা পথে ভবিষ্যবদরী এলাম। একগুহায় বাবার সাধনাক্ষেত্র। পাহাড়ের ঢালে শুধুই চরস গাছ। দেখেই মনটা নেচে উঠল। বাবার জন্য অনেক নিচের গ্রাম থেকে চাল ডাল ভিক্ষা করে এনে রান্না চাপাতাম। সে যেই রান্নাই হোক, সবপদেই দু-এক মুঠো করে শুকনো চরসের গুঁড়ো মিশিয়ে দেওয়া হত। এমনকি চরস পাতা দিয়ে চা বানানো হত। দিন নেই রাত নেই শুধু নেশার মধ্যে সাঁতার কাটা। অন্য কোনও অনুভূতি নেই। ভুলে গেলাম আমি কে, কেন এখানে। গুহার মুখে বাবা আমায় বসিয়ে রাখত মেঘ গুনবার জন্য। মেঘ আসছে, যাচ্ছে, তৈরি হচ্ছে, ভেঙে যাচ্ছে। খোঁজে আছি এমন মেঘের, যার গায়ে 'ওঁ' লেখা আছে। তখনই নাকি আমার দীক্ষা হবে। একদিন ঘুমের মধ্যে শুনতে পেলাম, কেউ যেন আমায় বলছে, 'জগা ওঠ, তুই না ভবঘুরে? তোর আবার মোক্ষলাভের এত লোভ কেন? ঘুম ভেঙে একলাফে উঠে বেড়িয়ে এলাম গুহা থেকে, আর পিছন ফিরে তাকাইনি।'

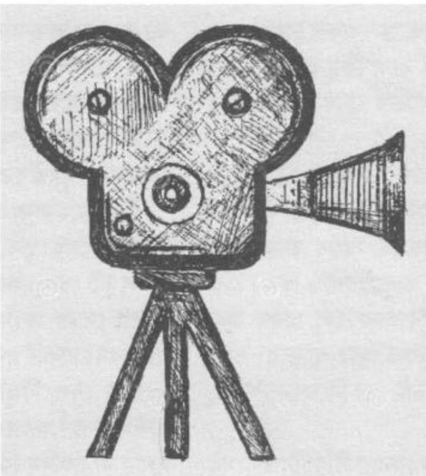

—'কাট্! কাট্!'

আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছিলাম। কানু ক্যামেরা বন্ধ করতেই গেল ভুলে। এমন সময় শুনলাম বাইরে কেউ বিনুদার নাম ধরে ডাকছে। তারপরই দরজা ঠেলে প্রবেশ পাড়ার সমাজসেবী ফুচকাদার।

—'দোকান বন্ধ করে কী হচ্ছে রে বিনু?'

—'আমরা মানে জগাইদার একটা ইন্টারভিউ স্যুট করছিলাম। দি গ্রেট ভবঘুরে।' আমতা আমতা করে উত্তর দিল কানু। জগাইকে দেখে চিৎকার করে উঠল ফুচকাদা।

—'গাঁজা গোপাল তুই, জেল থেকে ছাড়া পেতে না পেতেই আবার শুরু করেছিস?'

ফুচকাদার এই মূর্তি দেখে ও ভয়ে হাতজোড় করে এক কোণায় গুটিসুটি মেরে দাঁড়িয়ে গেছে। আমরাও অবাক। ভবঘুরে জগাই কীভাবে গাঁজা গোপাল হল, তা বুঝতে পারছি না। এক লাফে বেঞ্চ টপকে গাঁজা গোপালের কলার ধরে টেনে আনল। তারপর সজোরে এক থাপ্পর। জগার লাল লাল চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, —'আবার গাঁজা শুরু করেছিস? সকাল থেকেই গাঁজায় দম দিয়ে ইন্টারভিউ? টাকা কোথায় পেলি বল?' এরপর তলপেটে লাথি। গাঁজা গোপাল মাটিতে। কষ্ট লাগছে দেখে। আমি মার থামাবার জন্য এগিয়ে গেলাম।

—'ফুচকাদা, ও তো ভবঘুরে। এই দুদিন ধরে ভারত ভ্রমণের কত গল্প শোনালো। তোমার বোধহয় ভুল হচ্ছে।'

আরও রেগে গেল ফুচকাদা।

—'ও তাই! পাঁচ বছর জেল খেটে সপ্তাহ খানেক হল এলাকায় এসেছে। এক নম্বরের গাঁজাখোর, পাতাখোর, মোবাইল চোর...।'

সবটা না শুনেই পম্পা আর্তনাদ করে উঠল, —'আমার মোবাইল! আমার মোবাইল পরশু রাত থেকে পাচ্ছি না...।'

জগাইকে মাটি থেকে টেনে তুলে ওর মুখের কাছে মুখ এনে জানতে চাইল, —'ওর মোবাইল কোথায়? বেচে গাঁজা খেয়েছিস? তোকে আবার পুলিশে দেব। কেউ আটকাতে পারবে না।'

—'আমি নেই নি, বিশ্বাস করো। তোমার পা ধরছি, মা কালি বলছি।'

ফুচকা পা তুলেছে আবার লাথি মারতে।

—'বলছি, বলছি, মেরো না, মরে যাব। মানে, মানে সেদিন দোকানে এসে টেবিলের উপর ওটা দেখে লোভ সামলাতে পারলাম না।' কেউ কিছু বুঝবার আগেই ফুচকাদার হাত ছাড়িয়ে জগা একলাফে টেবিল টপকে, চায়ের গ্লাস উলটে গিয়ে সোজা রাস্তায়। তারপর আমাদের চোখের সামনেই একটা চলন্ত ২৩৭ বাসের হাতল ধরে ভ্যানিস। গোটা নাটকটা শেষ হল কয়েক সেকেন্ডে। ধর, ধর বলতেও পারলাম না।

আমরা সবাই থুম্ মেরে বসে। নীরবতা ভাঙল ইন্দ্র, —'তাহলে এই দুদিন ধরে এত সুন্দর করে বলা বেড়ানোর গল্প, সেগুলো?'

ফুচকাদা চলে যেতে যেতে ব্যঙ্গ করে বলে গেল—'যত্তসব গাঁজাখুরি গপ্প।'

পম্পা বলল, —'কানু ক্যামেরাটা বন্ধ কর। ওটা এখনও রোল করছে।'

পরিচিতি

পেশায় শিক্ষক। অন্তরঙ্গ, ঘরোয়া।
ভিডিও ফোটোগ্রাফিতেও আগ্রহ।

সাঙ্গ অভিযান

বিপ্লব বসু

অভিযান বলতে আমরা চারজন বুঝি উত্তেজনাপূর্ণ ও দুঃসাহসিক কর্মপ্রচেষ্টা (অবশ্যই সংসদ অভিধানানুযায়ী)। প্রচেষ্টার বৃত্তান্তে পরে আসছি। তার আগে চারজন সম্পর্কে একটু বলেনি। চারজনে চাকুরীজীবী, ঘরগেরস্থালি আছে। বছর চার-পাঁচের মধ্যেই সবাই সিনিয়র সিটিজেন তকমা পেয়ে যাব। চারজনেই যে খুব গলাগলি ছিলাম তা নয়, একেবারে হাই হ্যালো সম্পর্কও নয়। ঘটনাক্রমে এক চতুষ্টয় সিদ্ধান্ত জন্ম নিয়েছিল– রিটায়ারমেন্টের পর আমরা বেড়াতে যাব, ঘনঘন। পরিবার পরিজন নিয়ে অনেক হয়েছে, এবার একটু অন্যভাবে। ঝাড়া হাতপায়ে। এমনই একটা ভাবনা-বিলাস কিছুদিন লালিত পালিত হচ্ছিল। হতে হতে হঠাৎ সিদ্ধান্ত– একটা ট্রায়াল হয়ে যাক। যেহেতু ভূত, পেত্নি আর নিরীহ বউ বলে কিছু হয়না। ওসব মনের ভ্রম, আমাদের অভিযানের শুরু বাড়ির চৌকাঠ ডিঙোনর আগে থেকেই।

এ যাবৎকাল সপরিবারে ট্রাভেল এজেন্সির কোলে চেপে ঘুরে বেড়িয়েছি। এর অন্যথা হতে সাহসে কুলায়নি; প্রচুর ঝুঁকি ও ঝামেলা। চতুষ্টয়ের মিলিত মানসিক ব্যায়ামে সাহস ক্রমশ পুষ্ট হয়েছিল। গল্পগাছা শুনে একটা ধিকিধিকি অনুপ্রেরণাও ছিল। ঠিক করে ফেললাম ট্রেকিং-এ যাব। ট্রেকিং শব্দটা জানা ছিল, ধারণা ছিল কিন্তু ভাবনা কস্মিনকালেও না। ভাবলাম কত আর ধ্যাড়াব! চারি মিলি করি কাজ, হারিজিতি নাহি লাজ। সবটাই তো নিজেদের মধ্যে, কেউ জানতে পারবে না।

হরিদ্বার যাওয়া এবং দশদিনের তফাৎ-এ ফেরার টিকিটটা প্রথমেই কেটে নিয়েছিলাম। চার গৃহপালিত মধ্যবিত্তের পক্ষে এটাই একটা বড় অ্যাডভেঞ্চার। গিন্নিরা ভেবেই আকুল– তাঁদের 'ওগো' গুলো কবে এত্তবড় হয়ে গেল।

হিমালয়ের দু-একটি জায়গা সম্পর্কে মোটামুটি খোঁজখবর নিয়ে নিয়েছিলাম। খোঁজখবর নিলে কি হবে, বিসমিল্লায় ফোকর ছিল। গল্প শুনে বই পড়ে উখিমঠ আর ভারত সেবাশ্রম সংঘ সমার্থক স্থান বলে মালুম হয়েছিল। হরিদ্বার থেকে উখিমঠের টিকিট কেটে বাসে উঠেছিলাম। বাইরের দৃশ্যাবলি দেখে মুগ্ধ হতে হতে ক্লান্ত হয়ে উখিমঠ নামলাম। নেমে টের পেলাম ভারত সেবাশ্রম কিলোমিটার খানেক পিছনে ফেলে এসেছি। কন্ডাক্টরের ভর্ৎসনা শুনলাম– আশ্রমের নামটা একবার শুনিয়ে রাখলে এই অবস্থা হত না। অবশ্য বিড়ম্বনায় বেশি পড়তে হয়নি। বাজার অর্থাৎ বাসস্ট্যান্ড থেকে আশ্রম পুরোটাই ঢালু পথ। চার প্রৌঢ় পায়ে স্নিকার্স, পিঠে রুকস্যাক, মাথায় টুপি– পারফেক্ট ট্রেকার্স সাজে জীবনের প্রথম ট্রেকিংটি সেরে ফেলল।

উখিমঠের ভারত সেবাশ্রম সংঘকে হিমালয়বিলাসী বাঙালি একডাকে চেনে। সংঘের ডাইনিং, করিডর বাঙালি ম ম করছে। জনা দশের একটি বয়স্ক দল কেদারনাথ 'করে' একটু আগে ফিরেছেন। পথের কষ্টের কথায় শিউরে উঠছেন। আবার সরকারি ব্যবস্থাপনায় পঞ্চমুখ। দু-বছর আগে ঘটে যাওয়া বিপর্যয়ের আগে এবং এই পরের অভিজ্ঞতা পর্যালোচনায় খাওয়ার ঘর গমগম করছে। আরেকদল ব্যস্ত আগামীকাল মদমহেশ্বর রওনার উদ্যোগে। এদের দলে সন্তান সহ তিনজন মহিলা আছেন। আরেকটি হাট্টাকাট্টা ট্রেকিং দল দেখলাম। যাকে বলে সত্যিকারের ট্রেকার। তাঁবু ইত্যাদি নিয়ে লটবহর ভালই। দুদিন ধরে বিশ্রাম নিচ্ছেন। ওরাও কেদারনাথ ছুঁয়ে এসেছেন। তবে বেশ ঘুর পথে। খাটলিং হিমবাহ, মাওয়ালি পাস, বাসুকিতাল হয়ে। পুড়ে যাওয়া চোখমুখ দেখে এদের ধকল টের পাওয়া যাচ্ছে। সম্ভ্রমমূলক দূরত্ব বজায় রেখে চললাম।

ছিপছিপে লম্বা একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল। খুব বেশি চাকচিক্য নেই। তুষারপাতের চিহ্ন সহ কোঁকড়ান চুল, ব্যাকব্রাশ করা। দীঘল দুটি চোখ। কথা বলেন মৃদু স্বরে। বোঝা যায় বয়সকালে অনেক হৃদয়ে দোলা লাগিয়েছেন। অবিবাহিত। একা এসেছেন, একমাস থাকবেন। চাকরি থেকে স্বেচ্ছাবসর নিয়ে নিয়েছেন বেশ কিছু দিন। বছরের বেশ কিছুটা সময় ঘুরে বেড়ান এই ভাবে। ধীর সুস্থে, মর্জিমাফিক। কালকের মদমহেশ্বরের দলটির সঙ্গে ভীড়ে যাচ্ছেন। ফিরে কয়েকদিন বিশ্রাম নেবেন। আবার কোন দলের সঙ্গে হয়তো রুদ্রনাথ ঘুরে আসবেন। তুঙ্গনাথ আর দেওরিয়াতাল একাই ঘুরে এসেছেন। আমরা চারজন মুখ চাওয়াচাওয়ি করি।

পরদিন সক্কালে দীঘল চোখ ভদ্রলোকের পরামর্শে হাঁটতে বেরুলাম। ফিরে এসে ব্রেকফাস্ট করব। চারপাশটা ঘণ্টাখানেক স্রেফ চরে বেড়াব। ভদ্রলোক বলেছিলেন খুব ভাল লাগবে। আশ্রম থেকে বেরিয়ে ডানদিক ধরে এগিয়ে চললাম। ফুটফুটে নীল আকাশ, চারিপাশ সবুজ। কালো পিচরাস্তা এঁকেবেঁকে চলে গেছে। একদিকে খাড়া পাহাড়, অন্যদিকে খাদ। নরম অনুভূতি মোড়া একটা ভাললাগা আমাদের ঘিরে। পৃথিবীর এই প্রান্তে আমাদের জন্য এমন একটা সুখ অপেক্ষা করছিল! ভাবতেই রোমান্স অনুভব করি। গল্পগুজবে খানিকটা পথ পার করে এসেছি। দেখি রাস্তার ধারে টাটাসুমো জাতীয় কয়েকটা গাড়ি দাড়িয়ে। এক পাশ দিয়ে একটা পায়ে চলা পথ নেমে গিয়েছে। নীচে একটা গ্রামের আভাস। গাড়ির ড্রাইভাররা জানাল ওখানে বিয়ের অনুষ্ঠান। আমাদের প্রৌঢ় হাড়ে তখন রোমাঞ্চের

পরশ। ঠিক করলাম আমরা নীচে যাবো, নতুন অভিজ্ঞতা হবে। ড্রাইভাররা উৎসাহ যোগায়– 'গাঁওয়ালরা খুশী হবে। বিয়েবাড়ির ভোজটাও মিলে যাবে।' জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম মেনু হচ্ছে রুটি, ডাল আর লাড্ডু। শুনে আমাদের কর্পোরেট জগতের সঙ্গী প্রবীর ঢোঁক গেলে। গেলার বহর দেখে পরিকল্পনা পরিত্যাগ করতে হল। অভিযানের চাকা গড়ানোর শুরুতেই বলবেয়ারিং-এর দুয়েকটা বল যদি ভেঙ্গে যায়, চিত্তির।

একটা খালি টাটাসুমো বেরিয়ে যাচ্ছিল। আমাদের দেখে ব্রেক কষে দাড়ায়। ড্রাইভার মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করে আমরা যাবো নাকী! আমরা আকাশ থেকে পড়ি– মানে! ড্রাইভার বলে ও খালি গাড়ি নিয়ে চোপতা যাচ্ছে। ইচ্ছে করলে, মাথাপিছু পঞ্চাশ টাকায় সওয়ার হতে পারি। দ্রুত দু-মিনিটের মিটিং করে আমরা চড়ে বসলাম। একটা বেপরোয়া বাষ্প মাথায় ঢুকে গিয়েছে। ঘুরে আসা যাক চোপতাটা, চোপতা খুব সুন্দর ভ্যালি। গাড়ি চলছে, গল্পগুজব চলছে, চলছে বাইরের দৃশ্য দেখা। কথায় কথায় ড্রাইভার জানায় পথের ধারেই দেওরিয়া তাল। তাই নাকী! তাহলে ওটাওতো দেখে নেওয়া যায়। রাস্তা থেকে বেশ খানিকটা ভেতরে সারিগ্রাম। ওখান থেকে পয়দল পথ। গাড়ি সারিগ্রাম নামিয়ে চোপতা চলে যাবে। ভাড়া কিন্তু পুরো পঞ্চাশই লাগবে। লাগুক, কোই পরোয়া নেহি।

দেওরিয়াতালে পৌঁছে আনন্দে আত্মহারা অবস্থা। পাহাড়ের কোলে একটা ছোট্ট ভ্যালি। পর্বতশৃঙ্গের ছায়া সহ একটা সরোবর, চারপাশে সবুজ ল্যান্ডস্কেপ, চাদ্দিকে বরফ ঢাকা শৃঙ্গরাজি। ছেঁড়া ছেঁড়া সাদা মেঘ সহ একটা বিশাল নী-ঈ-ল আকাশ শামিয়ানার ভিতরে আমরা। জীবনের প্রথম হাঁটা যাকে বলে ট্রেকিং, সার্থক হয়ে গেল। কেউ সবুজ ঘাসে চিৎ হয়ে শুয়ে আকাশ দেখলাম। কেউ জলাশয়ের জলে আঙুল ডুবিয়ে পরখ করলাম। কেউ দৌড়দৌড়ি করে বেড়ালাম। কেউ অক্লান্ত শাটার টেপায়। অবশ্য হেঁটে আসা পথটুকু কিছু কম যায় না। প্রতিবছর বহু মানুষ প্ল্যান প্রোগ্রাম করে দেওরিয়াতাল আসেন। হুট করে এসে আমরা তাঁদের থেকে কোন অংশে কম উপভোগ করলাম না।

এই তিন কিলোমিটার রাস্তা হেঁটে উঠে আসাটা অনায়াসে হয়নি। কখনও একটানা এতখানি হেঁটেছি বলে মনে পড়ে না। পায়ে খিঁচ ধরে, গলা শুকিয়ে, দম ফুরিয়ে একেবারে যা তা অবস্থা। অনির্বচনীয় প্রকৃতি আর পথ শোভা আমাদের টেনে তুলে এনেছে। শুধু একটা কথা প্রধানমন্ত্রী মোদিজীকে বলব। 'স্বচ্ছ ভারত'-এর পরের উদ্যোগ 'অঙ্ক ভারত' হওয়া উচিত। পাহাড়ি রাস্তার দূরত্ব নিয়ে মহা গোলামাল। রাস্তায় স্থানীয়দের যাকেই জিজ্ঞেস করি আর কতদুর? অম্লান বদনে উত্তর দেয়– এই তো আর একটু। কত কিলোমিটার জিজ্ঞেস করলে জবাব আসে– বাস, আধা কিলোমিটার। আমাদের তো রাস্তাটা ন'কিলোমিটার মনে হয়েছে।

ফেরার পথটুকু যেন উড়ে এলাম। একে তো আশ্রমে না বলে কয়ে চলে এসেছি। তার উপর আকাশের ভাবসাব ভালো ঠেকছে না। সারিগ্রামে ফিরে চোঁ চোঁ করা পেটে প্রথমে চাউমিন তারপর চা। খেতে খেতে দোকানির সঙ্গে কত গল্প! বিখ্যাত সব বাঙালি অভিযাত্রীর সঙ্গে দোকানির আলাপ। চক্ষুলজ্জার খাতিরে আর বলা হল না আমরাও কম বিখ্যাত নই। কোনরকম প্রস্তুতি ছাড়াই এমন একটা অভিযান সাঙ্গ করে খ্যাত হওয়ার সমস্ত যোগ্যতা অর্জন করে ফেলেছি। ইতিমধ্যে প্রবীর আজাহারুদ্দিনের মত জামার কলার তুলে দিয়েছে। একে একে আমরাও।

এবার বাসরাস্তায় ফিরতে হবে। উখিমঠ যাওয়ার শেষ বাস মিলবে বেলা তিনটে নাগাদ। ঝোঁকের মাথায় চলে এসেছিলাম। এসেছিলাম গাড়িতে। এখন বাস ধরতে হাঁটা ছাড়া উপায় নেই। আকাশটা আরেকটু গম্ভীর হয়েছে। দোকানি একটা শর্টকাটের খোঁজ দিলেন। দোকানের পিছন দিয়ে, এ বাড়ির উঠোন, ও বাড়ির বাগান পার করে, আল ধরে। রক্ষে রাস্তা পুরোটাই উৎরাই। একটা দিক লক্ষ্য করে আন্দাজে হাঁটতে হচ্ছে। মাথার উপর কালো মেঘ ঝুলে রয়েছে। বাসরাস্তার কোনরকম ইঙ্গিত দেখা যাচ্ছে না। হালকা পায়ে চলা পথের একটা আভাস পাওয়া যাচ্ছে। মাঝে মাঝে আড়াআড়ি পথও পাচ্ছি। একেকটা ক্রশিংয়ে এসে দাঁড়িয়ে পড়তে হচ্ছে। পরস্পরের মুখ চাওয়াচায়ি করা ছাড়া করার কিছু নেই। কোন লোকজন তো নেই, একটা কুকুর পর্যন্ত নেই। এ অঞ্চলে শুনেছি চিতাটিতাও আছে। ওঃ তাই কোন কুকুর চোখে পড়ছে না। ওপরে তাকিয়ে দেখি আয়োজন সম্পূর্ণ, নামল বলে। এমতাবস্থায় বাঙালি দোষারোপে মত্ত হয়ে থাকে। কিন্তু আমরা তখন অন্য মার্গে। তূরীয় ভাব কেটে গেছে। নার্ভাস ট্রেকারের ভীরু পা আর অভিসারে যাওয়ার একবুক আশঙ্কা নিয়ে আমাদের চলন। হাতড়ে হাতড়ে অবশেষে বাসরাস্তায়। রাস্তার ধারে চা-দোকানের বেঞ্চে চারজন ধপাধপ বসে পড়ি। ফোঁস ফোঁস করে চারচারটে নিশ্বাস পড়ল– রোমাঞ্চ শেষে স্বস্তি। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে সতীকান্ত প্রথম মুখ খুলল– নাঃ পরের বার রজনীকে নিয়ে আসব। এতো সুন্দর একা একা দেখা পাপ।

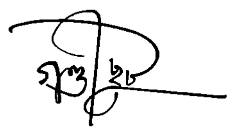

পরিচিতি

চাকুরে, ভ্রমণ লেখা নিয়ে নিরন্তর পড়াশোনা।
ব্যক্তিগত ভ্রমণের সংস্কার-মুক্ত অনুভূতিগুলি
তাঁর লেখায় বৈচিত্রের মালায় গাঁথা।
'ভ্রমণ আড্ডা'র সংগঠক।
সম্পাদক 'ভ্রমী' (ট্রাভেল রাইটার্স ফোরাম, কলকাতা)।

মুগ্ধ করবে সিসামারা মালঙ্গ

অশোক কুণ্ডু

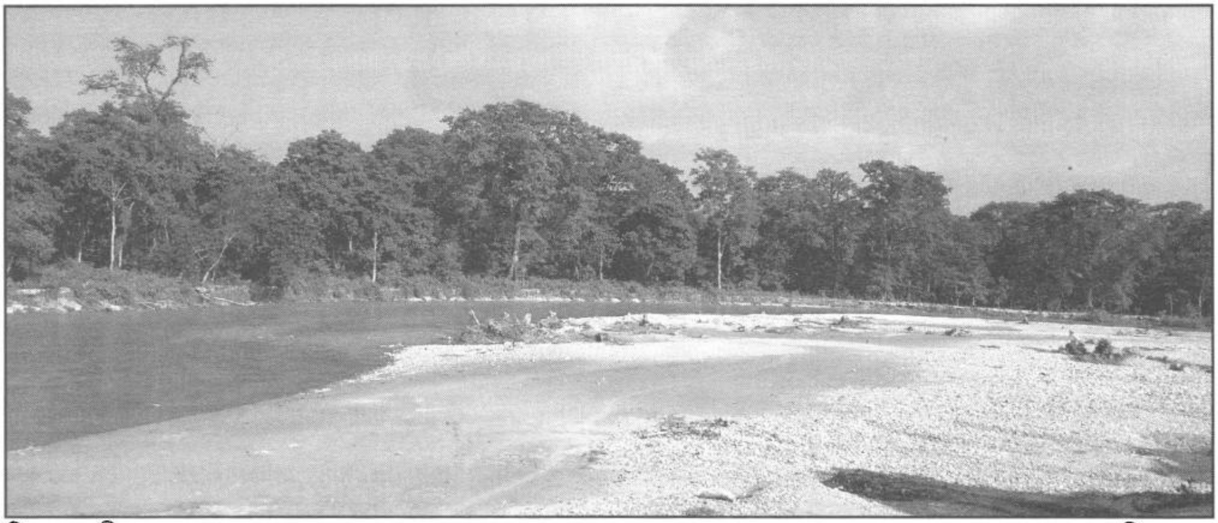

সিসামারা নদী

ছবি- লেখক

চারিদিকে নীরব নির্জনতা। চারিপাশের সমস্ত কিছু শুধুমাত্র আপনি বা আপনার সঙ্গীদের জন্য নিবেদিত। দু-চোখে যা দেখতে পাচ্ছেন, তা কেবল আপনার বা আপনাদের। সামনের নদী। নদীর ৬ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের বাঁধ। সামনে বাঁদিকের একখণ্ড বালিয়াড়ি। কাশ বন। সামনের গভীর গহন অরণ্য। অরণ্য এবং বাতাসের যুগলবন্দীতে সৃষ্ট সুর। সমস্ত আপনার, আপনাদের নিজস্ব। সিসামারা নদীর স্বচ্ছ জল আপনার। অবিরত বয়ে চলা এই জলধারায় সৃষ্ট সংগীত আপনার। এই সংগীতের মাদকতায় আছে নিজস্বতা। এর স্বরলিপি অজানা। দূরের আবছা পাহাড়ের সারিতেও মনে হবে আপনি ছাড়া আর কারও দখলদারি নেই। জঙ্গলের হাতি, বাইসন, নদীর পাড়ে জল খেতে আসা গণ্ডার এবং গাছে বসা নানা প্রজাতির পাখি সব আপনার। এদের নিয়েই আপনার এবং আপনার সঙ্গীদের জগত। আপনার, আপনাদের অস্তিত্ব।

ভাবছেন এ কোন কল্প লোক! ভাবছেন আজগুবি কথাবার্তা! তা নয়। এমন জায়গা সত্যিই আছে। খুব দূরে নয় এ রাজ্যেই আছে। ডুয়ার্সের মালং বিট সংলগ্ন এই স্থান। রাজ্যের নবগঠিত জেলা আলিপুরদুয়ার। আলিপুরদুয়ার ২ নং ব্লকের শালকুমার গ্রাম পঞ্চায়েত। এই পঞ্চায়েত ভুক্ত জলদাপাড়া। যার নামে নামকরণ হয়েছে বিশ্বের ২য় বৃহত্তম এক শৃঙ্গ বিশিষ্ট গণ্ডারের আবাস "জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান"। ভারতে প্রায় ২৫০০ এই প্রজাতির গণ্ডার আছে। প্রায় ২২০০ গণ্ডার আছে আসামের কাজিরাঙা জাতীয় উদ্যানে। বাকি ৩০০ মতো পশ্চিমবাংলার ডুয়ার্সের জঙ্গলগুলিতে বাস করে। সর্বশেষ গণনায় দেখা গেছে ৪৬টি গণ্ডার বাস করে জলপাইগুড়ি জেলার গরুমারা অভয়ারণ্যে বাদবাকি প্রায় ২০০-র বেশি বাস করে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে। জলদাপাড়ায় এছাড়াও আছে হাতি, বাইসন, লেপার্ড এবং নানান ধরনের পাখি। আছে ময়ূর, হর্নবিল প্রভৃতি দৃষ্টিনন্দন প্রজাতির পাখি।

জলদাপাড়া অরণ্যে বনবসতির সংখ্যা প্রচুর। এই কারণে 'জাতীয় উদ্যান' হিসেবে এর স্বীকৃতি একটু দেরিতে হয়েছে। এই জাতীয় উদ্যান ২১৫.৫১ বর্গকিলোমিটার বিস্তৃত। উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পূর্বে বিস্তৃত। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের বড়ো অংশকে দ্বীপের আকারে ঘিরে রেখেছে তোর্ষা নদী। উত্তরে মাদারিহাটের দিকে তোর্ষা দুভাগে বিভক্ত হয়ে কিছুটা ত্রিভুজের আকৃতিতে জলদাপাড়া অরণ্যকে ঘিরে রেখেছে। যার দক্ষিণ প্রান্ত বেশি প্রশস্ত। তোর্ষার বিভক্ত প্রবাহে গড়ে ওঠা প্রাকৃতিক সুরক্ষার বলয়ে জলদাপাড়ার পশুপাখিরা বাস করে, বেড়ে ওঠে। সমস্যা হয় যখন প্রবল বন্যার জল জঙ্গলে ঢুকে পড়ে। অরণ্যের হাতি, গণ্ডার, বাইসন তখন লোকালয়ে এসে নানান সমস্যা তৈরি করে।

জলদাপাড়া এলাকার আদি বনবাসীদের অধিকাংশই বোরো উপজাতির। পরবর্তীকালে অন্যান্য উপজাতি এবং উপজাতি নয় এমন মানুষও এসব এলাকায় বস-বাস করতে শুরু করেন। কিছু কিছু মুসলিম বসতিও আছে। এই জাতীয় অরণ্যে বন বিভাগের ২টি বিট

আছে। উত্তর-পশ্চিমের হলং এবং দক্ষিণ-পূর্বের মালঙ্গ বিট। হলং বিটের মধ্যে আছে বনবিভাগের বিখ্যাত হলং অতিথিশালা। প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু একাধিকবার পুজোর ছুটিতে এখানে বাস করতেন। গণমাধ্যমে তখন এই নিয়ে অনেক সংবাদ প্রকাশিত হয়। হলং বাংলো সর্বত্র পরিচিতি লাভ করে। এই বাংলোর পাশ দিয়ে বয়ে গেছে তোর্ষায় জন্ম নিয়ে তোর্ষাতেই মিশে যাওয়া স্বল্প দৈর্ঘ্যের হলং নদী। এই বাংলোর সামনে আছে বনবিভাগের 'লবণ পিট', যেখানে হাতি, বাইসন প্রভৃতি জন্তুকে নিয়মিত তাদের প্রয়োজনীয় লবণ খেতে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। হলং-এ এখন লবণ খেতে আসা জন্তুর সঙ্গে সঙ্গে তাদের দেখতে আসা প্রচুর মানুষেরও সমাগম ঘটে। এর ফলে হলং হারিয়েছে তার নির্জনতা, নিজস্বতা।

জলদাপাড়ার অপর বন বিটটির নাম মালঙ্গ। হলং-এর তুলনায় অনেক কম পরিচিত। তবে কিছুদিন আগে দু'টি গণ্ডার লড়াই করতে করতে মালঙ্গ বিটের সিসামারা নদীতে পড়ে যায়। এদের একটি নদীর জলের তোড়ে ভেসে গিয়ে মারা যায়। এই সংবাদ গণমাধ্যমে বহুল প্রচার পাওয়ার পরে অনেকেই মালঙ্গ-এর নাম জেনেছেন। মালঙ্গ বিট জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের কোর এরিয়া। এখানেই অধিকাংশ গণ্ডারের আবাস। মালঙ্গ পর্যটকদের থাকা বা বেড়ানোর জন্য এখনও উন্মুক্ত নয়। এতদিন পর্যন্ত পর্যটকরা জলদাপাড়া অরণ্যে প্রবেশাধিকার পেতেন উত্তরে মাদারিহাটের দিক থেকে। সেখান থেকে গাড়ি বা হাতি সাফারিতে দক্ষিণে জঙ্গলের কোর এলাকার প্রান্ত ছুঁইয়ে তাদের ফেরত নিয়ে যাওয়া হত। কয়েকবছর হলো দক্ষিণে শালকুমারের দিকেও বনবিভাগ দ্বিতীয় একটি প্রবেশদ্বার চালু করেছেন। এটি হলং বাংলো এবং মালঙ্গবিটের মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত। জঙ্গলের কোর এলাকার কাছাকাছি এবং জলদাপাড়া বনবসতির সন্নিকটে।

সিসামারা নদী মালঙ্গ বিটের পশ্চিমের সীমানা বরাবর উত্তর-দক্ষিণে প্রবাহিত। তোর্ষায় উৎপত্তি হয়ে যা তোর্ষাতেই মিশেছে। স্বল্প দৈর্ঘ্যের খরস্রোতা এই নদী। সারা বছর স্বচ্ছ জল বনবসতির মানুষ এবং জঙ্গলের জন্তু জানোয়ারদের যোগায় সিসামারা। নিরন্তর সৃষ্টি করে প্রবাহিত জলের শব্দে স্বর্গীয় সুর। নির্মল নীলাকাশ থেকে সূর্যের আলোর প্রতিফলনে প্রতিবেশী বনানীর ঝকঝকে সবুজের পাশাপাশি এঁকে দেয় তরল রূপালি রেখা। শুধু মানুষ নয় জঙ্গলের হাতি, গণ্ডার, বাইসন প্রভৃতি জন্তুরাও যার আকর্ষণে মুগ্ধ হয়। তাই শুধুই জল খেতেই আসা নয় অনাবিল অবসর যাপনেও তারা সিসামারার এক চিলতে বালিয়াড়িকে ভালোবেসে রোদ পোহায়। দু'চোখ ভরে সে দৃশ্য কে না দেখতে চায়! এই ছবি ক্যামেরা বন্দি করার ইচ্ছা কার না হয়! কিন্তু এই দিকটায় উত্তরের মাদারিহাটের চেনা পরিবেশে পর্যটকদের থাকার যে সব ব্যবস্থা দীর্ঘদিন চালু আছে তা তো নেই? তা হলে কী হবে? এর ইতিবাচক সমাধান এই লেখাতেই পাবেন। সিসামারা পরিখার মতো জলদাপাড়া অভয়ারণ্যের এদিকের অংশটিকে বুক দিয়ে আগলে রেখেছে দুর্গের মতো। এর পশ্চিম দিকে সম্প্রতি তৈরি হয়েছে ৬ কিলোমিটার দীর্ঘ বাঁধ। এই বাঁধ যেমন বন্যা নিয়ন্ত্রণ করে তেমনই পশ্চিমপাড়ের বনবসতিগুলিকে অহরহ হাতি-গণ্ডারের উৎপাত থেকে স্বস্তি দেয়। এই বাঁধের গায়ে চোদ্দফুট উঁচু সিমেন্টের পাটাতনের উপরে সদ্য গড়ে উঠেছে 'জলদাপাড়া রাইনো কটেজ'। যা আপনার বা আপনাদের ইচ্ছা পূরণের আস্তানা হতে পারে।

রনো কার্জির বাবা ছিলেন ফরেস্ট গার্ড। একদিন ভোরে উঠোনে হাতি এসে তাকে পদপৃষ্ট করে মেরে ফেলে। রনোদের ১০ বিঘা জমিতে ফালাকাটার জঙ্গলপ্রেমী শিক্ষক অলোক গুহ এবং তার সঙ্গীরা এই কটেজ নির্মাণ করেছেন। রনোই এখানকার কেয়ারটেকার। পর্যটকদের খাওয়া, ঘোরা, মাছধরা সব ধরণের ইচ্ছা যত্ন নিয়ে পূরণ করে রনো এবং তার সঙ্গী পবিত্র। জলদাপাড়া পোস্টঅফিস এই দিকে। জলদাপাড়া বাজার তাও এইদিকে। তাই মাদারিহাট দিয়ে জলদাপাড়ার অভয়ারণ্য দেখা এবং সাক্ষাৎ জলদাপাড়া হয়ে এর রূপ উপভোগ করা অনেক আলাদা। এ দিকটা এখনও অনেক অনাবৃত। পর্যটকের ভিড়ে পরিবেশ কলুষিত হয়নি।

শিয়ালদা বা হাওড়া থেকে ট্রেনে ফালাকাটা স্টেশনে নেমে গাড়িতে ঘণ্টা খানেকের পথ এই রাইনো কটেজ। ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক যা আলিপুরদুয়ারের দিকে গেছে তা ধরে কিছু দূর যাওয়ার পর বাঁদিকে শালকুমারের দিক হয়ে এখানে পৌঁছাতে হবে। দূরত্ব ২৪/২৫ কিলোমিটার। ছোটোগাড়ির ভাড়া ৬০০-৭০০ টাকা।

'জলদাপাড়া রাইনো কটেজে' দুতলায় দুটি ডবলবেড রুম। এদের মাথায় আছে ওয়াচ টাওয়ার। সেখানে বসে বহুদূর পর্যন্ত আপনি জঙ্গলের ভেতরে চোখ রাখতে পারবেন। ঘরগুলির সঙ্গে যুক্ত বাথরুম এবং ঘরময় কার্পেট। তবে কোনও টিভি নেই। অন্যান্য ব্যবস্থা যথেষ্ট বিলাসবহুল। দু'দিক জুড়ে কাচের দেওয়াল। পর্দা সরিয়ে ঘরে শুয়েই জঙ্গলকে দু'চোখ ভরে নিরন্তর উপভোগ করা যায়। দেখা যায় চাঁদ, তারা, দূরের পাহাড়, সবুজ বনানী, রুপোলি নদীর জল এবং অনন্য জলপ্রবাহের সুর। বাঁধ বরাবর আপনমনে হাঁটতে পারেন। রনোকে বলে ছিপ জোগাড় করে নদীতে মাছ ধরতে পারেন। আপনার সমস্ত ইচ্ছাপূরণ হবে রনোর আন্তরিক প্রয়াসে। খাওয়ার ক্ষেত্রে আপনার ইচ্ছায় দেশি মুরগী, বরলিমাছ বা ঢেঁকি শাক রনোই ব্যবস্থা করে ফেলবে। জঙ্গলের ভেতরে কার সাফারি বা হাতি সাফারির বন্দোবস্তও রনোই করে দেবে। এছাড়াও আশপাশের অন্যান্য জায়গায় যাতায়াতের গাড়ির জন্যেও আপনি রনোকে বললেই ব্যবস্থা হয়ে যাবে। এখান থেকে নিকটবর্তী অন্যান্য পর্যটনকেন্দ্রগুলির মধ্যে আছে জয়ন্তী, রাজাভাতখাওয়া, চিলাপাতা, বিন্দু, জলঢাকা, চামুর্চি, ভুটানের ফুন্টশোলিং, ঝালং, রায়মাটাং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, গরুমারা প্রভৃতি।

যোগাযোগ 'জলদাপাড়া রাইনো কটেজ', নতুনপাড়া, পোঃ-জলদাপাড়া, জেলা-আলিপুরদুয়ার, ফোন-৯৪৩৪৬-০৭৮২৫, ৯৮৩২০-১৫৫৫২, ৯৮৩২৩-৮৬৮২৬।

পরিচিতি

পেশা অধ্যাপনা। লেখালেখির পরিধি বহুমুখী এবং তথ্য সমৃদ্ধ।

উত্তরবঙ্গের কয়েকটি হোমস্টে

প্রবীর বসু

পরিচিত পর্যটন কেন্দ্র ভিড়ের চাপে আক্রান্ত। নীরবে, নিভৃতে, প্রাণের আনন্দে মনের শান্তিতে দু-চারটি দিন কাটানো এখন বেশ সমস্যা। শান্তিতে ছুটি কাটাতে এসে জন-কোলাহলে সে যেন এক অশান্তির পরিবেশ– কাজেই শান্তির খোঁজে বন-পাহাড়ের বুকে কাঞ্চনজঙ্ঘাকে সঙ্গী করে বেশকিছু পর্যটক হোটেল রিসর্ট ছেড়ে উত্তরবঙ্গের গ্রামগুলিতে হোমস্টে পদ্ধতিতে, থাকা-খাওয়ার আনন্দ উপভোগ করছেন, এতে পর্যটকেরা খুশি, আর্থিকভাবে উপকৃত হচ্ছেন স্থানীয় মানুষ। বেড়ানোর আনন্দের পাশাপাশি বাড়তি পাওনা স্থানীয় লোক-সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হওয়া।

মনে রাখতে হবে হোমস্টে কিন্তু হোটেল নয়। পাহাড়ি গ্রামে, প্রান্তিক মানুষের সান্নিধ্যে প্রকৃতিকে উপভোগ করা। কাজেই চাহিদা অনুযায়ী কাঙ্ক্ষিত বস্তুটি এখানে নাও পেতে পারেন। সেটুকু মানিয়ে নিতে হবে। প্রস্তুতির বিশেষ প্রয়োজন নেই, টিকিট কেটে ব্যাগ গুছিয়ে বেড়িয়ে পড়লেই হল।

উত্তরবঙ্গের প্রকৃতিকে অন্তরঙ্গভাবে পেতে হলে চলে যেতে পারেন এক নতুন পথে সিলারি গাঁও, ইচ্ছে গাঁও, রেসিখোলা আরও এগিয়ে মানখিম আরিতারের পথে।

সিলারি গাঁও

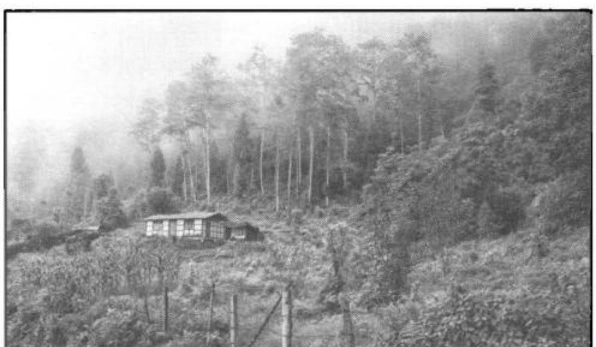

সিলারি সে এক বনপাহাড়ের দেশ। কালিম্পং থেকে আলগাড়া পেরিয়ে পেডং-এর পথে হঠাৎই বাঁদিকে একটি ছোটো পথ উপরে উঠে গেছে। লেখা 'ওয়ে টু সিলারি, নিউ দার্জিলিং'। ওই রাস্তা ধরেই প্রথমে পড়বে সাইলেন্ট ভ্যালি। কোনও সময়ে টলটলে জলের লেক ছিল এই সাইলেন্ট ভ্যালি। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্লাউড বাস্ট করে লেক ছাপিয়ে বন্যার উপক্রম। তখন লেকের একদিকে কেটে জল বার করে দেওয়া হয় এবং পরবর্তীকালে বড়ো বড়ো ঘন পাইন গাছে নিস্তব্ধ গা-ছমছমে পরিবেশে আজকের সাইলেন্ট ভ্যালি। ভ্যালি পেরিয়ে এবড়ো-খেবড়ো বোল্ডারে ভরা জঙ্গল পথে বেশ কিছুটা এগোলেই চোখে পড়বে পাহাড় ঘেরা জঙ্গলের মাঝে উজ্জ্বল আলোর রোশনাই। আসলে পাহাড়ি গ্রামের প্রতিটি বাড়িতেই টিনের ছাউনি। জঙ্গল ভেদ করে বহু দূর থেকে ওই রৌদ্রজ্জ্বল ছাউনি নজরে পড়ে। ধাপ পাহাড়ের ওই ঝকমকে গ্রামটিই সিলারি গাঁও। পাহাড়ের বুকে থরে থরে ফুলে ফুলে সাজানো ছবির মতো গ্রাম।

সিলারি আসলে এক জবরদখল কলোনি। সরকারি জমিতে সিঙ্কোনা চাষ করতে আসা শ্রমিকরা এখানে বসতি গড়ে, তবে এখনও জমির পাট্টা পায়নি। সিলারি বনদপ্তরের অধীনে থাকা গ্রাম, ফলে গ্রাম থেকে মূল রাস্তা ৫ কিলোমিটার পথ সারাই-এর অভাবে চলাচলের অযোগ্য। পর্যটকদের এই পথটুকু অতিক্রম করে গ্রামে পৌঁছানো বেশ কষ্টসাধ্য। কালিম্পং থেকে গাড়ির ড্রাইভারেরা এই শেষ পথটুকুর জন্য সিলারিতে যেতে রাজি হয় না আর যদিও বা যেতে রাজি হয়, অস্বাভাবিক ভাড়া দাবি করে। তবে সিলারি গ্রামের হোমস্টে মালিকরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পর্যটকদের নিজেদের গাড়িতে গ্রামে নিয়ে যায়।

এখানে হোটেলের ব্যবস্থা নেই। গ্রাম জুড়ে প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই হোমস্টের ব্যবস্থা। তবে সিলারির প্রকৃতি আকর্ষণীয়। গাঢ় নীল আকাশে আদিগন্ত সবুজ পাহাড়। সঙ্গে বরফ ঢাকা কাঞ্চনজঙ্ঘা। সিলারি যেন জঙ্গলের কোলে এক মেঘ-পাহাড়ের দেশ। এক সুন্দর পাহাড়ি গ্রাম। সিলারি গাঁও আসলে সিল্ক রুটের প্রবেশদ্বার। দিন দুয়েকের সফরে ঘুরে আসতে পারেন এই জঙ্গল ঘেরা পাহাড়ি গ্রামে।

কীভাবে যাবেন

শিলিগুড়ি বাস স্ট্যান্ড থেকে বাসে কালিম্পং, সেখান থেকে শেয়ার জিপে বা হোমস্টে-র মালিকের সঙ্গে যোগাযোগ করে তার নিজস্ব গাড়িতে সিলারি গাঁও পৌঁছতে পারেন। ভাড়া মোটামুটি ৪ জনের জন্য ৮০০ টাকা।

কোথায় থাকবেন

সিলারি গাঁওতে প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই হোমস্টের ব্যবস্থা রয়েছে। ভাড়া মোটামুটি ৮০০-১,০০০ টাকা প্রতিদিন প্রতিজন। হিমালয়ান হোমস্টে, রাজেন থাপা, মোবাইল-০৯৬৩৫০০৫৪১০, দিলীপ তামাং, মোবাইল-০৯৬৩৫০০৫৩১৮, বিরু তামাং, মোবাইল-৯৫৯৩৪৪৩৪০৯, সিলারি গাঁও রিট্রিট, মোবাইল-৯৩২৭-৭৫৪৪৫।

ইচ্ছে গাঁও

হিমালয়ের কোলে কালিম্পং থেকে মাত্র ১৫ কিলোমিটার দূরে সুন্দর পাহাড়ি গ্রাম ইচ্ছে গাঁও। ছবির মতো সাজানো পাহাড়ি হ্যামলেট। রয়েছে সুন্দর সাজানো বেশকিছু হোমস্টে। ফুলে ফুলে সাজানো পাহাড়ের ধাপে ধাপে অসম্ভব সুন্দর কটেজ। সেখানে নিজেদের হাতে তৈরি শীতের টাটকা আনাজের সঙ্গে ঘরে পালন করা মুরগির ডিম, লোভনীয় মোমো। সুস্বাদু চায়ের সঙ্গে গরম গরম পাকোড়া। পায়ের জোর থাকলে ট্রেক করে চলে যেতে পারেন সিলারি গাঁও মাত্র ৪০ মিনিটে। এছাড়া কাছেই রয়েছে রামধুরা। সিলারি গাঁও, রামধুরাতে রয়েছে বেশকিছু হোমস্টে।

ইচ্ছে গাঁও-এর আতিথেয়তাতে আপনি মুগ্ধ হবেন। এছাড়া দূষণমুক্ত হিমালয়ের কোলে কাঞ্চনজঙ্ঘার উপর মেঘের লুকোচুরি দেখতে দেখতে পাহাড়ের মোহময় পরিচ্ছন্ন নির্জন বনপাহাড়ের পথে হাঁটতে হাঁটতে আপনি অনুভব করবেন মনের শান্তি, প্রাণের আরাম। বারবার মনে হবে কেন এতদিন পরে এলাম?

কীভাবে যাবেন

হাওড়া বা শিয়ালদহ থেকে ট্রেনে নিউ জলপাইগুড়ি হয়ে শিলিগুড়ি পৌঁছে সেখান থেকে বাসে কালিম্পং। ভাড়া ১০০ টাকা। কালিম্পং থেকে ইচ্ছে গাঁও শেয়ার জিপ পেতে পারেন। অন্যথায় হোমস্টে-র মালিকের পাঠানো গাড়িতে বা গাড়ি ভাড়া করে পৌঁছে যেতে পারেন কালিম্পং থেকে ১৫-১৬ কিলোমিটার দূরত্বে ইচ্ছেগাঁও গ্রামের পথে। ভাড়া পড়বে ৭০০-৮০০ টাকা।

কোথায় থাকবেন

ইচ্ছে ফরেস্ট ভিলেজ, ফোন-৭৬০২৭৮৯৬৬৭/৯৬৭৯৬৮৫০২২। প্রতিদিন প্রতিজন থাকা-খাওয়া মোটামুটি ১,০০০ টাকা।

রেসিখোলা

কালিম্পং থেকে পেডং হয়ে সিকিমের রেনকের পথে ১৩ কিলোমিটার দূরে পশ্চিমবঙ্গ, সিকিম সীমান্তে ১,৭৩০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত রেসিখোলা। কুলকুল ধারায় বয়ে চলেছে রেসি নদী। নদীর এক ধারে বাংলা বিপরীতে সিকিম। দুধারেই রয়েছে বেশকিছু হোমস্টে। সাঁকোতে নদী পারাপারের ব্যবস্থা রয়েছে। মাঝে নদী দুপারে ঘন বন-পাহাড়ের জঙ্গল। আবার জঙ্গল ঘেঁষে নদীর পাড়ে বেশকিছু সুদৃশ্য ট্যুরিস্ট কটেজ। অপরূপা নৈসর্গিক শোভাই মূল আকর্ষণ রেসিখোলার।

কালিম্পং থেকে আলগাড়া, পেডং হয়ে সিকিমের রেনক পেরিয়ে সিল্করুটগামী পথে হঠাৎই নেমে আসতে হবে রিভার বেডে, সেখান থেকে বাঁশের সাঁকো পেরিয়ে ঘন জঙ্গল পথে রেসি নদীকে সঙ্গী করে এগিয়ে যেতে হবে। নির্জনে, নিভৃতে পাহাড় ঘেরা নদীপাড়ের নৈসর্গিক শোভা হয়তো আপনাকে হঠাৎই মনে করিয়ে দেবে আপনার পহেলগাঁও ভ্রমণের কথা। সামান্য আপশোষ হতে পারে এত কাছে অথচ দেখা হয়ে ওঠেনি এখনও!

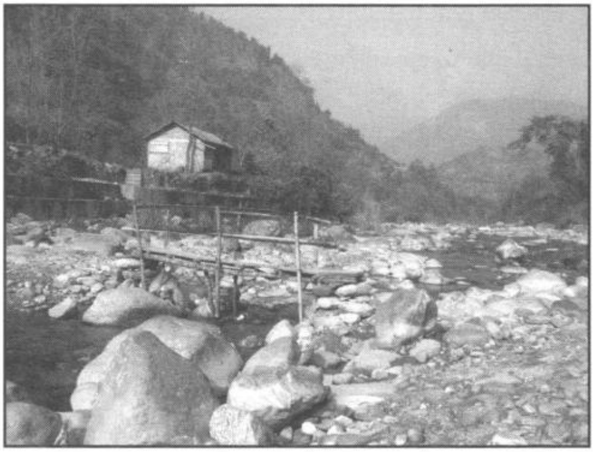

কোথায় থাকবেন

রেসি রিভার ফার্ম হাউস, রেসিখোলা, পেডং, এম কে গুরুং, মোবাইল-৯১৮৯৬৭৯৩৫৭২৭/৭৮৬৫০৪৯২৫৫। প্রতিদিন, প্রতিজন থাকা-খাওয়া মোটামুটি ৮০০-১,০০০ টাকা।

মানখিম-আরিতার

পূর্ব সিকিমের প্রায় অচেনা একটি গ্রাম। পুরানো সিল্ক রুটের জনপ্রিয় স্থান আরিতার থেকে আরও ৫-৬ কিলোমিটার উঁচুতে স্বর্গসম এ গ্রামের অবস্থান। এমনই এক প্রান্ত যেখানে পৌঁছলে মনে হবে সময় যেন থমকে গেছে, হারিয়ে গেছে এই সব পেয়েছি সুন্দরের দেশে। শীতে বরফ জমানো ঠান্ডা, হিলটপের চেয়ারে বসে কুয়াশা মাখা আর রাতের তারাভরা নিচে নেমে আসা আকাশ এই নিয়ে সম্পূর্ণ নিটোল সুখের রাজ্য। ভূগোলের হিসেবে ৪,৬০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত পূর্ব সিকিমের এই মানখিম পাহাড় চূড়া। ফার, পাইন, গুরাসের মৌরুসীপাট্টা। ভোরের হিম ঠান্ডা হাড় কাঁপিয়ে দেবে, কিন্তু খোলা

ছাদে দাঁড়ালে চোখের সামনে কাঞ্চনজঙ্ঘার রংবদলের খেলা দেখতে মজে গেলে সে শীতল অনুভূতি গৌণ হয়ে যাবে। রাজসিক গর্বোদ্ধত পাঁচটি চূড়ার ওপর সকালের সোনা রোদ যেন মনের খুশিতে নেচে বেড়ায়। খালি চোখে পরিষ্কার দেখা যায়। কাঞ্চনজঙ্ঘা মেন, ইয়াংলুকাং, সেন্ট্রাল, সাউথ এবং কাংবাচেন। এখানেই শেষ নয় কুয়াশার পরত ধীরে ধীরে কাটলে ধরা দেবে জানু, কাবরু, পান্ডিম, সিনিয়লচু, শিম্ভো নিয়ে সপার্ষদ কাঞ্চনজঙ্ঘার দিওয়ান-এ-খাস। মেঘমুক্ত সুনীল আকাশে কাঞ্চনজঙ্ঘার এ অনুপম সৌন্দর্যরূপ বদলের দৃশ্য দেখে কাটিয়ে দেওয়া সম্ভব পুরো সকাল। একটু বেলায় হাঁটতে হাঁটতে চলুন আমব্রেলা ভিউ পয়েন্টে। সিমেন্টের তৈরি বিশাল ছাতার তলায় বসে স্থানীয় কাউকে জিজ্ঞাসা করে চিনে নিন ভুটান পাহাড়, চিন সীমান্ত, রেনক, পেডং, জুলুক আর গ্যাংটক। বহুদূর থেকে দেখা পাহাড়ি জনপদগুলো দেখে এক অদ্ভুত ভাবালুতায় আচ্ছন্ন হবে মন। শীতের শেষে রঙের মেলা বসে মানখিমে। পুরো অঞ্চল জুড়ে তখন শুধুই হাজারো রঙিন ফুল। পাহাড় যেন মেতে ওঠে বসন্তোৎসবে। স্বাভাবিকভাবেই পর্যটকদের আনাগোনা বাড়ে এ সময়। কড়া শীতে বেবাক ফাঁকা। আরও উঁচুতে যেতে ইচ্ছে হলে চলুন রাই মন্দিরের দিকে। পাহাড় বেয়ে যেতে যেতে হঠাৎই চোখের সামনে ভেসে উঠবে একচালা মন্দিরটি। হিন্দু পাহাড়ি জনজাতি রাই পরিবারে, কিরাত রাই মন্দির। অন্ধকারে সর্বদা জাজ্জ্বল্যমান মাখনের প্রদীপ শিখা। আর পিছনেই উত্তুঙ্গ, চির অমলিন কাঞ্চনজঙ্ঘার উদাত্ত আহ্বান। হা হা উন্মুক্ত মন্দির চাতালে দাঁড়িয়ে একবার নিশ্চিতভাবেই মনে হবে মন্দির-মসজিদের চার দেওয়ালের মধ্যে নয়, ভক্তের প্রবল আকুতির মধ্যেও নয়, ঈশ্বরের বসতি মানুষের অনাবিল মন আর উদার-প্রসন্ন প্রকৃতির মাঝেই। মন্দিরের পাশের পথ নেমে গেছে নিচের আরিতার গ্রামে। মানখিমদাড়া (পাহাড় চূড়া) থেকেই একমাত্র চোখে পড়ে পান্না সবুজ আরিতার লেক, স্থানীয় ভাষায় লামপোখরী। উতরাই পাথুরে পথ বেয়ে ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে নেমে আসা যায় পনেরো-কুড়ি মিনিটেই। অবস্থান হিসাবে আরিতারের গুরুত্ব ভীষণ। উত্তরে মুখ করে দাঁড়ালে ডান হাতে ভুটান, বাঁহাতে নেপাল ও পিছনে বাংলা তথা উত্তরবঙ্গ। ইতিহাস প্রিয় মানুষদের স্মৃতির সরণি আরিতার। ব্রিটিশ শাসনাধীনে সিকিমের প্রথম পলিটিক্যাল অফিসার জেমস ক্লড হোয়াইট আরিতারেই বাসা বাঁধেন। কালিম্পং থেকে ঘোড়ার পিঠে চেপে তিব্বত যাত্রা শুরু করে আরিতার, জেলেপ-লা হয়ে গন্তব্যে পৌঁছান। তাঁর যাত্রাপথ ছিল সেই গৌরবময় পুরানো রেশম পথ। ১৮৯৬ সালে জেমসের উদ্যোগে তৈরি হয় আরিতারের ডাকবাংলো। অনন্য, অসাধারণ গঠনশৈলীর বাংলোটিতে সিকিম সরকারের বিশেষ অনুমতিতেই থাকা যায়। আরিতারে দ্রষ্টব্যের মধ্যে আছে হেলিপ্যাড গ্রাউন্ড, রিমপোচে গুম্ফা, বিশ্ববিনায়ক মন্দির, চন্দনা ফলস্, রামগৌরি আর্কাইভ। যাতায়াত বাদে আরও দুটি দিন মানে চার থেকে পাঁচদিনে আরিতার এবং মানখিম অসাধারণ সফর হতে পারে। বর্ষা বাদে যখন খুশি বেড়িয়ে পড়তে পারেন। তবে শীতে ভয়ানক ঠান্ডা পড়ে।

থাকা

আরিতারে রয়েছে হোটেল আদিত্য অ্যানেক্স, ফোন-০৯৯৩২২-২৩২৭৩, ০৯৯৩৩৪৭০৭৮৮, হোটেল লামপোখরি ভিলেজ রিসর্ট, ফোন-০৯৯৩৩১৮৭৯১১, ০৯৩৯৩৯৭২৭১১, চিট্রিজ হোটেল, ফোন-০৯৮৩২৫৪৪৪৩৮, ০৯৬০৯৮৭০৪১৬। মানখিমে কাঞ্চনজঙ্ঘা মিরর হোমস্টে, ফোন-০৯৭৭৫৯১৫০৪৭, হেভেন ভ্যালি রিসর্ট হোমস্টে, ফোন-০৯৪৭৮৫৭২৯২, ০৭৬০২৫-৭০৫২৭। খাওয়ার ব্যবস্থা ওখানেই।

যাতায়াত

ট্রেনে এন জে পি থেকে এস এন টি বাসস্ট্যান্ড এবং বাসে রেনক হয়ে আরিতার। অথবা শেয়ার জিপে রংপো হয়ে আরিতার। তবে রংপো-আরিতার গাড়ি সার্ভিস খুব কম। সেজন্য রংপো থেকে রেনক বাজার চলে আসা ভালো। এখান থেকে সবসময়ই রেনক-আরিতার গাড়ি সার্ভিস আছে। সময় লাগে ৫০ মিনিট থেকে এক ঘণ্টা। লিংতাম থেকেও রংলি হয়ে আরিতার আসা যায়। গ্যাংটক থেকে সার্ভিস জিপে বোরাথাং-রংপো-রেনক হয়ে আরিতার পৌঁছনো যায়, দূরত্ব প্রায় ৬৮-৭০ কিলোমিটার। আরিতারের অন্য পথটি হল পশ্চিমবঙ্গের কালিম্পং থেকে আলগাড়া-পেডং- রিশিখোলা-রেনক হয়ে আরিতার। রিশিখোলা থেকে রেনক বাজার মাত্র ৬ কিলোমিটার। তবে শেয়ার গাড়ির চেয়ে পুরো গাড়ি ভাড়া করাই সুবিধাজনক।

কালিম্পং থেকে কালিম্পং দিন পাঁচেকে এ সফর শেষ করা সম্ভব। সিল্ক রুটের প্রবেশদ্বার সিলারির যে কোনও হোমস্টে-র মালিকের সঙ্গে যোগাযোগ করলে সে অন্য হোমস্টে গুলি বুক করে ঘোরানোর ব্যবস্থা করে। আর এই সফরের সঙ্গে আর ২-৩ দিন যোগ করলে পুরো সিল্ক রুট সেরে আসা যায়। ভালো লাগবে, এই শীতেই বেড়িয়ে পড়ুন।

পরিচিতি

অবসরপ্রাপ্ত।
নতুন বেড়ানোর ঠিকানায় পাড়ি দেওয়াটাই নেশা।
ভ্রমণ ও পরিবেশ বিষয়ক পুস্তক প্রণেতা।
'বেড়িয়ে পড়ি' পত্রিকার সম্পাদক।

UTTAM CABINET FIRM

FURNITURE MANUFACTURER

Subhasish Bhattacharjee

Interior Designer

Tele: 03523-244440
Fax: 03523-243233
Cell: 9932860201/ 9434000018

Email: bsubhasish30@yahoo.com

M.G. ROAD, RAIGANJ, UTTAR DINAJPUR, 733134

EASY EMI
0%
INTEREST
Panasonic
econ Air Shoppe
HEALTHIER
Panasonic
LIFE
CONDITIONER
FASTER
SMARTER
IT'S A LIFE CONDITIONER !
S.B. REFRIGERATION
Show Room : 58 / A, Barasat Road, Opposite of Padma Cimena, Sodepur, Kol- 700 110, # 9674443195
Head Office : 7, Durgacharan Banerjee Street, Kol - 700 005, Ph. : 2530 0490, # 9836881995
ALL TYPES OF AIR CONDITIONER REPAIRING AND SERVICING DONE HERE.